মূল্যায়ন

- ফ্যাসি[illegible]
- ফ্যাসি[illegible] জাড আর-এ[illegible]
  ইশতে[illegible]
- ভিয়েতনামের জয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

- বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বিপ্লবী গণতন্ত্র
- ভারত সরকারের অর্থনীতি

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস
- সোভিয়েত কৃষি কর্মনীতি
- পীর-প্রসঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন
- মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজনীতি ও সমাজ প্রসঙ্গে
  ঐতিহাসিক মহম্মদ হাবিব

১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৮২ মূল্য ঃ দেড় টাকা

ঠিক যে তেলটি আমি চাই !

সংসারের খাটুনির পর
মাথায় একটু তেল মেখে স্নান
করে উঠলে সব ক্লান্তি যেন দূর
হয়ে যায়—তবে তেলটি এমন
হওয়া চাই যার মনোরম
গন্ধ দিনভোর আমায় সতেজ
ও ঝরঝরে রাখবে—
আর তাই আমার পছন্দ
মৃদু সুবাসিত

কেয়ো-কার্পিন

কেয়ো-কার্পিনে চুল
চটচটে হয়না

Dey's
দে'জ
মেডিক্যালের
তৈরী

PX/DM/KB-JA/78

With best compliments from :

BENGAL POTTERIES
LIMITED

Makers of Fine Crockeries & Insulators

দৈনিক
ও
সাপ্তাহিক

কালান্তর

পড়ুন

"It's past ten-o-clock. Books in their hands, mouths laughing, boys on way to school swarm over the streets. The old men come out one by one; bellies glistening with oil, gamchhas on their shoulders — and stop before the opium shop for the gossip and the laudanum. The vegetable-sellers are going back from the market, their sacks and baskets pleasingly empty and light. Calcutta town is a roaring place – with the rattle of carriages, the warning cries of the coachmen, the rumble of the ponderous Wellers and the stately Normandies. Verily, it's nigh impossible to walk along a street with ease or cross one without danger to limb or even life!"

This was how the great 19th century babu, that prince of dandies, Kaliprasanna Sinha, described the Calcutta of the age of horses. But isn't it true also of today? It is as "impossible to walk along a street with ease" in this eighth decade of the 20th century as a hundred years ago. Only

THE CALCUTTA OF KALIPRASANNA

the tube rail can unclog our streets. And we are working on that right now ! It is a venture in which all are contributing equally, the man on the street, as much as we below it, some by being patient, others by being speedy.

MTP

THE TUBE ETCHES
A NEW MAP OF CALCUTTA

METROPOLITAN TRANSPORT PROJECT
(RAILWAYS)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

1.	Bharatiya Banausadhi (in Bengali) edited by Prof. Asima Chatterjee. (5 parts) Each part	Rs. 30/-
2.	Education and the Nation—by Prof. K. N. Sen	Rs. 30/-
3.	Collected Poems & Early Poems & Letters —by Manmohon Ghosh	Rs. 25/-
4.	Early Indian Indigenous Coins —edited by Dr. D. C. Sarkar	Rs. 12/-
5.	Fundamental of Hinduism (2nd. Edition) —by Dr. S. C. Chatterjee	Rs. 5/-
6.	Foreigners of Ancient India & Lakshmi & Saraswati in Art & Literature—edited by Dr. D. C. Sarkar	Rs. 12/-
7.	Gopi Chandra Nataka —by Dr. Tarapada Mukherjee	Rs. 10/-
8.	Illusion and its Corrections—by Dr. J. Mukherjee	Rs. 20/-
9.	Acharya Prafulla Chandra Roy Birth Centenary Souvenir	Rs. 15/-
10.	Bengal Famine—1943—Tarak Chandra Das	Rs. 6/-
11.	Bharata War and Pauranic Genealogies —edited by Dr. D. C. Sarkar	Rs. 10/-
12.	Classical Indian Philosophy—Dr. Satis Chandra Chatterjee	Rs. 7·50
13.	ছান্দসিকি—দিলীপকুমার রায়	Rs. 7·50
14.	Indian Feudalism—Ram Saran Sarma	Rs. 15/-
15.	Contributions to the History of Islamic Civilization Vol I—S. Khuda Bukhsh	Rs. 8/-
16.	জ্ঞান ও কর্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	Rs. 6/-
17.	মঙ্গলচণ্ডীর গীত—ডাঃ সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য	Rs. 10/-
18.	প্রাচীন কবিওয়ালার গান—সম্পাদিত প্রফুল্লচন্দ্র পাল	Rs. 15/-
19.	Six ways of knowing—Dr. D. M. Datta	Rs. 15/-
20.	Studies in Arabic and Persian Medical Literature —Muhamad Zubayr Siddiqui	Rs. 12/-

বিস্তৃত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ

৪৮নং হাজরা রোড, কলিকাতা-১৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

★ সংস্কৃতি বিষয়ক ★

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

৫·৫০

বাংলার লোকনৃত্য

২·৯০

বাংলার উৎসব

১·২৫

★ পুরাকীর্তি বিষয়ক ★

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

২·৫০

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

৪·০০

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

৩·৭৫

★ শিল্প বিষয়ক ★

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা

(হস্তশিল্প)

১·২৫

★ বিবিধ বিষয়ক ★

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

৫·০০

বাংলার শিকার-প্রাণী

৩·০০

দেশের গান

০·৫০

চিত্রে ভারতের ইতিহাস

৪·৬২

ভারতের প্রত্নতত্ত্ব

২·০০

★ বিভিন্ন জেলা সম্পর্কিত ★

(ইংরেজী গ্রন্থমালা)

হুগলী জেলা গেজেটীয়ার ৪০·০০

বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ার ২৫·০০

পশ্চিম-দিনাজপুর জেলা গেজেটীয়ার ১৫·০০

মালদা জেলা গেজেটীয়ার ২০·০০

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়

৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা ৭০০০২৭

■

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন

১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

পশ্চিমবঙ্গ (তথ্য ও জনসংযোগ) ১১১১।৭৫

প্রবন্ধ, ইতিহাস ও স্মৃতিচারণ

★

রূপনারাণের কূলে	: গোপাল হালদার	৬·০০
মানুষের পার্থিব সম্পদ	: লিও হুবার ম্যান	১০·০০
আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা	: সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	১০·০০
ধর্ম ও মার্কসবাদ	: অমরেন্দ্র প্রসাদ মিত্র	২·৫০

এক কদম আগে দু কদম পিছে

: ভি. আই. লেনিন

৫·০০

★

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মূল্যায়ন

১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
বৈশাখ-জৈষ্ঠ
১৩৮২

সূচী

পীর-প্রসঙ্গে প্রবাদ প্রবচন/গিরীন্দ্রনাথ দাস ১
বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বিপ্লবী গণতন্ত্র/সত্য রায় ৮
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস/অসিত রায় ১৭
সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি সংক্রান্ত
কর্মনীতির ভিত্তি/ফিয়োদর কুলাকভ ৩৯
ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৩০তম বর্ষে জি. ডি. আর
জনগণের নতুন সংকল্প ৫২
ভারত সরকারের অর্থনীতি : প্রতিবিপ্লবের
ভরসাস্থল/চারুব্রত রায় ৬২
ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝায় ? ৭০
গ্রন্থ পরিচয় ৭৬
সম্পাদকীয় : ভিয়েতনামের জয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ৮৪
৮৯

জ্যাক দুকলো

বর্ষপঞ্জী

প্রচ্ছদ : অমূল্য দাস

সম্পাদক
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও
কালান্তর প্রেস, ৩০।৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত।

মূল্যায়ন নিয়মিত পেতে হলে :

ডাকযোগে চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক হওয়াই ভালো।

চাঁদার হার—বার্ষিক ১ টাকা।

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

মূল্যায়ন-এর এজেন্ট হতে গেলে :—

: কমপক্ষে পাঁচ কপি পত্রিকা নিতে হবে।

: পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে।

: ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন।

: এজেন্সী কমিশন দেওয়া হবে শতকরা ২৫%।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ

মূল্যায়ন

১০, বণ্ডেল রোড,

কলকাতা-১৯

পীর-প্রসঙ্গে প্রবাদ-প্রবচন

গিরীন্দ্রনাথ দাস

পৃথিবীর সব দেশে সব ভাষায় অল্প-বিস্তর প্রবাদবাক্য ব্যবহৃত হয়। এই সব প্রবাদবাক্য সেই সেই ভাষায় এক একটি অমূল্য মনিমাণিক্য বিশেষ। তুলনা দিয়ে সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করে মনের ভার লাঘব করায় যে তৃপ্তি তা বুঝিয়ে বলা যায় না। পৃথিবীতে বোধ করি এহেন মানুষ কম আছেন, যিনি কোন প্রবাদ বাক্য আদৌ ব্যবহার করেন না।

ভাষা জগতের অমূল্য-সম্পদ এই প্রবাদ বা প্রবচন যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এ সম্পর্কে অল্প কথায় স্পেন দেশীয় প্রবাদবাক্যে আছে—**A proverb is short sentence based on long experience.**

সম্ভবত বই-পত্র লেখার আগে থেকে প্রবাদবাক্যের অস্তিত্ব ছিল। এগুলি মানুষের মনে আপনা-আপনিই জন্মেছে। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রবাদবাক্যের আদি স্রষ্টা ছিল সাধারণ মানুষই।

বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়ঃ'—এ যে কয়টি প্রবাদবাক্য পাওয়া যায় তাদের নমুনা এইরূপ—

(১) আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী।

—ভুসুক পাদ।

(২) হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

—ঢেণ্ডণ পাদ।

প্রবাদবাক্য সংক্ষেপে দু-চারটি শব্দ দিয়ে হতে পারে—ছন্দোবদ্ধ এক পংক্তিতে হতে পারে—কবিতায় পয়ারছন্দে হতে পারে।

প্রবাদ-প্রবচনের প্রবাহ একটি স্রোতস্বতী নদীর ন্যায়। বহু পুরাতন প্রবাদ বিস্মৃতির গহ্বরে যে হারিয়ে যাচ্ছে না—এমন কথা জোর করে বলা যায় না। আবার নিত্য কত নতুন প্রবাদ যে ভাষার ভাণ্ডারে সংযুক্ত হচ্ছে তার ইয়ত্তা কে রাখে।

প্রবাদ-প্রবচন সাধারণত কোন বিশেষ ঘটনাকে নিয়ে, কোন বিশেষ ব্যক্তির কার্যকলাপকে নিয়ে—ক্ষেত্রবিশেষে উপদেশ দেবার তাগিদ নিয়ে—কোথাও বা বিদ্রূপ করার উচ্ছ্বাসে লোকের মুখে মুখে ফেরে। হাটে-ঘাটে-বাটে-মাঠে, গৃহকর্মে-অফিসে—অর্থাৎ প্রায় সর্বত্র সংক্ষেপে তুলনা দিয়ে কথা বলার প্রবণতা সকলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদবাক্য গরম-মেজাজে বা ঠাণ্ডা-মেজাজে ব্যবহারের পক্ষে খুবই উপযোগী।

প্রবাদ-প্রবচন ব্যক্তিকেন্দ্রিক-রূপেই অধিকতর প্রতিভাত। অবশ্য পশু-পক্ষী নিয়ে রূপক-ছলে অনেক প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। দেব-দেবী ভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ নিয়ে প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টি হয়েছে এমন ঘটনা কম। প্রধানত পৌরাণিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ব্যক্তিই সে সৌভাগ্যের অধিকারী, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। ধরা যাক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা। তাঁকে নিয়ে কত না প্রবাদবাক্য রচিত হয়েছে :—

১। রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।

২। কৃষ্ণ বাঁধা দড়ি, ডাইনে আনতে বামে কুলায় না।

৩। একজন কেষ্ট-বিষ্টু বটে! ইত্যাদি—

আল্লাহ্ তায়ালা নিয়ে অনেক প্রবাদবাক্য সৃষ্টি হয়েছে। যথা :—

১। রাখে আল্লা মারে কে,
মারে আল্লা রাখে কে।

২। আল্লার মার দুনিয়ার বার।

৩। মানুষের বিচার ধেয়ে পেয়ে,
আল্লার বিচার বয়ে-সয়ে। ইত্যাদি—

বলা বাহুল্য অনেক হিন্দু ব্যক্তিও উপরোক্ত প্রবাদবাক্যসমূহ ব্যবহার করেন অথবা 'আল্লা' শব্দের স্থলে 'ভগবান' শব্দ প্রয়োগ করেও ব্যবহার করেন।

বঙ্গে সুফী-দরবেশগণ, সামাজিক ভাবে নির্যাতিত নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট এসেছিলেন মুক্তির দূতরূপে। লক্ষ লক্ষ অন্ত্যজবর্গের লোক তাঁদের উদারতা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণাবলীতে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁরা সামাজিক অধিকার ফিরে পেলেন। সুফী-পীরগণ তাঁদের কাছে এমন মহীয়ানরূপে প্রতিভাত হলেন যার ফলে পীর-দরবেশগণের সমাধিস্থানে জিয়ারত করা, হাজত-মানত-শিন্নি দেওয়া

একটা দৃঢ়মূল সংস্কারে পর্যবসিত হল। কালক্রমে উক্ত পীর-দরবেশগণকে নিয়েই অনেক প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টি হয়েছে।

ইসলামে বাস্তবতাবিহীন প্রবাদবাক্যের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। তবে পীর-দরবেশ সম্পর্কিত প্রবাদবাক্যের সবগুলিই ধর্মীয় মূল্যের অপেক্ষা রাখে নি। সুফী-পীর-দরবেশগণ সাধারণ মানুষের কাছে মহাপুরুষ হিসাবে প্রতিফলিত হওয়ায়, তাঁদের সম্পর্কিত ঘটনাবলীতে কিছু রঙ মিশে, তা এক মুখ থেকে অন্য মুখে স্থানান্তরিত হয়ে, 'আষাঢ়ে' অর্থাৎ অলৌকিক গল্পেও পরিণত হয়েছে।

সুফী-পীর-দরবেশগণকে নিয়ে যে সব প্রবাদ-প্রবচন প্রচলিত আছে, তাদেরকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা :—

(ক) সাধারণভাবে পীরের স্মরণে ব্যবহৃত প্রবাদবাক্য—

১। বিলের গরু, বদরের শিঙি।" (বদর পীর)।

[অর্থাৎ বেওয়ারিশ। অথবা, ব্যক্তিগত নয়, সর্বসাধারণের জিনিস।]

২। মর্‌লো তবু হরি, ঠাকুরবর বলল না।

[অর্থাৎ হরি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। সে, মুসলিম পীর ঠাকুরবর সাহেবের মহত্বের স্বীকৃতি দিল না। সে জিদ করে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ মনে করল।]

(খ) স্পষ্টভাবে পীরগণের মাহাত্ম্য-প্রকাশক প্রবাদবাক্য—

১। পীর, না পয়গম্বর।

[অর্থাৎ পীরের কার্যাবলী যেন পয়গম্বরের সমতুল। আবার বিদ্রূপার্থেও এই প্রবাদবাক্যের ব্যবহার হতে পারে। অর্থাৎ তুমি পীরও নও পয়গম্বরও নও।]

২। তুফানে পড়ে বলে 'পীর বদর বদর।'

[অর্থাৎ বিপদে পড়ে, বিপদ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, পীর বদরকে স্মরণ করা।]

৩। বদর বদর গাজী
মুখে সদা বলে মাঝি।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৪। পাথরে পুজিলে পাঁচে, সেও পীর হয়ে পড়ে।
[হুতোম প্যাঁচার নক্সা থেকে : পাঁচে পুজিলে পাথরে সেও পীর হয়ে পড়ে।]

৫। গোলী খা-ডালেগা।

[শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ।' অর্থ—তিতুমীরের মত এত বড় যোদ্ধা যে, তিনি 'গুলী' খেয়ে ফেলার স্পর্দ্ধা রাখেন।]

৬। হিঁদুর নীর
মুসলমানের পীর।

—শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে।

৭। পীরের কাছে মাম্‌দোবাজি!

[অর্থাৎ পীরের কাছে চালাকি করা অসম্ভব।]

৮। পীরের সঙ্গে মুখ বাঁকানো!

[অর্থাৎ পীরকে অবজ্ঞা করার এত বড় দুঃসাহস!]

৯। মরতে বসে পীরের দিকে পা!

১০। আরের সঙ্গে যেমন-তেমন
পীরের সঙ্গে মস্করীকরণ!

[অর্থাৎ পীরকে নিয়ে তামাসা করলে তার প্রতিফল অনিবার্য।]

(গ) পরোক্ষভাবে পীরগণের মাহাত্ম্য-প্রকাশক প্রবাদ-প্রবচন—

১। মানলে পীর বরাবর
না মানলে ক্ষীর বরাবর।

[অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি থাকলে ক্ষীর বা সিদ্ধি প্রাপ্তিটি বড় কথা নয়, কিন্তু ভক্তের কাছে ক্ষীরই লক্ষ্য।]

২। যে শরীরে দয়া নেই সেও কখনো শরীর,
মুস্কিলে যার আসান নেই সেও কখনো পীর।

[অর্থাৎ দয়াহীন শরীরকে যদি শরীর বলে মনে করা হয়, তবে যে পীর মুস্কিল আসান করতে পারেন না তাঁকে পীর বলে স্বীকার করা—একই কথা।]

(ঘ) পীরের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক প্রবাদবাক্য :—

১। গাজীর কুড়ুল।

[অর্থাৎ ত্রিশংকুর অবস্থা। না স্বর্গে না মর্তে। ব্যবহার : "মরণ তো নেই, যেন গাজীর কুড়ুল হয়ে আছি।"—

—সাংস্কৃতিকী : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।]

২। চাঁদ খাঁর মসজিদ।

{ অর্থাৎ পীর একদিল শাহের সঙ্গে চাঁদ খাঁর এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে চাঁদ খাঁ একটি মসজিদ তৈরীর জন্য আরব্ধ কাজ আর শেষ করতে পারেন নি। মন্তব্য : কোন কাজে হাত দিয়ে এমন পর্যায়ে আসা, যা আর কোনমতেই শেষ করা সম্ভব হয় না। }

(ঙ) পীর সম্পর্কিত বিবরণে বিরাটত্ব বা মাত্রাধিক্য বোঝাতে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন—

১। গাজীর পট। (গাজী পীর)।

[অর্থাৎ অসংখ্য পট বা চিত্র।]

২। গাজীর গীত।

[অর্থাৎ এমন গান বা কাজ আরম্ভ করল, তা যেন আর শেষ হতে চায় না।]

৩। হেই বন্ বন্ ঘোরে লাঠি তিতুমীরের হাতে
ফট্ ফটাফট্ গুলী চলে বাঁশের কেল্লা ফতে।

—সিরাজ সাঁই : দেবেন নাথ।

৪। শালা, যেন তিতুমীরের লাঠি।

৫। এ্যানাগুলী ব্যানায় যা
যেদিক পারিস, সে দিক যা।
নিলাম নাম একদিল পীর
চল্‌ল গুলী হুমাইপুর॥

[অর্থাৎ পীর একদিল শাহ্ সম্পর্কিত প্রবাদ। এটি আনোয়ারপুর অঞ্চলের রাখাল-বালক বা কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত। অর্থ : এ্যানা মেরে বা আঘাত করে ডাং বা খেলার উপযোগী এক প্রকার ছোট লাঠির সাহায্যে 'গুলী' অর্থাৎ অন্য একটি ছোট লাঠিকে দূরে নিক্ষেপ করলে তা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে পড়তে পারে। }

(চ) পীরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ভাব-প্রকাশক প্রবাদবাক্য—

১। ফিকিরে ধরেছি বগ
পীরকে দেব লাউ-এর ডগ।

[অর্থাৎ নদী পার হয়ে কুমীরের কলা দেখানো।]

২। বন-মুরগী দিয়ে পীরের ধার শোধ।
[অর্থাৎ এতই যদি দয়া করলে, বনে-বাদাড়ের একটা ফড়িং তুমিই ধরে খাও।]

৩। বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘরও মানে না।

৪। তোমার পীর শিন্নি খেয়েছে।
[অর্থাৎ পীর কখনও শিন্নি খাওয়ার জন্য লোভী নন। যদি পীর তা খান তবে তিনি আদৌ পীর নন। শিন্নি-খেকো পীর অবজ্ঞার পাত্র। অন্য মতে—যেমন—তোমার ঠাকুর কলা খেয়েছে। অর্থ,—তুমি তো ভাগ্যবান।]

৫। সরষে ক্ষেতে পড়্
গুলী খেয়ে মর।
মুকি আর আল্লা
বল্‌তি দেলে না।।
(মুকি = মুখে, বল্‌তি = বল্‌তে, দেলে = দিলে।)
—শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদ।
[অর্থাৎ স্বাধীনতাকামী যোদ্ধা তিতুমীরের অনুগামীগণ বৃটিশ-কামানের 'গোলার' আঘাতে নিহত হওয়ায় মৃত্যুর পূর্বে তারা আর আল্লার নাম নেবার সময় পায় নি। অর্থাৎ কামানের গোলার কাছে তিতুমীরের গোলী খা-ডালেগা'-এ উদাত্ত আওয়াজ নিষ্ফল।]

৬। নিষেধ করি তোরে হরি
যাস্‌নে তুই দরগা-বাড়ি।
[অর্থাৎ হিন্দুত্ব ত্যাগ করে পীরের দরগায় আনুগত্য দেওয়া হিন্দু-সংস্কারে গুরুতর অপরাধ। অর্থ : যা করিস তা করিস্, যেন নিষিদ্ধ স্থানে বা কাজে না যাস্।]

৭। আজ বেদুড়ের হাট।
দাড়ি কাস্তে দিয়ে কাট।
(বেদুড়ে = বাদুড়িয়া)
—শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে বাদুড়িয়া অঞ্চলের প্রবাদ।

৮। চেয়ে খেকো পীর।

[অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি পীরের আচরণ-বিরুদ্ধ। তবু যদি তিনি তা করে থাকেন তবে তিনি ভণ্ড পীর।]

(জ) পীরকে নিয়ে অনৈস্লামিক আচরণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপক প্রবাদবাক্য—

১। পীরের শিরি হারাম।

[অর্থাৎ পীরকে মান্য করায় অপরাধ নেই—কিন্তু পীরকে পূজা দিয়ে শিরি দান বা গ্রহণ মুসলিমের নিকট বে-শরা বা অনৈস্লামিক কাজ বলে গণ্য।]

২। পীর বরাবর নেড়ে
সোনার খুরে এড়ে,
ঘরের পাশে গেঁড়ে
যে বিশ্বাস করে
সে ভেড়ের ভেড়ে।

[অর্থাৎ পীরের মূল্য তাঁদের কাছে যাঁরা নেড়ে (অর্থাৎ ধর্মান্তরিত মুণ্ডিত-মস্তক বৌদ্ধগণ থেকে) মুসলমান। যারা পীর পূজায় বিশ্বাস করেন তাঁরা মূর্খ,—যেমন এঁড়ে গরুর সোনার খুর হয় বলে বিশ্বাস করা।]

বলা বাহুল্য, নানাজনে উপরোক্ত প্রবাদবাক্য সমূহের কয়েকটির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যাও করে থাকেন—যার বিতর্কমূলক আলোচনা এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বিপ্লবী গণতন্ত্র

সত্য রায়

পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ এক বিশ্বব্যাপী জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ঘটছে। এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশ এই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রয়েছে। কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত পূর্বশর্ত সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেইসব দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রধান বিষয় (agenda) হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, পশ্চিম ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি। আবার তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর বর্তমান রয়েছে এবং এই সব দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উদ্বোধন হয়েছে মাত্র। আবার কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব গভীরতায় প্রবেশ করছে এবং সমাজতন্ত্রমুখী পথ ধরেছে। যাই হোক, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়ার এক বৈচিত্র্য আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। এই প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছেন: সামাজিক বিপ্লব কেবলমাত্র একটা যুগের রূপেই আসতে পারে, যে যুগে অগ্রসর দেশগুলিতে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের গৃহযুদ্ধের সাথে মিলিত হয় অনুন্নত, পশ্চাৎপদ ও অন্যান্য নিপীড়িত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলির সমগ্র ধারা।*

কিন্তু প্রশ্ন হল, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে যে গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলছে, তার চরিত্রটা কি? কেউ কেউ মনে করেন যে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এই বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ারা হল মুখ্য শক্তি।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব

ক্লাসিক্যাল অর্থে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হল সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের বিপ্লব। অর্থাৎ ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যবর্তী কালপর্যায় হল

---

* Lenin: Coll. Works, vol-23, p. 60

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ। এই যুগে ফ্রান্স, ইতালী ও জার্মানীতে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে এক নতুন উন্নততর সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় বুর্জোয়ারা অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এ হল একটি শোষণভিত্তিক সমাজ থেকে আরেকটি নতুন শোষণভিত্তিক সমাজে উত্তরণ। কিন্তু সমাজবিকাশের ধারা অনুযায়ী এই উত্তরণ ছিল প্রগতিশীল, কেননা এ বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। আবার এই নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে নতুন শ্রেণীদ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছিল—বুর্জোয়াশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের উদ্বোধন হয়েছে। সুতরাং, এইসব দেশে বিপ্লবী প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ দুটি পৃথক স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে; বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর সমাপ্ত হবার পর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর শুরু হয়েছে। তাহলে এই বিপ্লবের সাথে বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিলই বা কোথায়, অমিলই বা কোথায়?

কোন যুগে এই বিপ্লব ঘটছে?

বর্তমানের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চরিত্র বিচার করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে কোন যুগে এই বিপ্লব ঘটছে? এবং যুগ-বিচারের প্রশ্নে মনে রাখতে হবে কোন শ্রেণী এই যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এবং এর প্রধান গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এই যুগের প্রধান মর্মবস্তু হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ। এবং এই যুগের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও তার সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা আজ সমাজবিকাশের নিয়ামক শক্তি। একদিকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি এবং তার গুণগত পরিবর্তন; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার দৃঢ় ও প্রচণ্ড অগ্রগতি আজ সদ্যস্বাধীন দেশসমূহের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপর প্রভাব ফেলছে। ফলে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ এই বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাথে সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম একত্রিত হচ্ছে এবং এই বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয়বিধ শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এই বিপ্লব হল এক নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে এই বিপ্লবের

কতকগুলি মূল বিষয়ে মিল রয়েছে। তা হল এই যে এই বিপ্লব প্রথমদিকে সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজগুলি সম্পন্ন করে। এই গণতান্ত্রিক কাজগুলি হল সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তি ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার অবসান। সেই জন্যই বলা হয় যে, এই বিপ্লব হল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব। লেনিন লিখেছেন যে, যে কোন জাতীয় আন্দোলনই মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন কারণ জাতীয় আন্দোলন হল প্রধানত কৃষক আন্দোলন।* কিন্তু এই বিপ্লবের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন একথাও বলেছিলেন যে এই আন্দোলন "গোড়ার দিকে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং সম্ভবত আমরা যা আশা করি তার চাইতে অনেক বেশি বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণ করবে।"** তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই নতুন ধরনের বিপ্লবের দুটি দিক আছে। এক হল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিক ; অন্যটি হল ধনতন্ত্রবিরোধী, বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক দিক। এই দ্বিতীয় প্রবণতা বর্তমান যুগে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে যার ফলে এ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের চৌহদ্দি পেরিয়ে যায়।

ভারতবর্ষ এখনো গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিপ্লবী শক্তিসমূহের সামনে প্রধান বিষয় হল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কর্তব্যগুলি সম্পাদন করা। স্বাধীনতালাভের পর থেকে ভারতবর্ষের শাসকগোষ্ঠী পুঁজিবাদী পথে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাচ্ছে। ফলে বিদেশী পুঁজির উপর তার নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। এই নির্ভরশীলতা তার অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ। তাই সমস্ত বিপ্লবী শক্তিসমূহের কাছে জাতীয় কর্তব্য হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রধানত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। আবার পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করার ফলে একচেটিয়া গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং একচেটিয়া গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে এখনো সামন্ততন্ত্রের অবশেষ রয়েছে। অতএব সামন্ততন্ত্র বিরোধী

* Lenin : Report of the Commission on the National and Colonial Questions.

** Lenin : Report to the Third Congress of the Communist International.

সংগ্রাম এখনো শেষ হয়ে যায় নি। মেহনতী কৃষকের স্বার্থে আমূল ভূমি সংস্কার গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর আশু বিষয়। এই দিক থেকে ভারতবর্ষের বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

অন্যদিকে, যেহেতু ভারতবর্ষ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু পুঁজিবাদের গভীরতর সংকট ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী পথের সংকটকে গভীরতর করে তুলেছে। ভারতে ইতিমধ্যে শ্রেণী বিভাজন শুরু হয়েছে এবং বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণী হিসাবে রূপ লাভ করেছে। পুঁজিবাদী পথের সংকটের ফলে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুতরাং ভারতে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম ক্রমশ গভীর গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করছে। এই দিন থেকে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্র রয়েছে। এই চরিত্রকে অস্বীকার করার অর্থ হল ভারতের বিপ্লবের বৈপ্লবিক মর্মবস্তুকে অস্বীকার করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ বিপ্লবের মুখ্য শক্তি কারা? জাতীয় বুর্জোয়া কি মুখ্য শক্তি?

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মুখ্য শক্তি

আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই বিপ্লবে বিভিন্ন শ্রেণী তাদের শ্রেণী লক্ষ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু বিচার করতে হবে যে কোন শ্রেণী প্রধানত এ বিপ্লবের গতিপথ নির্ধারিত করে এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। নিশ্চিতভাবে সেই শ্রেণী হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক (বিশেষ করে শোষিত ও মেহনতী অংশ) ও মধ্যস্তরের জনগণ (intermediate strata)।

কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে (এশিয়া ও আফ্রিকা) শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত দুর্বল যে সে এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে না। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব এই বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে প্রভাবিত করছে। এইসব দেশের কৃষক হল এই বিপ্লবের চালিকাশক্তি (driving force)। এবং এই সব দেশের কৃষক জনতার সাথে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী মৈত্রী এ বিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন কোন একটি দেশে শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী ছাড়া সেই দেশের বুর্জোয়াদের উপর বিজয় অসম্ভব, তেমনি একইভাবে

আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের মৈত্রী ছাড়া বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের উপর বিজয় অসম্ভব।* এই দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সাথে নিপীড়িত জাতিসমূহের ঐক্যের তাৎপর্য তুলে ধরে।

যাইহোক, প্রত্যেক বিপ্লবের লক্ষ্য হল কোন এক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পশ্চিম ইউরোপের বুর্জোয়া বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল বুর্জোয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এই নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কোন শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে? লেনিন রাশিয়ায় ১৯০৫ সালের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের কথা বলেছিলেন; কারণ শ্রমিক ও কৃষক ছিল সেই বিপ্লবের মুখ্য শক্তি। কিন্তু তৃতীয় দুনিয়ার বেশির ভাগ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং এই সব দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কোন শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, এ নিয়ে লেনিন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে আলোচনা করেছিলেন। তিনি এইসব দেশে কৃষক জনতা অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের একনায়কত্বের ধারণা তুলে ধরেছিলেন। "It is necessary in particurlar to direct all efforts towards applying the basic principles of the Soviet system to countries in which pre-capitalist relations prevail, by way of setting up 'Soviets of working people."** লেনিনের এ বক্তব্য স্মরণে রেখে বলা যায় যে এই সব দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হল শ্রমজীবী জনগণের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কারণ মেহনতী জনগণের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অ-ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করা সহজ হবে এবং এই একনায়কত্ব হল সমাজতন্ত্রে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উত্তরণের প্রধান শর্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যে সব দেশে শ্রমিকশ্রেণী তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সংহত করছে সেইসব দেশের শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীই হবে বিপ্লবের মেরুদণ্ড।

আজকের ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণী একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি; কারণ সংখ্যার দিক থেকে যেমন এই শ্রেণীর বিকাশ ঘটছে, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর

* An Outline History of the Communist International ; p. 85
** An Outline History of the Communist International ; p. 89

প্রভাব পড়ছে। বড় বড় শিল্পাঞ্চলে এর সংগ্রাম বেড়ে চলেছে; রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই শ্রেণী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামাঞ্চলেও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের ফলে গ্রামেও সামাজিক পৃথকীকরণ শুরু হয়েছে। আধা প্রলেতারিয় শ্রেণী, ক্ষেতমজুর ও দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং শ্রেণীসংগ্রাম বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক ও গ্রামের নিপীড়িত কৃষকের মধ্যে মৈত্রীর বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এরাই যৌথভাবে ভারতের বিপ্লবের প্রধান শক্তি। কাজেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম চালিকাশক্তি হল মধ্যস্তরের জনগণ। এই স্তরের মধ্যে পড়ে শহরের পেটিবুর্জোয়ারা। বিশেষ করে যে সব দেশ এখনো প্রাক-পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বা যে সব দেশে পুঁজিবাদের বিকাশ তেমন লক্ষণীয় হয় নি, সেই সব দেশে এই স্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরের জনগণ প্রধানত কৃষকসমাজ থেকে উদ্ভূত। এবং শহরের বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, সেনাবাহিনীর অফিসার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই স্তরের জনগণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী ও এমন কি পুঁজিবাদবিরোধী কর্তব্য সম্পাদনে আগ্রহী। আরব, আফ্রিকা ও এশিয়ার সমাজতন্ত্রমুখিন দেশগুলির অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে এরা বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দৃঢ়ভাবে ও বৈপ্লবিকভাবে সাধারণ গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করছে এবং জাতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে, সংস্কার সাধন করছে তা বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদবিরোধী চরিত্র গ্রহণ করছে। মূলত এদেরকেই বলা হয় বিপ্লবী গণতন্ত্রী। অধ্যাপক ব্রুটেন্টস বলেছেন যে 'বিপ্লবী গণতন্ত্র হল কৃষক জনতার রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত স্তর, সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামেও নিযুক্ত শহরের পেটিবুর্জোয়া ও আমূল সংস্কারপন্থী জাতীয় বুদ্ধিজীবী।"* কেউ কেউ মনে করেন যে জাতীয় বুর্জোয়ারা যেহেতু জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশীদার, সেহেতু জাতীয় বুর্জোয়াকেও বিপ্লবী গণতন্ত্রী বলা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা

* The New Type of Nattional Liberation Revolution : Problems of Peace and Socialism, January 1975,

মনে রাখা দরকার যে বিপ্লবী গণতন্ত্রের এক পুঁজিবাদবিরোধী প্রবণতা আছে : কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদী পথে আগ্রহী। তাই জাতীয় বুর্জোয়াদের বিপ্লবী গণতন্ত্রী বললে তাদের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে বড় করে দেখা হয়।

যাই হোক ভারতবর্ষের এই স্তরের জনগণের সক্রিয় ভূমিকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কংগ্রেসের মধ্যেও এরা এক দৃঢ় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যস্তরের জনগণের ভূমিকা যত বৃদ্ধি পাবে, তত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব গভীরতায় প্রবেশ করবে ও অধিকতর সুস্পষ্ট শ্রেণীচরিত্র গ্রহণ করবে এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতা লাভ করবে।

জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা

এই বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা বিচার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রণনীতি ও রণকৌশলের কেন্দ্রীয় বিষয়। এটা অনস্বীকার্য যে, সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের এক প্রগতিশীল ভূমিকা আছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে এই ভূমিকাকে বড় করে দেখলে বা ছোট করে দেখলে বিপ্লবী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির কমিউনিস্টদের প্রতি লেনিনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, এই সব দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের এক সাধারণ গণতান্ত্রিক উপাদান আছে যা শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এবং এ উপাদানকে কমিউনিস্টরা শর্তহীনভাবে সমর্থন জানায়। আবার তিনি এই সাবধানবানী উচ্চারণ করেছিলেন যে, এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা আছে ; কারণ এই সব দেশের বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিলেও এরা সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষও করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা বিচার করা উচিৎ।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে বুর্জোয়ারা শ্রেণী হিসাবে সম-প্রকৃতির (homogeneous) নয়। একচেটিয়া বুর্জোয়ারা নয়া উপনিবেশবাদের সামাজিকভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তাদের পাশাপাশি অ-একচেটিয়া বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশ রয়েছে। তারা সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামে আগ্রহী। কিন্তু তারা এই সংগ্রামে তাদের শ্রেণী লক্ষ্য অনুসরণ করে। তারা সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করলেও

পুঁজিবাদী পথ আঁকড়ে থাকে। এই কারণেই এই সংগ্রামে তাদের দ্বিধাচিত্ততা দেখা দেয় এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করার দিকে ঝোঁকে। "দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম যত তীব্র হয়, এবং মেহনতী মানুষের অংশগ্রহণ যত দুর্বার হয়ে ওঠে তত তারা বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকতে চায়। এইজন্যই তারা বিপ্লবের মুখ্য শক্তি (motive force) হতে পারে না।"*

আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে একদিকে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচণ্ড অগ্রগতি, অন্যদিকে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের গভীরতর প্রক্রিয়ার ফলে এক নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে ভারতে জাতীয় বুর্জোয়াদের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। যখন একচেটিয়া পুঁজিপতি, বৃহৎ বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুরা দেশের অর্থনীতিকে বিদেশী পুঁজির সাথে সংযুক্ত করতে আগ্রহী, তখন মাঝারি বুর্জোয়া বা ছোট বুর্জোয়ারা বিদেশী পুঁজিকে সংকুচিত করে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখতে চায়। তারা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ভারতের রাজনীতি কোন দিকে বাঁক নেবে তা নির্ভর করে এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াটির উপর। পুঁজিবাদের সংকট যত ঘনীভূত হবে ও সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা যত বাড়বে, তত জাতীয় বুর্জোয়াদের বিভিন্ন অংশ নতুন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাদের শ্রেণীস্বার্থ পূরণ করতে চাইবে।

অনেকে (যেমন সি. পি. এম) জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে পৃথকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি ধরতে পারছে না। তাই তাঁরা ভারতে দক্ষিণপন্থী বিপদ সম্পর্কে সচেতন নন। বরং তাঁরা অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতা থেকে চরম দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাথে আঁতাত করে প্রগতির শিবিরে ফাটল ধরাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কংগ্রেসের পেটিবুর্জোয়া চরিত্র প্রবল হয়েছে। কংগ্রেস যে পুঁজিবাদী পথ অনুসরণ করছে তা তাঁরা অস্বীকার করতে চান। জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে যে পৃথকীকরণ তীব্র হয়ে উঠছে তা পুঁজিবাদী পথের সংকটেরই প্রতিফলন। কিন্তু তা বলে তারা পুঁজিবাদী পথ ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী গণতন্ত্রের পথ গ্রহণ করেছে, এ ভাববার কোন অবকাশ নেই। এটা সত্য যে তারা জাতীয়করণ, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, একচেটিয়া-

* The New Type of National Liberation Revolution ; Problems of Peace and Socialism, Jan. '75

বিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ; কিন্তু এ সবই রাষ্ট্রের পুঁজির বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত। তাঁরা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে আগ্রহী ; কারণ তা রাষ্ট্রীয় পুঁজির অবস্থানকে সংহত করে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেমন বিদেশী পুঁজির অবস্থানকে সংকুচিত করে, তাকে প্রতিরোধ করতে এ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মারফৎ জাতীয়-বুর্জোয়া নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে। জাতীয় বুর্জোয়ার দক্ষিণপন্থী অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে চায় বৃহৎ পুঁজিকে সুসংহত করার জন্যে।

যাই হোক, এই পৃথকীকরণের ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষের প্রভাব ও আঘাত করার ক্ষমতা বাড়ছে। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার লড়াইতে শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য হল জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে এই পৃথকীকরণের প্রক্রিয়াটি কাজে লাগানো এবং কংগ্রেসের বাইরে ও ভেতরের বাম ও গণতান্ত্রিক অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পথ প্রস্তুত করা।

পরিশেষে, বিপ্লবী গণতন্ত্র ও জাতীয় গণতন্ত্র দুটো আলাদা ধারণা (concept) নয়। এটা হল এমন একটা উত্তরণকালীন সমাজ গঠন যা এখনো সমাজতন্ত্র-ও নয়, অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও নয় ; এটা সমাজতন্ত্রের অভিমুখে একটা বিরাট পদক্ষেপ।* এবং এর মূল শ্রেণীভিত্তি হল শ্রমিক, কৃষক জনতার এক বিরাট অংশ ও শহরের পেটিবুর্জোয়ারা। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অবস্থা অনুযায়ী জাতীয় বুর্জোয়া এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই বিপ্লব তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিকাশের তারতম্য থাকায় পৃথক পৃথক জাতিগত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করছে। তাই এর সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি সামনে রেখে বিভিন্ন দেশে এর বিভিন্ন রূপকে বিচার করতে হবে।

---

* Lenin : Impending Catastrophe and How to Combat it (vol 25, P. 360).

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস

অসিত রায়

ভূমিকা

বর্তমানে পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব ঘটছে। কিন্তু এই বিপ্লবের প্রভাব কেবলমাত্র উন্নত দেশগুলির উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্নভাবে এবং বিচিত্র পথে তার ফলাফলগুলি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে। ভারতবর্ষ তৃতীয় দুনিয়ার সবচেয়ে শিল্পোন্নত এবং অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তনের সূচনা করেছে এবং তার ফলে এ দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের মুক্তি আন্দোলনের সামনে কি কি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে—এই প্রশ্নগুলি স্বভাবত আমাদের আকৃষ্ট করে। সমস্যা-গুলি জটিল। হয়ত এই মুহূর্তেই সেগুলির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। একক প্রচেষ্টার ক্ষমতাও খুব সীমিত।

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য আজকের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবকে অনুধাবন করার জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসকে একটি পটভূমিরূপে তুলে ধরার প্রচেষ্টা। এ কাজটা নিতান্ত প্রাথমিক হলেও অপরিহার্য। অপরিহার্য তার কারণ এ যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব একটা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং সমগ্র ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বারংবার সংঘটিত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক মননের যে বিকাশ ঘটেছে তারই ফলশ্রুতি। তাছাড়া এ যুগের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের তাৎপর্য এবং এ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন যেমন—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব বলতে কি বোঝায়, কেমনভাবে তা ঘটে প্রযুক্তিগত বিপ্লবের সামাজিক ফলাফল কি ইত্যাদির ব্যাপারে দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদই যে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসই দিতে পারে।

বিজ্ঞান কি ?

আলোচ্য মূল বিষয় আরম্ভ করতে গেলে 'বিজ্ঞান কি' এই প্রশ্নের সম্পর্কে একটা ধারণা উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে। কারণ এ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটা সাধারণ প্রচলিত ধারণা হল বিজ্ঞান কেবলমাত্র সুশৃংখল, সুসংবদ্ধ সাধারণ বুদ্ধি (organised common sense) দ্বারা আবিষ্কৃত জ্ঞান। কিন্তু ধারণাটা ভুল। সাধারণ বুদ্ধি বা common sense দিয়ে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি, কিন্তু আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও অবস্থানগত ধারণার সীমার বাইরে যেতে পারি না। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা দেখি পৃথিবী স্থির এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগুলি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, বা উত্তর মেরুতে যেটা উপর দিক দক্ষিণ মেরুতে সেটাই নীচের দিক অথবা প্রত্যেক সরলরেখাই একটি বক্ররেখা এবং পর্যবেক্ষকের অবস্থান অনুযায়ী সরলরেখা বক্ররেখা হয়ে যায়—এইসব বৈজ্ঞানিক সত্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কাজেই বিজ্ঞানকে কেবলমাত্র উন্নত ও সুসংবদ্ধ সাধারণ বুদ্ধি বলা যায় না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে অনেকে অভিন্ন বিষয় মনে করেন। প্রযুক্তি-বিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন কোন বিশেষ যন্ত্র বা টেক্‌নিক্ কিংবা কোন রাসায়নিক পদার্থের বিশেষ ব্যবহার আবিষ্কার করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য তেমনি অনেকের ধারণায় বিজ্ঞানেরও সার্থকতা হল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। একথা অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং ইতিহাসের ধারায় এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব দুই জ্ঞানজগৎকে সুদৃঢ় এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত করেছে। কিন্তু তবু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা এক নয়। অতীতেও তারা পৃথক বিষয় ছিল এবং বর্তমানেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তার কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার মূল লক্ষ্য আলাদা। বিজ্ঞানের কাজ বস্তুজগৎ ও মনোজগতের সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, তাদের বিভিন্ন বিষয়ের চরিত্র অনুধাবন করা, পরিবর্তনের নিয়মাবলীকে জানা এবং অজ্ঞাত বিষয়কে উদ্ঘাটন করা। প্রযুক্তিবিদ্যার কাজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এবং আবিষ্কার, তথ্য ও জ্ঞাত নিয়মগুলিকে ব্যবহার করার উপায়, পদ্ধতি ও কলাকৌশল নির্ণয় করা। নিছক জানার কৌতূহল বা কেবলমাত্র আবিষ্কারের প্রেরণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছে এ যাবৎ কাল ধরে। তাই বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারগুলির কোন তাৎক্ষণিক ব্যবহার না থাকতেও পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ফটোগ্রাফির তত্ত্বের আবিষ্কার হয়েছিল ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু ১১২ বছর পরে তার ব্যবহার হয়। টেলিফোনের তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু টেলিফোন আবিষ্কৃত হয় তার ৫৬ বৎসর পরে। মেণ্ডেলের বংশগতির তত্ত্ব দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত হয়ে পড়ে ছিল। মোটের উপর, বহু ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা কোন ব্যবহারিক মোটিভ দ্বারা পরিচালিত হয় না। আবার কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা আবিষ্কারের ব্যবহারিক মূল্য আছে কিনা তাও তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় না এবং অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানের অভাবে সেটি দীর্ঘদিন পড়ে থাকে।

কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার (technology) ক্ষেত্রে ব্যবহারিক মূল্যই (utilitarian value) মুখ্য ব্যাপার। উৎপাদনগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানোই প্রযুক্তিবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই প্রয়োজন কতখানি মিটল তার দ্বারাই এর সার্থকতার বিচার। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে. ডি. বার্নালের (J. D. Bernal, Science in History ; Penguin book vol. I. p. 42) অভিমত হল—The fundamental aspects of scientists and engineers are radically different. The scientists' prime business is to find out how to do things and engineers to get it done. তাহলে দেখা যাচ্ছে পরমাণু জগতের রহস্য অনুসন্ধানের জন্য পারমাণবিক বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কৃত নিয়মকে অ্যাটমবোমা অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদন অথবা চিকিৎসার কাজে ব্যবহারের জন্য পারমাণবিক প্রযুক্তি-বিদ্যা। অবশ্য পারমাণবিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পরস্পরের উপর নির্ভর-শীল। একটির ক্ষেত্রে বিকাশ অপরটির ক্ষেত্রে বিকাশকে সাহায্য করে। কিন্তু আবার উভয় ক্ষেত্র এক নয়—দুটি ক্ষেত্রেরই আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে। ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় প্রযুক্তিবিদরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করলেও অভিজ্ঞতালব্ধ ট্রাডিশনকেও খুব বেশী গুরুত্ব দেন। ট্রাডিশনের মূল্য হল যে, এর উপর নির্ভর করে কাজ করলে ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অতীতে যদি কোন কৌশল বা পদ্ধতি কার্যকর হয়ে থাকে আজ এবং ভবিষ্যতেও একই কৌশলের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তিগত কাজ চলতে পারে। কিন্তু ট্রাডিশানের দুর্বলতা হচ্ছে যে এর দ্বারা গতানুগতিক রীতিকে ভঙ্গ করে নতুন কিছু করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তা ট্রাডিশানের

উপর নির্ভর করে কিছুদূর অগ্রসর হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকে বাতিল করে নতুন পথে এগিয়ে চলে। ট্রাডিশানকে ভাঙতে গেলে ব্যর্থতা ও ভুল বারংবার হবার সম্ভাবনা আছে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বিষয়গুলির আবিষ্কার এবং উন্নতির একটা পরম্পরা (succession) আছে। এই ক্রমানুসারে গণিতের উন্নতি সর্বপ্রথম এবং তারপর অন্যান্য বিজ্ঞানগুলি যথা জ্যোতির্বিদ্যা, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি পরপর উন্নত হয়েছে। অপরদিকে প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাস লক্ষ্য করলে মোটামুটিভাবে একটা বিপরীত ক্রম (sequence) দেখা যায়। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমাজ সংগঠন ঘটেছে সর্বপ্রথম এবং তারপর শিকার পদ্ধতি, পশুপালন পদ্ধতি, কৃষিকার্য, মৃৎপাত্র নির্মাণ, রন্ধনশিল্প, বয়নশিল্প, ধাতু নিষ্কাশন, যান নির্মাণ, নৌবিদ্যা, স্থাপত্য, যন্ত্রশিল্প এবং ইঞ্জিন-নির্মাণ পদ্ধতি একে একে আবিষ্কৃত হয়েছে। মানবসমাজে সুপ্রাচীন বিজ্ঞানগুলির অন্যতম হচ্ছে জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy)। কিন্তু মহাকাশ অভিযান, যা প্রযুক্তিগত উন্নতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, মানব-সমাজের আধুনিকতম কীর্তি। আবার মানব সভ্যতার প্রাথমিক যুগেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল এবং সামাজিক উৎপাদন শুরু করেছিল। অথচ সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে অতি সাম্প্রতিক কালে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতির ক্ষেত্রে দুই পরস্পর বিপরীত ক্রম দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির নিয়ন্ত্রক অবস্থাগুলি আলাদা।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মানুষ সর্বপ্রথম তার জৈব পরিবেশ বা সমাজকে উন্নত করার টেকনিক আয়ত্ত করেছিল এবং তারপর সে ধীরে ধীরে অজৈব প্রকৃতির উপর তার নিয়ন্ত্রণকে বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। জীবন সংগ্রামে জয়লাভের প্রয়োজনে প্রত্যেক মানুষকেই (একমাত্র বিশেষ সুবিধা-ভোগী শ্রেণীগুলি ছাড়া) কমবেশী পরিমাণে প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রচেষ্টার সাথে জড়িত থাকতে হয়েছিল। কৃষকরা কৃষির উন্নতির চেষ্টা করেছে, কারিগররা কুটির শিল্পের বিকাশের জন্য চেষ্টা করেছে এমনকি রাজা ও সামন্তপ্রভুরাও পাবলিক ওয়ার্কস অর্থাৎ জলসেচ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে নতুন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য চেষ্টা করেছে। কারণ জীবন সংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার যে ব্যবহারিক মূল্য

তাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতির ক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সমাজের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির দ্বারা। সমাজের শাসকশ্রেণীই চিরকাল ধরে বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা Patron। অর্থ সাহায্য ছাড়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা অসম্ভব। শাসকশ্রেণীই নানা উপায়ে—যথা ব্যক্তিগতভাবে, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারী দপ্তর মারফৎ অর্থ সাহায্য করে বিজ্ঞানীদের ও গবেষণাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। স্বভাবতই শাসকশ্রেণীর সমস্যা, ইচ্ছা ও অভিরুচির দ্বারাই অনুসন্ধানের বিষয়গুলি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাই দাসযুগে বিজ্ঞানী বলতে বোঝাতো প্রধানত যাদুকর, রাজজ্যোতিষী এবং রাজবৈদ্য। প্রজাদের ও বহিঃশত্রুকে বিমূঢ় করার জন্য যাদুবিদ্যা। গণিতের প্রয়োজন ছিল প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ, রাজস্বের হিসাব ও যুদ্ধ কৌশল নির্ণয়ের জন্য। পঞ্জিকা সংশোধন (calendar reform) এবং সম্রাট ও রাজপুরুষদের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার দরকার ছিল। তারপর রেনেসাঁর যুগে যখন সওদাগরি পুঁজির প্রতিনিধিরা শাসন ক্ষমতায় আসতে আরম্ভ করল তখনই শাসকগোষ্ঠীর একাংশ পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের উন্নতির জন্য আগ্রহী হল—কারণ এই বিজ্ঞানগুলির উন্নতি ছাড়া প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং উৎপাদনের দ্রুত বিকাশ সম্ভব ছিল না। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে দুই স্বতন্ত্র ধারায় এবং স্বতন্ত্র অবস্থায়। কাজেই ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে বারংবার কিন্তু দুই ক্ষেত্রে বিপ্লব যুগপৎ ঘটে নি। দুই বিপ্লবের মধ্যে একটা সময় ব্যবধান বা time lag আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রের বিকাশ ক্রমশ এই ব্যবধানকে হ্রাস করেছে এবং আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যে যুগপৎ বিপ্লব ঘটেছে সমগ্র মানব-সমাজের ইতিহাসে তা অনন্য ঘটনা। এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

বিজ্ঞানের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বার্নাল বলেছেন—বিজ্ঞান কেবলমাত্র চিন্তার ব্যাপার নয়। অনুশীলন (practice) বৈজ্ঞানিক গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বৈজ্ঞানিক চিন্তা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় অনুশীলনের মাধ্যমে, অনুশীলনের দ্বারাই তার উন্নতি হয় এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়েই নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার আবির্ভাব ঘটে। কাজেই বিজ্ঞানকে টেকনিক (technique) বা পদ্ধতি থেকে আলাদা

করে অনুধাবন করা অসম্ভব। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা বারংবার দেখি যে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে আবার এই দিকগুলি অনুশীলনের ক্ষেত্রেও নব নব শাখার জন্ম দিয়েছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল পদ্ধতিটা হল নিরীক্ষা (observation), পরীক্ষা (experiment), আবার নিরীক্ষা এবং সবশেষে সিদ্ধান্ত (conclusion)। কাজেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিরীক্ষার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারটি নিয়েই বিজ্ঞানীর সঙ্গে শিল্পীর (artist) পার্থক্য। বিজ্ঞানী ও শিল্পী দুজনেই প্রকৃতি, মানবসমাজ, মনোজগৎ এবং সমগ্র পরিবেশকে নিরীক্ষণ করেন। কিন্তু দুজনের উদ্দেশ্য আলাদা, কায়দাও আলাদা। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার (scientific observation) উদ্দেশ্য নিরীক্ষিত বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনার মধ্যে সম্পর্কগুলি (relations) তাদের প্রকৃতি ও নিয়মাবলী আবিষ্কার করা। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানীর নিজের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রুচি, ভাবাবেগ ইত্যাদির কোন স্থান নেই এবং এইগুলিকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখে অর্থাৎ dispassionately নিরীক্ষণ করাটাই বিজ্ঞানীর কাজ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিজ্ঞানী উদ্দেশ্যহীন বা অচেতন ভাবে কাজ করেন। আসল কথা; বৈজ্ঞানিক মানসের কাছে কারুর ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় কথা নয়, নিয়মই বড় কথা কারণ জাগতিক পরিবেশ মানুষের শত যুক্তিপূর্ণ আবেদন নিবেদনেও সাড়া দেয় না। অন্যদিকে শিল্পীর নিরীক্ষার উদ্দেশ্য তাঁর নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যা তিনি দেখছেন তাকেই নব রূপে সৃষ্টি করা। যা আছে সেখান থেকে শুরু করে যা নেই তাকে ইচ্ছা, অনুভূতি, যুক্তি ও আবেগ দ্বারা গড়ে তোলাই শিল্পীর কাজ। তাই বিজ্ঞান সঠিক পথনির্দেশ করে কিন্তু প্রেরণা দেয় না। শিল্প প্রেরণা দেয় কিন্তু বিজ্ঞানকে অবলম্বন না করলে পথনির্দেশে ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞান বলতে পারে কেমন করে একটা কাজ করতে হবে এবং সে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা বলে দিতে পারে মানুষ কি করতে চায়। বৈজ্ঞানিক অবস্থান (scientific mode) থেকে কোন কিছু করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা যায় না কিন্তু কেউ করতে চাইলে তার উপায় বাৎলে দেওয়া যায়। কিন্তু শিল্পগত অবস্থান (artistic mode) থেকে মানুষের মনে একটা কিছু করার ইচ্ছা, দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রেরণার সঞ্চার করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব জগতে ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষ দুরকম অবস্থানই গ্রহণ করে এবং করতে বাধ্য হয়। তা নাহলে মানুষ বাঁচতে পারেনা। কারণ Scientific এবং artistic mode

পরস্পরের পরিপূরক—একটার অভাবে চেতনা জগৎ অসম্পূর্ণ থাকে এবং তার দ্বারা মানুষের পক্ষে দৈহিক ও মানসিক কোনভাবেই বাঁচা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানের একটি সম্পূর্ণ সংজ্ঞা এক কথায় দেওয়া যায় না। জে. ডি. বার্নাল (J. D. Bernal, Science in History vol I. p. 31) বিজ্ঞানের সবগুলি বৈশিষ্ট্যকে একত্রে প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছেন—Science may be taken as an institution, a method, a cumulative tradition of knowledge, a major factor in maintenance and development of production and as one of the powerful influences moulding beliefs and attitudes to the universe and man.

বিজ্ঞান নানা শাখায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক শাখারই একটা নিজস্ব অনুসন্ধানের রাজ্য (domain) বা ক্ষেত্র (area) আছে। আবার প্রত্যেক শাখার অনেকগুলি প্রশাখা রয়েছে। বিজ্ঞানের এইসব শাখা ও প্রশাখায় বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে, নানারকম আবিষ্কার হচ্ছে, বহুরকম নিয়ম জানা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের এইসব শাখা ও প্রশাখাগুলিতে ক্রমশ যতই specialization ঘটছে ততই এগুলি আপেক্ষিকভাবে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আপেক্ষিকভাবে স্বনির্ভরতা অর্জন করছে। কিন্তু বিজ্ঞানের নানা শাখা ও প্রশাখার অনুসন্ধানের বিষয়গুলি, তত্ত্বসমূহ ও সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলির মধ্যে সংযোগ আছে এবং সংযোগসূত্রগুলি একটা সমন্বয়কারী তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তাত্ত্বিক ভিত্তিটাই বিজ্ঞানের মূল বিষয়। এ সম্পর্কে আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা (Albert Einstein, The Fundaments of Theoretical Physics : Out Of My Later Years: Thames and Hudson ; London 1950, p. 98) উদ্ধৃত করছি। আইনস্টাইন লিখেছেন—'Science is an attempt to make the chaotic diversity of our sense experience correspond to a logically uniform system of thought. In this system single experiences must be correlated with the theoretic structure in such a way that the resulting co-ordination is unique and convincing. The sense experiences are the given subject matter. But the theory that shall interpret them is man made. It is the result of extremely laborious process of adaptation : hypothetical, never completely final, always subject to question and donbt. From the very beginning

there has always been present the attempt to find a unifying theoretical basis for all these single sciences, consisting of a minimum of concepts and fundamental relationship, from which all the concepts and relationships of the single disciplines might be derived by logical process. This is what we mean by the search for a foundation of the whole of physics.

আইনস্টাইনের মূল বক্তব্য হল—বিজ্ঞান এমন একটা প্রচেষ্টা যা আমাদের অনুভূতিলব্ধ বিচিত্র ও বিশৃংখল অভিজ্ঞতাগুলিকে একটা যুক্তিপূর্ণ সুষম প্রকৃতির চিন্তা পদ্ধতির সঙ্গে মেলাতে পারে। এই পদ্ধতিতে একক অভিজ্ঞতা-গুলিকে তাত্ত্বিক কাঠামোর সঙ্গে এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যাতে এই সমন্বয়টা অনন্য এবং বিশ্বাসযোগ্য হয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে ন্যূনতম কতকগুলি ধারণা ও মৌলিক সম্পর্ক দ্বারা গঠিত একটা তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে। ঐ তাত্ত্বিক ভিত্তিটা এমন হওয়া দরকার যার থেকে প্রত্যেক বিজ্ঞানের ধারণা ও সম্পর্কগুলিকে যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করা যায়। পদার্থ বিদ্যার ভিত্তি বলতে আমরা ঐ তাত্ত্বিক ভিত্তিকেই বুঝি।

আইনস্টাইনের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমগ্র বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তিকেই ব্যাখ্যা করেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব বলতে কি বোঝায়—এটাই এখন আলোচ্য প্রশ্ন। প্রশ্নটি নিয়ে যথেষ্ট ভেবে দেখার আছে। কারণ ব্যাপারটা খুব সরল বা সহজবোধ্য নয়। সমাজ-বিপ্লবের সঙ্গে এর তুলনা চলে কিনা এটাও প্রশ্ন।

মার্কসবাদী দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বিপ্লব হচ্ছে গুণগত এবং আমূল পরিবর্তন। পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে এবং তারই চরম পর্যায়ে গুণগত পরিবর্তন বা বিপ্লব ঘটে যার পরে অবস্থা বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। সমাজের ক্ষেত্রে প্রাক্ বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর অবস্থার মধ্যে পার্থক্য প্রকাশিত হয় উৎপাদন সম্পর্ক, রাষ্ট্রশক্তি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক গঠন এবং সাংস্কৃতিক জীবনের মাধ্যমে। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাক্ বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে প্রকাশিত হয়? বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞান কর্তৃক আবিষ্কৃত সত্য ও নিয়মাবলী কি মিথ্যা হয়ে যায়? এই সকল সত্যের ও নিয়মাবলীর গুণগত পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়?

দু-একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রশ্নটিকে আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যেতে পারে।

কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি পরিক্রমণ করছে। ষোড়শ শতকে অর্থাৎ রেনেসাঁ যুগে এই সত্যটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর শিল্প-বিপ্লব যুগে এবং বর্তমানে বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটেছে। কিন্তু কোপার্নিকাস কর্তৃক আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্য আজও বাতিল হয় নি। তাহলে ঐ দুটি বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞানের গুণগত পরিবর্তনটা কি হল? আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শূন্যে আলোর গতি এক সেকেণ্ডে দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার আটশ কিলোমিটার। এই সংখ্যাটা ধ্রুবক বা constant. আরও নিখুঁতভাবে হিসাব করলে হয়ত এই গতির পরিমাণকে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ অবধি পরিমাপ করা যাবে এবং সেই সংখ্যাটাই হবে ধ্রুবক। কোন বিপ্লব দ্বারা এই ধ্রুবক কি সম্পূর্ণভাবে বদলে যেতে পারে?

আলোর গতি এমন এক ধ্রুবক যাকে বিজ্ঞান অপরিবর্তনীয় সত্য বলে মনে করে। কিন্তু বিজ্ঞানে আরও অনেক ধ্রুবক আছে—যেমন ইলেকট্রনের ব্যাস, ইলেকট্রনের তড়িৎশক্তি, তার স্থিতিশীল ভর, প্লাংকের ধ্রুবক, অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক, ফ্যারাডে ধ্রুবক, মহাকর্ষ, অভিকর্ষ ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের বিপ্লব দ্বারা এই ধ্রুবকগুলিও পরিবর্তিত হয় না। তাহলে বিজ্ঞানের বিপ্লব কি গুণগত পরিবর্তন সাধন করে?

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য। এর অর্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি, আয়তন বৃদ্ধি, প্রসার ও গভীরতা বৃদ্ধি। বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং আজও ঘটছে কিন্তু এর সাথে গুণগত পরিবর্তনের পার্থক্যটা কোথায়?

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ও আবিষ্কারের সম্পর্কটাও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্বের ক্ষেত্রেই হোক আর বিষয়গত ক্ষেত্রেই হোক প্রত্যেক আবিষ্কারই একটা মৌলিক ব্যাপার। আবিষ্কার দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয় ফলে জ্ঞানজগতে একটা পরিবর্তন আসে। তাহলে প্রতিটি আবিষ্কারই কি বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটায়? তা যদি হয় তবে পরিমাণগত পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? আর তা যদি না হয় তবে কোন ধরনের আবিষ্কার দ্বারা বিজ্ঞানে বিপ্লব সূচিত হয়—

অর্থাৎ কোনটি বা কোনগুলি বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলে গণ্য হবে এবং তাদের দ্বারা বিজ্ঞানের গুণগত পরিবর্তনই বা কি হবে ?

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লবকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হলে উপরোক্ত প্রশ্নগুলি এসে পড়ে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব বলতে বোঝায় বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তির এবং মূল তাত্ত্বিক কাঠামোর পরিবর্তন। আমরা পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই আলোচনাকে আপাতত সীমাবদ্ধ রাখবো। কারণ পূর্ববর্তী আলোচনায় মূলত পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গেই তাত্ত্বিক ভিত্তির বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং তার পরিবর্তন প্রসঙ্গে আইনস্টাইন লিখেছেন (Albert Einstein, 1950, Out Of My Later Years, p. 99)—

"The word foundation in this connection does not mean something analogous in all respects to the foundation of a building. Logically considered, the various single laws of physics rest upon this foundation. But whereas a building may be seriously damaged by a heavy storm or spring flood, yet its foundation remaining in tact, in science the logical foundation is always in greater peril from any new experience or new knowledge than are the branch disciplines with closer experimental contacts. In the connection of the foundation with all the single parts lies its great significance, but likewise it greatest danger in face of any new factor. When we realize this, we are led to wonder why the socalled revolutionary epeochs of the science of physics have not more often and more completely changed its foundation than has actually been the case'.

[এক্ষেত্রে 'ভিত্তি' কথাটি বাড়ীর ভিতের সঙ্গে সর্বাংশে তুলনীয় নয়। যুক্তির দিক থেকে পদার্থ-বিদ্যার নানারকমের এক একটি নিয়ম এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একটা প্রচণ্ড ঝড় বা বন্যায় বাড়ী দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার ভিত্তি অক্ষত থাকে। বিজ্ঞানে কোন নতুন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দ্বারা বিজ্ঞানের শাখাগুলি (যা পরীক্ষার সাথে সংযুক্ত) যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারচেয়ে বিজ্ঞানের যুক্তিগত ভিত্তির বিপদ হয় ঢের বেশী। বিজ্ঞানের ভিত্তির বিরাট তাৎপর্য হল তার সাথে অন্যান্য অংশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবার একইভাবে নতুন কোন কারণের সম্মুখীন হলে এই ভিত্তির বিপদই সবচেয়ে বেশী।]

আইনস্টাইনের উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নবাগত ধারণা বা অভিজ্ঞতা যখন তার ভিত্তিকে পরিবর্তিত করে দেয় তখনই বিপ্লব ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানের বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য হল যে, ভিত্তি বদলালেও প্রশাখাগুলির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হতেও পারে। বিজ্ঞানের বিপ্লব দ্বারা আবিষ্কৃত তথ্য (data) সত্যগুলির (facts) কোন পরিবর্তন না ঘটতেও পারে কিন্তু পরিবর্তিত হয় ব্যাখ্যা (interpretation), যা মৌলিক ধারনার (fundamental concept) উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই বিজ্ঞানের বিপ্লব দ্বারা সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ বা কোন ধ্রুবকের মান ইত্যাদির পরিবর্তন হয় না। এগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি এবং সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি পরিমাণগত ব্যাপার। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যাকে যান্ত্রিক ভিত্তির (mechanistic foundation) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নিউটনের তাত্ত্বিক কাঠামোর তিনটি মূল ধারনা হল—(১) ভরবিন্দুর (mass point) ভর অপরিবর্তনীয় (২) যে কোন দুই ভরবিন্দুর মধ্যে ব্যবধান থাকা অবস্থায় ক্রিয়া (action at a distance) বা মহাকর্ষ (gravitation) (৩) ভরবিন্দুর গতির নিয়মাবলী (laws of motion)।

এই তিন মূল ধারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পদার্থ-বিজ্ঞান উনিশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত সমস্ত জাগতিক ঘটনাবলীর মোটামুটি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নিউটনের তত্ত্বে স্থান (space) এবং কাল (time) সম্পর্কে ব্যাখ্যা ছিল অপরীক্ষিত ও কাল্পনিক। ভরের সঙ্গে স্থান ও কালের সম্পর্ক কি তা নিউটন স্থির করতে পারেন নি। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্নস্টম্যাক স্থান সম্পর্কে নিউটোনীয় ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল ও হার্জের দ্বারা আবিষ্কৃত তড়িৎ চুম্বক তত্ত্ব নিউটন প্রবর্তিত action at a distance-এর ধারনার স্থলে field (ক্ষেত্র)এর ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করল। তারপর জে. জে. টমসন কর্তৃক আবিষ্কৃত ইলেক্ট্রন দ্বারা প্রমাণিত হল পরমাণু বা mass pointও বিভাজ্য এবং তার ফলে ভরের অপরিবর্তনীয়তা অস্বীকৃত হল। এইভাবে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে নতুন নতুন আবিষ্কারগুলি নিউটনের যান্ত্রিক ভিত্তির উপর আঘাত হানতে লাগল। শেষ পর্যন্ত নিউটোনীয় পদার্থ-বিদ্যার ভিত্তির সাথে নবাবিষ্কৃত সত্যগুলির দ্বন্দ্ব এমন চরমে উঠল পদার্থ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তির আমূল পরিবর্তন ছাড়া নবলব্ধ অভিজ্ঞতা, সত্য এবং

আবিষ্কারগুলির সঙ্গে মূল তাত্ত্বিক ভিত্তির সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হল। এই অবস্থাই হচ্ছে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রকৃত বিপ্লবাত্মক অবস্থা কারণ তাত্ত্বিক ভিত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করলে বিজ্ঞানের অন্তর্বিরোধকে আর মীমাংসা করা তখন সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় যে বিপ্লবটি ঘটল তার দ্বারা নিউটোনীয় পদার্থবিদ্যার ভিত্তি অর্থাৎ যান্ত্রিক ভিত্তি ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং তার স্থান দখল করল নতুন এক তাত্ত্বিক ভিত্তি—যাকে বলা হয় আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। আপেক্ষিকতাবাদী ভিত্তির (relativistic foundation) প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আলবার্ট আইনস্টাইনকে এ যুগের বিজ্ঞানের বিপ্লবের মহানায়করূপে গণ্য করা হয়।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের ভিত্তিকে পাল্টে দিয়েছে এবং ভর, শক্তি, গতি, স্থান এবং কালকে একসূত্রে গ্রথিত করে একটি অখণ্ড ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছে। কিন্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার ভিত্তিরূপে গৃহীত হলেও বলবিদ্যা (mechanics) অচল হয়ে যায় নি। বস্তুত ইঞ্জিনীয়ারিং এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে, এমন কি বিজ্ঞানের শাখাগুলিতেও আজও নিউটনের নিয়মগুলিই সর্বজনস্বীকৃত এবং ব্যবহৃত।

তাত্ত্বিক ভিত্তি সম্পর্কে আইনস্টাইনের ব্যাখ্যাকে যদি স্বীকার করা হয় তবে দেখা যায় মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ যাবৎ পদার্থ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ভিত্তির ক্ষেত্রে দুইবার বিপ্লব ঘটেছে এবং তিনরকম ভিত্তির উপর পদার্থ-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম যুগে পদার্থ-বিজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত এবং কতকটা কাল্পনিক বস্তুবাদী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ভিত্তিকে spontaneous materialistic foundation বলা যায়। এই ভিত্তির উপর প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক ও হিন্দু বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বহু কিছু আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু তখন বিশ্বের ঘটনাবলীকে গাণিতিকভাবে (mathematically) বা পরিমাণগতভাবে (quantitatively) ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি।

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান যান্ত্রিক ভিত্তির (machanistic foundation) উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় যুগে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের সূচনাকালের মধ্যে যান্ত্রিক ভিত্তির অবসান হল এবং তার স্থানে গড়ে উঠল আপেক্ষিকতাবাদী ভিত্তি (relativistic foundation)—যার উপর পদার্থ-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো আজ দাঁড়িয়ে আছে।

পরিশিষ্ট

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসের সঙ্গে মানব সমাজের উৎপাদন, অর্থনীতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের মননশীলতা, বুদ্ধি ও ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ, যা সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা ও সাংস্কৃতিক মানের ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠে। আবার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং মানুষের ভাবজগৎকে রূপান্তরিত করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে গোটা সমাজের এই পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতমূলক (interactive relation) সম্পর্ক বা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক উভয়ের বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ। কাজেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসকে উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী এবং সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে আলাদাভাবে অনুধাবন করা যায় না।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে. ডি. বার্নাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশের ইতিহাসে সমাজ বিকাশের ইতিহাসের পটভূমিকায় আলোচনা করে যে তুলনামূলক সারণী (Science in History, Table 1-7) দিয়েছেন তাকে অবলম্বন করেই নিম্নলিখিত স্তরগুলিকে সাজানো হয়েছে।

১। আদি প্রস্তর যুগ (Palaeolithic age)	খৃঃ পূঃ ৬ লক্ষ—খৃঃ পূঃ ৮০০০ বৎসর ব্যাপ্তি—প্রায় ৫ লক্ষ ৯২ হাজার বৎসর।
২। নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)	খৃঃ পূঃ ৮০০০—খৃঃ পূঃ ৩৫০০ বৎসর ব্যাপ্তি—প্রায় ৪৫০০ বৎসর। ভারতে প্রাক্ হরপ্পা যুগ (খৃঃ পূঃ ৪০০০ —খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর।
৩। ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze age)	খৃঃ পূঃ ৩৫০০—খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর ব্যাপ্তি—প্রায় ১৫০০ বৎসর। ভারত সিন্ধু সভ্যতার (মহেঞ্জোদেড়ো ও হরপ্পা) যুগ—খৃঃ পূঃ ২৫০০—খৃঃ পূঃ ১৮০০ বৎসর।

৪।	আদি লৌহ যুগ (Early iron age)	খৃঃ পূঃ ২০০০—খৃঃ পূঃ ৫০০ বৎসর ব্যাপ্তি—প্রায় ১৪০০ বৎসর। ভারতে বৈদিক যুগ—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩০০০—খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর।
৫।	প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ (Early historic period)	খৃঃ পূঃ ৬০০—৫০০ খৃষ্টাব্দ। ব্যাপ্তি—প্রায় ১১০০ বৎসর। ভারতে বৌদ্ধ যুগ—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬০০—৬০০ খৃষ্টাব্দ।
৬।	মধ্য যুগ (Middle age)	৫০০ খৃষ্টাব্দ—১৪৫০ খৃষ্টাব্দ। ব্যাপ্তি—প্রায় ৯৫০ বৎসর। এই সময়কালে ভারতে বৌদ্ধ যুগের অবসান হয়, হিন্দু যুগের পুনরভ্যুত্থান ঘটে এবং তারপর মুসলমান আমল সুরু হয়।
৭।	রেনেসাঁ যুগ (Renaissance period)	১৪৫০ খৃষ্টাব্দ—১৬৫০ খৃষ্টাব্দ। ব্যাপ্তি—প্রায় ২০০ বৎসর। ভারতে পাঠান রাজত্বের শেষ হয়ে মোগল আমল সুরু হয়।
৮।	শিল্প বিপ্লবের যুগ (Period of industrial revolution)	১৭৫০ খৃষ্টাব্দ—১৯০০ খৃষ্টাব্দ। ব্যাপ্তি—প্রায় ২৫০ বৎসর। ভারতে মোগল যুগের অবসান হয় এবং ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হয়।
৯।	পারমাণবিক যুগ (Atomic age)	
	(ক) প্রথম স্তর।	১৯০০ খৃষ্টাব্দ—১৯৪০ খৃষ্টাব্দ।
	(খ) দ্বিতীয় স্তর বা বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের স্তর।	১৯৪০ থেকে আরম্ভ।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক যুগগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবস্থার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপ, প্রধান প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং সাংস্কৃতিক জগতের চেহারার একটি বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

প্রাগৈতিহাসিক কাল

যুগ এবং স্থায়িত্বকাল	আদি প্রস্তর (৬ লক্ষ বৎসর)	নব্য প্রস্তর (৪ হাজার ৫ শত বৎসর)	ব্রোঞ্জ (১ হাজার ৫ শত বৎসর)	লৌহ (১ হাজার ৪ শত বৎসর)
খাদ্যোৎপাদন ও যানবাহন	শস্য এবং ফলমূল সংগ্রহ শিকার, ডিঙি বা ক্যানো নির্মাণ	কৃষিকার্য, পশুপালন, খাদ্য সঞ্চয় স্থায়ী কৃষিভূমি	জলসেচ, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, চাকা যুক্ত গাড়ি, রথ	কপিকল দিতে জল তোলা, পাম্প, সাম্যুদ্রিক নৌকা
উৎপাদন যন্ত্র ও উপকরণ	পাথরের অমসৃণ হাতুড়ি, কুড়ুল, বল্লম এবং তীরধনুক	মসৃণ পাথরের অস্ত্র, ছুতোরের কাজ, প্রাকৃতিক সোনা সংগ্রহ	ধাতুর ব্যবহার, ব্রোঞ্জের অস্ত্র, বর্ম, খনি শিল্প	লৌহ ব্যবহার, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ
আবিষ্কার ও উৎপাদিত সামগ্রী	আগুন আবিষ্কার, মাংস পোড়ান, চামড়ার পোষাক, ঝুড়ি, দড়ি, মাছ ধরার জাল	সূতো কাটা, বয়ন শিল্প, কুঁড়ে ঘর কাঠের বাড়ি, মৃৎপাত্র, বন্ধন, অলংকার মদ চোলাই	ইঁটের বাড়ি, পাথরের বাড়ি, চেয়ার, টেবিল, পালিশ করা পাত্র	কাচ, রং, ভেষজ ও ঔষধের উন্নতি
সামাজিক গঠন	টোটেম গোষ্ঠী, গুহা, জংগল ও নদীতীরে বাস, শ্রেণীহীন সমাজ	গ্রাম জীবন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, শ্রেণী বিভাগের সূচনা	শহর, মন্দির, রাজা, পুরোহিত, বণিক, আইন, সম্পত্তি, নগর, রাষ্ট্র, রাজা দাসতন্ত্র	সাধারণতন্ত্রী সরকার, শ্রেণী সংগ্রাম, ব্যাপক যুদ্ধ
বুদ্ধি ও সংস্কৃতির মান	কথ্য ভাষা, নৃত্যগীত, কল্প কাহিনী, চিত্র, ভাস্কর্য, যাদু বিদ্যা, ভেষজ বিদ্যা, শল্য চিকিৎসা, শিকার ও সংকারের মন্ত্র	পঞ্জিকা, জ্যামিতিক পরিকল্পনা, রূপক, সৃষ্টি-তত্ত্ব, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির মন্ত্র	রাশিমালা, হিসাব, লেখা, ওজন, পাটিগণিত জ্যামিতি, সৌর পঞ্জিকা, চিকিৎসা, রসায়ন, ধাতু-বিদ্যা	বর্ণমালা সাহিত্য মুদ্রা অংক দর্শন জ্যোতির্বিদ্যা

প্রযুক্তিগত ও ভৌগলিক আবিষ্কার

১। দাসতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের কাল।

(ক) প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ ঃ

(১১ শত বৎসর)

বড় বড় খনি, ধাতু নিষ্কাশনের উন্নত পদ্ধতি, শহর পরিকল্পনা, জাহাজ নির্মাণ, সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা, জলসেচ বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি।

(খ) মধ্য যুগ ঃ

(৯ শত ৫০ বৎসর)

চীন থেকে ইউরোপে রেশম আমদানী, চীনে ছাপাখানার আবিষ্কার, ইউরোপে যুদ্ধ জাহাজ ডাইকিং নির্মাণ, চীন থেকে ইউরোপে জুতো তৈয়ারীর পদ্ধতি রপ্তানী, পারস্যে উইণ্ডমিল ও লেন্স আবিষ্কার, স্পেনে কাগজ আবিষ্কার, অ্যালকোহল, নাবিকদের কম্পাস, চীনে বারুদের আবিষ্কার, ইউরোপে যান্ত্রিক ঘড়ি, চশমার আবিষ্কার, অয়েল পেন্টিং।

২। সামন্ততন্ত্রের পতন—সওদাগরী পুঁজির চরম বিকাশ ও শিল্প পুঁজির সূচনার কাল।

(ক) রেনেসাঁ যুগ ঃ

(২ শত বৎসর)

উন্নত ধরনের কম্পাস, মানচিত্র, বহুপ্রকারে আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশন, কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কো ডা গামার ভারত আবিষ্কার, মেগালনের পৃথিবী পরিক্রমন, লিওনার্ডো দ্য ভিচির চিত্রাবলী, অ্যালকেমি থেকে রসায়ন, এগ্রিকোলা কর্তৃক ভূতত্ত্বের গোড়াপত্তন, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ তত্ত্ব, মার্কাটরের মানচিত্র, চুম্বকের ব্যাপক ব্যবহার, বিদ্যুৎশক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, টেলিস্কোপ, লিয়েনহুক কর্তৃক মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার, পেণ্ডুলাম আবিষ্কার, গ্যাসের ব্যবহার।

(খ) শিল্প বিপ্লবের যুগ ঃ

(২ শত ৫০ বৎসর)

বাষ্পীয় পাম্প, ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ, কোক কয়লার সাহায্যে লৌহ নিষ্কাশন, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন, হারগ্রীভসের সুতাকাটার কল, শক্তিচালিত

তাঁত, জেমস ওয়াটের ইঞ্জিন, হাইপ্রেসার ইঞ্জিন, প্রিস্টলে কর্তৃক অক্সিজেন আবিষ্কার, ষ্টিভেনসনের রেলইঞ্জিন, বিসিমার্স কনভার্টার, ওপেনহার্থ ফার্নেস, ইস্পাত, টেলিগ্রাফ, ডায়নামো, এডিসন কর্তৃক ইলেকট্রিক বাল্ব এবং চলচ্চিত্রের আবিষ্কার, হার্জের বেতার তরঙ্গ, অ্যান্টিসেপটিক ঔষধ, ইমিউনাইজেশন, মোটর গাড়ী আবিষ্কার, ইস্পাতের ক্রোম, রি-ইনফোর্সড কংক্রীট, কৃত্রিম রং, উন্নত চিকিৎসা প্রণালী।

৩। সাম্রাজ্যবাদের পতন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির কাল

(ক) পারমাণবিক যুগ—প্রথম পর্যায়

(৪০ বছর)

ইলেকট্রিক বাল্ব, রেডিও টেলিফোন, মোটরগাড়ী ও বিমান শিল্পের দ্রুত প্রসার, বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ, বহুপ্রকার এসিড উৎপাদন, মাস স্পেক্টোগ্রাফ, ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ী, বেতারবার্তা, প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট, সেলুলোজ, প্ল্যাস্টিক, রেয়ন, কয়লা থেকে নানা প্রকার রং, ঔষধ এবং কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম উৎপাদন, ট্রান্জিস্টর, কম্বাইন, রাডার, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার ও সাইবারনেটিক্সের সূচনা, জেট প্লেন, রকেট, ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপ, টেলিভিসান, পলিমার, অটোমেশান, ট্রেসার মৌলের সাহায্যে রোগ নির্ণয়।

জীববিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে—ভিটামিন ও এনজাইম আবিষ্কার, ভাইরাস আবিষ্কার, কৃত্রিম প্রজনন, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ, কেমোথেরাপি, ফটো সিন্থেসিস, হর্মোন, ইনসুলিন, জিন ও ক্রোমোসোম আবিষ্কার, কেলাসিত ভাইরাস, অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ, সালফোনামাইড, আধুনিক প্রজনন বিদ্যা।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগ—বর্তমান পর্যায়।

(১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সুরু)

পারমাণবিক চুল্লী, সাইবারনেটিকসের প্রসার, টেলিভিসান প্রোগ্রাম, রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা, স্বয়ংক্রিয় কারখানা, অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা, ট্রানজিস্টার, ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশে প্রথম মানুষ, সুপার কণ্ডাকটার, লেসার, মেসার, কৃত্রিম খনিজ পদার্থ আবিষ্কার,

অতি কঠিন বস্তু আবিষ্কার, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত, চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ, গ্রহান্তর অভিযান, সাগর তলদেশের মানচিত্র।

জীববিদ্যা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে—পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি বহুপ্রকার অ্যান্টিবায়োটিক, যক্ষ্মার পূর্ণ নিরাময়, নিউক্লিক অ্যাসিড, ডি. এন. এ এবং আর. এন. এ আবিষ্কার, পারমাণবিক জীববিদ্যা, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার, মৃতের পুনর্জীবন দান, কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি, বায়োনিকস্ বা জৈব যন্ত্রবিদ্যা।

দর্শন ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞান

১। দাসতন্ত্র—সামন্ততন্ত্রের কাল।

(ক) প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ—ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, থেলসের প্রাকৃতিক দর্শন, পিথাগোরাসের জ্যামিতি ও গণিত, হেরাক্লিটাসের দ্বান্দ্বিক দর্শন, ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ, সক্রেটিসের দর্শন, প্লেটোর ভাববাদ, অ্যারিস্টটলের তর্কশাস্ত্র ও দর্শন, ইউক্লিডের জ্যামিতি, এরাসিসট্রাসের অস্থি-বিদ্যা, এপিকিউরাসের পরমাণুতত্ত্ব, অ্যাপোলোনিয়াসের ত্রিকোণমিতি, আর্কিমিডিসের প্লাবিতা সূত্র এবং বলবিদ্যা, লিউক্রেসিয়াসের পারমাণবিক বস্তুবাদ, প্লিনির এনসাইক্লোপিডিয়া, গ্যালেনের চিকিৎসা বিদ্যা, টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা, জেসিমাস কর্তৃক অ্যালকেমির সৃষ্টি।

(খ) মধ্যযুগ—ইউরোপে দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্রুত অধঃপতন এবং অন্ধকার যুগের আবির্ভাব, অ্যারিস্টটলের মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ভারতে দর্শন ও বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি, আর্যভট্ট বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ ও গণিত-বিদের আবির্ভাব, ভারতবর্ষে গণিতের বিস্ময়কর উন্নতি, হিন্দুগণ কর্তৃক শূন্য (০) আবিষ্কার, ব্রহ্মগুপ্তের বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতি, লীলাবতীর জ্যামিতি, সিরিয়ায় ভারতীয় গণিতের প্রবেশ, আরবী ভাষায় সংস্কৃত ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ, ইসলামিক জ্যোতির্বিদ্যা ও অন্যান্য বিজ্ঞান, সমরকন্দে মানমন্দির স্থাপন, ওমর খৈয়ামের কাব্য, অলবেরুনীর ভারতবিদ্যা, আরবী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে ভারতীয় গণিতের প্রবেশ, গ্রীক ও ইসলামিক বিজ্ঞানের মিশ্রণে খৃষ্টীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি, আরবগণ কর্তৃক বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা।

২। সামন্ততন্ত্রের পতন—সওদাগরী পুঁজির চরম বিকাশ ও শিল্প পুঁজির সূচনার কাল।

(ক) রেনেসাঁ যুগ—মানবতাবাদ, গ্রীক গণিতের পুনরাবিষ্কার, নটিক্যাল অ্যালমানাক, কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্ব, টাইকোব্রাহের জ্যোতির্বিদ্যা, কেপলার কর্তৃক গ্রহদের গতিতত্ত্ব, গ্যালিলিওর জ্যোতির্বিদ্যা, নেপিয়ারের লগারিথম্, ডেকার্তের দ্বৈতবাদী দর্শন, হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরিক্ষা, হবসের যান্ত্রিক বস্তুবাদ, স্পিনোজার যান্ত্রিক বস্তুবাদ, নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব, ক্যালকুলাস এবং গতির নিয়ম, নিউটনের আলোক তত্ত্ব, লিবনিৎসের ক্যালকুলাস, হাইজিনের আলোক বিজ্ঞান, টরিসেলির ব্যারোমিটার, বয়েলের গ্যাসসূত্র, হুকের নিয়ম, উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যার অগ্রগতি।

(খ) শিল্প বিপ্লবের যুগ ঃ

দর্শন—লকের দর্শন, বার্কলের ভাববাদ, হিউমের বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ, ভল্টেয়ারের মতবাদ, রুশোর সোস্যাল কনট্রাক্ট, কান্টের অজ্ঞেয়তাবাদী দর্শন, গোটের দর্শন ও কাব্য, হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদ, কমটের পসিটিভিজম্, ফয়ের ব্যাখের যান্ত্রিক বস্তুবাদ, মার্কস ও এঙ্গেলসের কমিউনিস্ট ইস্তাহার, ক্যাপিটাল, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, মাখের নয়া পসিটিভিজম, মার্কসবাদ ও অন্যান্য দর্শনের মধ্যে সংঘর্ষ।

বিজ্ঞান—স্ট্যাচির ফ্লজিস্টন তত্ত্ব, গ্রের বিদ্যুৎ পরিবাহিতাতত্ত্ব, লিনিয়াস কর্তৃক প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ, বাফোনের প্রাকৃতিক ইতিহাস, অ্যাডাম স্মিথের অর্থনীতি, ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্ব, জেমস হাটন কর্তৃক ভূতত্ত্বে ইউনিফরমিটারিয়ান পরিবর্তন তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন, ডাল্টনের পরমাণুবাদ, হুয়ের কেলাসবিদ্যা, লামার্কের বিবর্তনবাদ, কুভিয়ার কর্তৃক জীবপুরাবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন। বার্জিলিয়াসের অজৈব রসায়ন, ডুমা, লিবিগ, পাস্তুর এবং কেকুলে কর্তৃক জৈব রসায়নের প্রতিষ্ঠা, ফ্যারাডের কর্তৃক ইলেকট্রোলিসিস্ আবিষ্কার এবং তড়িৎচুম্বক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, বেল কর্তৃক স্নায়ুতন্ত্রের উপর পরীক্ষা, বেয়ারের ভ্রূণ সম্পর্কে গবেষণা, জীবকোষ আবিষ্কার, ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বক তত্ত্ব, হার্জ কর্তৃক বিদ্যুৎ তরঙ্গের ব্যাখ্যা, লিবিগ-এর চেষ্টায় কৃষি রসায়নের উৎপত্তি, ডারুইনের বিবর্তনবাদ, পাস্তুরের জীবানুতত্ত্ব, মেণ্ডেল আবিষ্কৃত বংশগতির

নিয়ম, ক্রুক ও টমসন কর্তৃক ক্যাথোডরে আবিষ্কার, ভূতত্ত্বে হিমযুগ ও ফসিল মানব আবিষ্কার, বেকারেলের দ্বারা তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার, রোন্টগেন কর্তৃক এক্সরে আবিষ্কার, টমসনের ইলেকট্রন আবিষ্কার।

৩। সাম্রাজ্যবাদের পতন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির কাল

(ক) পারমাণবিক যুগ—প্রথম পর্যায়।

দর্শন—মার্কসবাদের দ্রুত প্রসার, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী শোধনবাদ, নয়া পসিটিভিজম, অস্তিত্ববাদ, মার্কসবাদ ও অন্যান্য মতবাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ, নানা ধরনের প্যাসিফিজম্।

বিজ্ঞান—প্লাংকের কোয়ান্টামতত্ত্ব, মাদাম কুরী কর্তৃক রেডিয়াম পৃথকীকরণ, আইনস্টানের আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্রাবলী, ভর ও শক্তির তুল্যতা নির্ণয়, রাদার ফোর্ড কর্তৃক পরমাণুর গঠন সম্পর্কে নতুন ব্যাখ্যা, সডি কর্তৃক আইসোটোপ আবিষ্কার, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সাধারণ তত্ত্ব এবং মহাকর্ষের নতুন ব্যাখ্যা, নীলস বোর কর্তৃক বর্ণালীর নতুন তত্ত্ব, ডিব্রগলি, হাইসেনবার্গ এবং শ্রোয়েডিংগারের নয়া কোয়ান্টামবাদ, সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে জিনসের প্রকল্প, ডিরাকের তরঙ্গ তত্ত্ব, পরমাণু বিভাজন, মেসন আবিষ্কার, চাডউইক কর্তৃক নিউট্রন আবিষ্কার, অ্যাণ্ডারসন কর্তৃক বিপরীত কণা (anti particle) আবিষ্কার, পরমাণু-কেন্দ্রীন বিভাজন পদ্ধতি।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগ—বর্তমান পর্যায়।

দর্শন—মার্কসবাদের পক্ষে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমর্থন। বুর্জোয়া দর্শনের অবক্ষয়।

বিজ্ঞান—মেসন ফিল্ডতত্ত্ব, পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিশ্লেষণ, কোয়ান্টাম ইলেকট্রো ডায়নামিক্স, আইনস্টাইনের ইউনিফায়েড ফিল্ডথিয়োরী, ভ্যান-আলেন বন্ধনী, ভূতত্ত্বে মহাদেশীয় সঞ্চলন এবং মহাসাগরীয় খাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা, নব নব মৌলকণা আবিষ্কার, বস্তুর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থা—অর্থাৎ প্লাসমা, এপি প্লাসমা ও নিউট্রন অবস্থা, মহাবিশ্বের বয়স নির্ণয়, মহাবিশ্ব ও নক্ষত্রমণ্ডলীর জন্ম সম্পর্কে নতুন তথ্যাবলী।

রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী

১। দাসতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের কাল।

(ক) **প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ**—দাসতন্ত্রের প্রসার, গ্রীকসভ্যতা, ভারতে বৌদ্ধধর্ম, পারসিক ও গ্রীকদের মধ্যে যুদ্ধ, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, কার্নেজের যুদ্ধ, রোম সাম্রাজ্য, রোমের গৃহযুদ্ধ, ইহুদী বিদ্রোহ, পঞ্জিকা সংস্কার, খৃষ্টের জন্ম ও খৃষ্টধর্ম, গ্রীকসভ্যতার অবনতি, রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংস।

(খ) **মধ্যযুগ**—গ্রীকসভ্যতার অবসান, জাষ্টিনিয়ান কর্তৃক এথেন্স অ্যাকাডেমির বিলোপসাধন, পারস্যে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়, চীনে তাং-রাজত্ব, মহম্মদের জন্ম, পারস্য আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলাম ধর্ম, বাগদাদে খলিফাদের হারুণ অল রসিদ, ইউরোপে গল আক্রমণ, খলিফাদের পতন, ইউরোপে পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে যুদ্ধ, ক্রুসেডের যুদ্ধ, দাসতন্ত্রের পতন, সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি ও প্রসার, মোঙ্গলদের বাগদাদ আক্রমণ, পোপতন্ত্রে অভ্যন্তরীণ বিবাদ, শতবর্ষের যুদ্ধ, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ।

২। সামন্ততন্ত্রের পতন—সওদাগরী পুঁজির চরম বিকাশ ও শিল্প পুঁজির সূচনাকাল

(ক) **রেনেসাঁ যুগ**—ইতালিতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ, ফ্লোরেন্সে প্লাটোনিক আকাদেমী, বাণিজ্য ও শিল্পের দ্রুত প্রসার, মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে রিফরমেশন আন্দোলন, ফ্রান্সে ধর্মযুদ্ধ, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ, ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথের রাজত্ব, সওদাগরী পুঁজির দ্রুত প্রসার, বুর্জোয়া বিপ্লব, পুঁজিবাদ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের অভিযান, ব্রিটেন ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ, ভারতবর্ষ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশে সওদাগরী পুঁজির বাণিজ্য অভিযান।

(খ) **শিল্প বিপ্লবের যুগ**—ইউরোপে শিল্প পুঁজির দ্রুত বিকাশ, স্পেনে গৃহযুদ্ধ, রাশিয়ায় পিটার দি গ্রেটের শাসন সংস্কার, জার্মানীতে ফ্রেডারিখ দ্য গ্রেট, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন, পলাশীর যুদ্ধ, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ বিস্তার, আমেরিকায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ফ্রান্সে নেপোলিয়ানের শাসন ও ইউরোপে যুদ্ধ, ইউরোপে বুর্জোয়াশ্রেণীর নিরংকুশ ক্ষমতালাভ, শ্রমিক আন্দোলন, জার্মানী ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে শ্রমিক-শ্রেণীর বিপ্লবী অভ্যুত্থান, আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ, ফ্রাংকো প্রাসিয়ান যুদ্ধ,

জার্মানীর অভ্যুত্থান, একচেটিয়া পুঁজির জন্ম, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি, উপনিবেশিক জনগণের মুক্তি সংগ্রাম।

৩। সাম্রাজ্যবাদের পতন—সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির কাল

(ক) পারমাণবিক যুগ—প্রথম পর্যায়। রুশ জাপান যুদ্ধ, ১৯০৫ সালের প্রথম রুশ বিপ্লব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ায় নভেম্বর বিপ্লব, পুঁজিবাদী দুনিয়ায় যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দা ব্রিটেনে শ্রমিক ধর্মঘট, ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশে তীব্র মুক্তি-সংগ্রাম, চীনে বিপ্লবী লড়াই, জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরাজয় এবং নাৎসী অভ্যুত্থান, স্পেনে গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের যুগ—বর্তমান পর্যায়। হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত আক্রমণ, বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধ, ফ্যাসীবাদের ধ্বংস, পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র, ঠাণ্ডা লড়াই, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, চীনের জনগণতান্ত্রিক সরকার, কোরিয়ার যুদ্ধ, সুয়েজ-যুদ্ধ, হাঙ্গারীতে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান, চীনের ভারত আক্রমণ, কিউবায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিবিপ্লব, পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সহ-অবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ, চিলিতে প্রতিবিপ্লব, পর্তুগালে বিপ্লব, ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার মুক্তি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি সংক্রান্ত কর্মনীতির ভিত্তি

ফিয়োদর কুলাকভের রিপোর্ট

[ফিয়োদর কুলাকভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক।]

আমাদের দেশের ইতিহাস সোভিয়েত সমাজের অগ্রগতির প্রধান প্রধান দিকচিহ্ন জ্ঞাপক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীতে সমৃদ্ধ। পার্টি ও জনগণের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দশ বছর আগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসের অধিবেশন।

এই দশ বছরে যে পথ অতিক্রম করা গেছে তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে একথা বলার যথেষ্ট হেতু আছে যে, এই অধিবেশনের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলির ও ঐসব সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত কর্তব্যসমূহের তাৎপর্য এবং গ্রামাঞ্চলে ও সমগ্রভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এই অধিবেশনের গভীর ও প্রবল প্রভাবের দিক থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ মাসের অধিবেশন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আজকের দিনের কৃষি কর্মনীতির নীতিগুলি নির্ধারিত, কৃষির উন্নয়নের মৌল প্রশ্নগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত এবং এই সব প্রশ্ন মীমাংসার প্রধান কর্মধারাগুলি স্থিরীকৃত হয়। পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন সমাজতান্ত্রিক কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন স্তরের সূচনা করে।

১

কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের পরিসর যতই বাড়ছে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি পরিচালনার ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ততই আরও বেশী বেড়ে যাচ্ছে। পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে

লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছিলেন: "কমিউনিস্ট পার্টির কাজের প্রধান জিনিস হল সামাজিক বিকাশের সাধারণ সম্ভাবনাগুলি ছকে দেওয়া, নির্ভুল রাজনৈতিক কর্মধারা নির্ধারণ করা এবং ঐ কর্মধারা রূপায়ণের জন্য মেহনতি জনগণকে সংগঠিত করা।"

কৃষিসংক্রান্ত কর্মনীতি তার সাধারণ রাজনৈতিক কর্মধারার একটি প্রধান অচ্ছেদ্য অংশ এই কথা ধরে নিয়ে পার্টি অগ্রসর হয়। অতএব কৃষির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ সমগ্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত বলে মনে করা হয়।

কমিউনিস্ট নির্মাণকার্য চলতে থাকার সময় কৃষির ভূমিকা আরও বেড়ে যাচ্ছে এই প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি করেই পার্টি কাজ করে। সমগ্রভাবে অর্থনীতির পরিকল্পিত ও সুসম বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় শর্ত হল সুসমঞ্জসভাবে গড়ে ওঠা কৃষি উৎপাদন। অর্থনীতির নির্ভুল অনুপাতগুলি স্থির না করে এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলির সর্বাঙ্গীন বিকাশকে রূপায়িত না করে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত পরিসরে পুনরুৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে সুনিশ্চয় করা অসম্ভব।

জনগণের শ্রীবৃদ্ধি আরও ত্বরান্বিত করার জন্য পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে যে কর্মধারা উপস্থাপিত হয়েছিল খাদ্যশস্যের আবাদ ও গবাদি পশু প্রজননের সফল বিকাশকে তা' বাস্তবে রূপায়িত করার অন্যতম প্রধান শর্ত। আর প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয় জনকল্যাণ তহবিলের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই হল কৃষিজাত পণ্য এবং কৃষিজাত কাঁচামাল থেকে তৈরী পণ্যসমূহ। এই বিষয়টির গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেখানোর দরকার নেই। জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনগুলি যথাসম্ভব মেটানোই পার্টির অর্থনৈতিক কর্মনীতির পরম লক্ষ্য।

পার্টির প্রস্তাবগুলিতে যেভাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে সেইভাবে কৃষি উৎপাদনের আরও ত্বরান্বিত বিকাশ ঘটানোর প্রশ্নটি শুধু একটা অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বরং রাষ্ট্র ও পার্টির বড় একটা রাজনৈতিক কর্তব্য। লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছেন: "সোভিয়েত জনগণের স্বার্থে, কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের স্বার্থে আমাদের শুধু শক্তিশালী শিল্প থাকা দরকার তা, নয়, আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি ও শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে পারে এমন সুবিকশিত কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কৃষি কর্মনীতির মূল ধারকশক্তি হল যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের উৎপাদনের ক্রমাগত বৃদ্ধি, কৃষিকর্মের রূপান্তর এবং গ্রাম জীবনেরই পরিবর্তন। এই কর্মনীতি ধারাবাহিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষের কর্মের মূলে রয়েছে।

২

কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ-নৈতিক প্রকৃতির এক গোছা বড় রকমের ব্যবস্থা অবলম্বিত ও রূপায়িত হয়। সংক্ষেপে বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত এগুলি এইরূপ দাঁড়ায় :

প্রথমত, পরিকল্পনা নিখুঁত করে তোলা, খাদ্যসংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং কয়েক বছর আগে থেকেই কৃষিজাত পণ্যাদি ক্রয়ের জন্য স্থায়ী পরিকল্পনা-সমূহ গ্রহণ করা। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটা মূলত একটা নতুন ব্যাপার। পরিকল্পনার মূলগত উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি আরও যুক্তিসম্মতভাবে উৎপাদন সংগঠিত করতে পেরেছে, কাজে আস্থা সৃষ্টি হয়েছে, কৃষি পরিচালক ও গ্রামাঞ্চলের কর্মীরা অবাধে উদ্যোগ নিতে পেরেছে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা গড়ে তোলার ও সৃষ্টিশীল মনোভাব নিয়ে কাজ করার সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, গ্যারান্টি দেওয়া পারিশ্রমিক, কৃষিজাত পণ্যাদির বর্ধিত ক্রয়মূল্য, পরিকল্পিত ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য দেওয়ার এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে কাজে অর্থনৈতিক উৎসাহদানের ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করা। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ব্যাপারে লোকের বৈষয়িক আগ্রহ কার্যক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, কৃষিতে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার ব্যবস্থা জোরদার করা। রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে পুরোপুরি আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, শিল্প-সংস্থাগুলিতে হিসাব রাখার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে, যৌথ খামারগুলির জন্য ব্যাংকের ঋণদানের সুযোগসুবিধা নিখুঁত করে, যৌথ খামারগুলির উপর আয়কর ধার্যের নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করে এবং অন্যান্য কয়েকটি অর্থনৈতিক চালিকা-দণ্ড কাজে লাগিয়ে এ কাজটি করা গেছে।

মার্চ মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে নির্ধারিত অর্থনৈতিক নীতিগুলি পার্টির পরবর্তী প্রস্তাবগুলির দ্বারা আরও পূর্ণতা লাভ করে তাদের উঁচু দরের কার্যকারিতা দেখিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করেছে। এই নীতিগুলি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় উভয় প্রকার খামারগুলির সফল বিকাশ ও সংহতির অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের ফলপ্রসূ অর্থনৈতিক তৎপরতার, সামাজিক উৎপাদনে তাদের মুনাফা-যোগ্যতার ব্যাপক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছে।

কৃষি অর্থনীতিকে সবল করে তোলার কর্মধারা অনুসরণ করতে গিয়ে পার্টি পুঁজি লগ্নীর পরিকল্পনা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। সকলেরই জানা আছে যে, কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ মাসের অধিবেশনে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির মন্দগতির যেসব কারণ উদ্ঘাটিত হয় সেগুলির অন্যতম হল কৃষি বিরাট বিরাট কাজের সম্মুখীন হলেও সেসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি, যথোপযুক্ত পরিমাণ পুঁজি লগ্নী বরাদ্দ করা হয় নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিসভা গ্রামাঞ্চলের বর্ধিত অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিবেচনা করে কিছুটা পরিমাণে জাতীয় আয় পুনর্বণ্টন করা ও কৃষির ক্ষেত্রে পুঁজি লগ্নী বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করেন। নবম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে কৃষিতে লগ্নী করা পুঁজির অংশ জাতীয় অর্থনীতিতে মোট লগ্নীর পরিমাণ ২৬ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে। বিগত কয়েক বৎসরের তুলনায় এটা অনেক বেশী। পুঁজি লগ্নী সম্পর্কে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় এবং জাতীয় অর্থনীতির পরিকল্পিত ও আনুপাতিক বিকাশ ঘটানোর নিয়মের প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি আরও জোরদার করা, বৈষয়িক ও নৈতিক উৎসাহদানের ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার এবং একই সঙ্গে উভয় প্রকার উৎসাহদান, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির উন্নতিসাধন—এ সবই হল বড় রকমের সমস্যা এবং এগুলি সব সময়েই পার্টি ও রাষ্ট্রের মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে। পরিকল্পিত কর্মনীতি সফল করার উদ্দেশ্যে পার্টি কাজের সুষ্ঠু পদ্ধতি স্থির করেছে। এই সব কাজের মধ্যে সর্বাগ্রে যাতে হাত দেওয়া হয়েছে তা হল যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি দৃঢ়তর করা

এবং শিল্পের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলা। ব্যাপারটা হল প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও কারিগরী সহায়সম্পদের সাহায্যে কৃষি উৎপাদনের পরিকল্পিত বৃদ্ধির হার সুনিশ্চয় করা এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার-গুলির উৎপাদনকে আরও দ্রুত করে কারিগরী সাজসরঞ্জাম এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যগুলি কাজে লাগানোর মাত্রাকে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের স্তরে নিয়ে যাওয়া।

এই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে ১৯৬৫-১৯৭৪ সালের মধ্যে কৃষিতে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির তহবিলের ১১,৫০০ কোটি রুবল লগ্নী করা হয়েছে। এই পরিমাণ বিগত দশকের তুলনায় ২·৮ গুণ বেশী। এর ফলে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির বৈষয়িক ও কারিগরী ভিত্তি যথেষ্ট পরিমাণে দৃঢ়তর হয়েছে। ট্রাক্টর ও কৃষিযন্ত্রাদি নির্মাণ সংক্রান্ত শিল্পের অগ্রগতির জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে ক্রমেই বেশী পরিমাণে নতুন সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে কৃষিকর্মীর মাথা-পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষমতা ও পুঁজি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা যথাক্রমে ২·১ ও ২·৫ গুণ বেড়ে গেছে।

কারিগরী সাজসরঞ্জামের ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি বড় রকমের পদক্ষেপ করেছে। অবশ্য, নতুন নতুন যন্ত্র কৃষিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখন অনেক কিছু করার আছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার যন্ত্রীকরণের স্তর আশানুরূপ নয়, কাজেই উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য যন্ত্রাদি উৎপাদন বাড়াতে হবে। পুরাতন সাজসরঞ্জামের জায়গায় নতুন সাজসরঞ্জাম অবশ্যই যথারীতি বসাতে হবে এবং নতুন নতুন অতি আধুনিক মডেল ও যন্ত্রসমূহ গড়তে ও আয়ত্ত করতে হবে।

কিন্তু শুধু যন্ত্রের সরবরাহ বাড়িয়ে কৃষিতে কারিগরী অগ্রগতি ঘটানো যাবে না। এই প্রক্রিয়ায় অচ্ছেদ্য ও সক্রিয় উপাদান হল প্রত্যেকটি যন্ত্রের যথাযথ ব্যবহারের ক্ষমতা।

আমাদের পার্টি ভূমি পুনরুদ্ধার ও কৃষির রাসায়নীকরণের ন্যায় নিবিড়ী-করণের শক্তিশালী উপাদানগুলির ভূমিকার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে। পার্টি এই সব উপাদানকে কৃষির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ সাধনের, উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার—জমির আরও ভাল ব্যবহারের ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করছে।

কমরেড লিওনিদ ব্রেঝনেভের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৬৬ সালের মে

মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জমি পুনরুদ্ধারের একটি ব্যাপক ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী রচিত হয়। এখন এই কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে। যে কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তার বিরাট আকার ও ব্যাপকতা এবং উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিচায়ক বড় বড় আধুনিক সেচ ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে ঝোঁক এই কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য। জমি পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় কেন্দ্রীয় কমিটি, পলিটব্যুরো ও স্বয়ং লিওনিদ ইলিচ ব্রেঝনেভ সব সময়েই তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রাখছেন।

অপেক্ষাকৃত অল্পকালের মধ্যে জমি পুনরুদ্ধার কর্মসূচী রূপায়ণ কাজে দেশে বিরাট কাজ করা হয়েছে। ১৯৬৫-১৯৭৯ সালের মধ্যে ১ কোটি ৩০ লক্ষাধিক হেক্টর সেচ-সেবিত ও জল-নিষ্কাশিত জমি কাজে লাগানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ অধিবেশনের আগের দশ বছরের তুলনায় এইরূপ জমির পরিমাণ দ্বিগুণ। স্থিতিশীলভাবে তুলা, চাল ও অন্যান্য কৃষিজাত জিনিসের উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি সুনিশ্চয় করা হচ্ছে।

ভবিষ্যতে জমি পুনরুদ্ধার, সেচের ব্যবস্থা ও জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতি জমির উন্নতিবিধানের কাজ করতে গেলে আরও জটিল সব প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। সর্বোপরি এই কাজের সঙ্গে দেশের খাদ্যশস্যাদির ফলন এবং গবাদিপশুর খাদ্য উৎপাদনের সম্পর্ক আছে। শর্করা-বীট, তরিতরকারি ও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমি পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহারের কাজ রয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় কৃষির উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশসাধনে রাসায়নীকরণের ভূমিকা বিশেষভাবে বড় হয়ে উঠছে। গত দশ বছরে পার্টি ও সরকার রসায়নশিল্প গড়ে তোলার জন্য অনেক কিছু করেছেন। কৃষির জন্য রাসায়নিক সার সরবরাহের পরিমাণ ১৯৬৪ সালে ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ টন। ১৯৭৫ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন। আগাছা ও ক্ষতিকর কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন দ্রুতবেগে বাড়ানো হচ্ছে।

আজ রাসায়নিক সার ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এসব জিনিস প্রয়োগের দক্ষতাকে রীতিমত উন্নত করে তোলার সমস্যা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। সর্বত্র যথাযথভাবে এসব জিনিস ব্যবহার করা, অপচয় বন্ধ করা, সুষ্ঠু কৃষি কারিগরী সাহায্যদানের ব্যবস্থা সংগঠিত করা এবং

সমস্ত যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে রাসায়নিক সারগুলির ও সর্বপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবং জমি ও জলসম্পদ, বাতাবরণ, উদ্ভিদ ও পশুপক্ষী প্রভৃতি প্রকৃতির ঐশ্বর্য ব্যবহারের উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যে অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি রাসায়নীকরণ ও জমি পুনরুদ্ধার ব্যবস্থা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ মাসের অধিবেশন ও পার্টি কংগ্রেস ঐদিকে প্রচেষ্টা চালানোতে প্রবল উৎসাহ যুগিয়েছে।

কৃষির নিবিড়ীকরণ বিজ্ঞানীদের সামনে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তুলে ধরেছে। এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সঞ্চিত অভিজ্ঞতার গভীর বিশ্লেষণ, ব্যাপক অনুধাবন ও সামান্যীকরণের। হাতেনাতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের প্রত্যাশা হল এই যে, লগ্নী-করা পুঁজির কার্যকারিতা বাড়ানো, নানা ধরনের বিশেষ কৃষিপণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত খামারগুলির জন্য স্থায়ী উৎপাদন সম্পদের একটি যুক্তিসম্মত কাঠামো গড়ে তোলা এবং কৃষি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে লগ্নী থেকে আয় বাড়ানোর জন্য কোন কোন জিনিস ও কি অবস্থার দরকার হবে তা নির্ণয় করার দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি-অর্থনীতিবিদরা গভীর গবেষণায় লিপ্ত থাকবেন।

বিজ্ঞান আজ এমন এক প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা ব্যতিরেকে কোন শিল্পের অগ্রগতি অসম্ভব। আর কৃষির মত একটা জটিল ব্যাপারের ক্ষেত্রে একথা তো আরও বেশী খাটে।

কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সাফল্যগুলির প্রবর্তন নির্ভর করে কৃষিতে নিযুক্ত শীর্ষস্থানীয় কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও কর্মের স্তরের উপর। কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ অধিবেশনের পর দেশে কৃষিকর্মীদের অতিরিক্ত ও উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট পার্টি তার কৃষিসংক্রান্ত কর্মনীতিতে উৎপাদনের সাংগঠনিক রূপগুলির উন্নতিসাধনে এবং কৃষিসংক্রান্ত পরিচালন ব্যবস্থা আরও উন্নত করে তোলার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। এখন সামনে রয়েছে কৃষি উৎপাদনের বিকাশ ঘটানোর প্রধান কর্মধারা রূপে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় রূপে, বিশেষীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ।

কৃষিতে বিশেষীকরণ এক বহুমুখী প্রক্রিয়া। বিশেষীকরণের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে ভৌগোলিক-অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির মধ্যে। শিল্পের ভিত্তিতে গাছগাছড়া

এবং গবাদি পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি নির্মাণের মধ্যে এবং লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে পরিচালিত খামারগুলি ও তাদের অঙ্গসংস্থাগুলির বিশেষীকরণ গভীরতর হওয়ার মধ্যে বিশেষীকরণের প্রক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে।

পার্টি এই প্রতিজ্ঞা মেনে নিয়েই অগ্রসর হচ্ছে যে, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজের স্তর যত উন্নত হবে, অর্থনৈতিক সাফল্যগুলিও ততই বিরাট হবে।

সারা দেশে কৃষিজাত পণ্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রের কাছে এইসব পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা চলছে তা জনগণের সৃষ্টিশীল তৎপরতার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। আজ এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন কৃষিতে নিযুক্ত প্রায় সমস্ত কর্মী।

৩

বিগত দশকের ফলগুলি পরীক্ষা করে আমরা পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষি এই বছরগুলিতে বেশ ভালভাবেই এগিয়ে যেতে পেরেছে এবং ক্রমেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অগ্রগামী ক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেঝনেভের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর বিরাট সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজ এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির চাষী ও বিশেষজ্ঞদের, শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের এবং সমগ্র সোভিয়েত জনগণের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফল ফলেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মন্তব্য করা হয় যে, কৃষিতে অগ্রগতি সম্প্রতি কয়েক বৎসরে পার্টি ও কেন্দ্রীয় কমিটির তৎপরতার অন্যতম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফল।

প্রথমত এ কথা জোর দিয়ে বলা উচিত যে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। সপ্তম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে যেখানে ৬,৬৩০ কোটি রুবল মূল্যের গড় বার্ষিক মোট কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদিত হয় সেখানে গত পাঁচ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ৩০ কোটি রুবল। এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে দেশের সমস্ত ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ও আউলে।

প্রতি বছর বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদন স্তরের যে ওঠানামা দেখা যেত তা এখনও দেখা গেলেও অতীতের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

পার্টির কৃষিসংক্রান্ত কর্মনীতির ব্যবহারিক রূপায়ণ একটি প্রধান সমস্যা—খাদ্যশস্য উৎপাদনের সমাধানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে গড়ে বার্ষিক ১৯ কোটি ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। মার্চ মাসের (১৯৬৫) অধিবেশনের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের তুলনায় এই উৎপাদন প্রায় ৫০ শতাংশ বেশী।

কৃষিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল এই যে, অর্থনীতির এই ক্ষেত্র ক্রমেই উৎপাদনের রীতিমত নিবিড়ীকরণের পথ অনুসরণ করতে শুরু করেছে। বর্তমানে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মূলে আছে প্রধানত শস্য এবং গবাদি পশুর উৎপাদন বৃদ্ধির মত কৃষি নিবিড়ীকরণের উপাদানগুলি।

চলতি পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম চার বছরে খাদ্যশস্যের ফলন ৫০ শতাংশ বেড়ে হেক্টর প্রতি গড়ে ১৫·৬ সেন্টার দাঁড়িয়েছে। তুলার উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার দুই-তৃতীয়াংশের মূলে আছে তুলার ফলন বৃদ্ধি।

গবাদি পশুপালন ও প্রজনন কৃষির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখাও ক্রমেই নিবিড় ও গতিশীল বিকাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গবাদি পশু ও হাঁসমুরগীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ অধিবেশনের পর দুধের উৎপাদন ৫০ শতাংশ, মাংসের উৎপাদন ৮০ শতাংশ এবং ডিমের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সবের ফলে কৃষিজাত পণ্যাদি ক্রয়ের পরিমাণ এবং মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং সোভিয়েত জনগণকে উৎকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করা গেছে।

ভালোর দিকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এটা হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাওয়া এবং কৃষি উৎপাদনের কার্যকারিতার অন্যান্য লক্ষণ। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধিই রয়েছে উৎপাদনের সমগ্র বৃদ্ধির মূলে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির অর্থনীতির অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, তাদের আয় বেড়েছে এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মদক্ষতা বেড়ে গেছে।

কৃষি উৎপাদনের বিকাশের ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত সাফল্যগুলি লক্ষ্য করেও

একথা বলতেই হবে যে, আজ পর্যন্ত যে স্তরে পৌঁছানো গেছে সেই স্তর কৃষিজাত পণ্যাদি ও গবাদি পশুজাত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে সমাজের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর দিক থেকে যথেষ্ট বলে স্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয় কৃষিতে এখনও অনেক গলতি ও ভুলত্রুটি রয়েছে এবং এমন অনেক সম্পদ ও সম্ভাবনা আছে যেগুলি কাজে লাগানো হয় নি।

যেমন, অনুকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ফসলের ফলন ও গবাদি পশুর উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক পার্থক্য আমাদের আতঙ্কিত না করে পারে না। বহু যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারে উৎপাদন বাবদ শ্রম ও অর্থ ব্যয় ধীরে ধীরে কমানো হচ্ছে এবং যথেষ্ট তাড়াতাড়ি লগ্নীকৃত পুঁজি উশুল করা হচ্ছে না।

পল্লী অঞ্চলের সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যাপারটি পার্টির কৃষি-সংক্রান্ত কর্মনীতির অচ্ছেদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গত দশ বছরে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের সমান করে তোলা হয়েছে। যৌথ খামারের চাষীদের পারিশ্রমিক যথেষ্ট বেড়ে গেছে এবং এখন তাঁদের নিজস্ব পেনশন ও সামাজিক বীমা পরিকল্প আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ বিরাট আকারে এগিয়ে চলেছে।

উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধির সংগে সংগে আজকের দিনের কৃষককুলের সামাজিক পটভূমি ও মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটছে এবং তাঁদের সাধারণ শিক্ষার এবং সাংস্কৃতিক ও কারিগরী মান ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা শ্রম ও জনসাধারণের সম্পত্তির প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাব গড়ে তোলার ব্যাপারে ক্রমেই অধিকতর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করছে।

সামাজিক ব্যাপারগুলি দেখাশোনা এবং যৌথ খামারগুলির অভ্যন্তরে তথা যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির মধ্যে উৎপাদনের যোগসূত্রগুলি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যৌথ জীবন ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে ১৯৬৯ সালে যৌথ খামারগুলির নিখিল ইউনিয়ন কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত নতুন আদর্শ যৌথ খামার বিধিগুলি। এই সব বিধি লেনিনের সমবায় সংক্রান্ত পরিকল্পনার চিন্তাধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই আদর্শ যৌথ খামার বিধিগুলি যৌথ খামারের চাষীদের জীবন ও কর্মের নিয়ম। উল্লিখিত কংগ্রেসেই যৌথ

খামারগুলির নির্বাচিত পরিষদসমূহ গঠন করা হয়। জেলা, অঞ্চল, প্রদেশ, প্রজাতন্ত্র ও কেন্দ্রে এই সব পরিষদ এখন সক্রিয় ভাবে কাজ করছে।

পল্লী অঞ্চলের রূপান্তরের সামাজিক প্রক্রিয়া কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের জটিলতম সমস্যাগুলির অন্যতম। একেবারে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক মালিকানার দুটি রূপের বিকাশের সমস্যা, এই দুটি রূপের ক্রমেই আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা এবং একই রূপ কমিউনিস্ট মালিকানার মধ্যে এই দুটি রূপের মিলনের সমস্যাগুলিকে বিজ্ঞানীদের আরও বিস্তারিতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার। গ্রামাঞ্চলের সামাজিক বিকাশের অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কেও আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের ফলে। শহর ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানকে সমান করে তোলার জন্য আমাদের সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে হবে। গ্রামাঞ্চলের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করার কাজ একটা বড় রকমের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। এর ফলে সামাজিক পরিকল্পনার ভূমিকা বেড়ে গেছে। কৃষিকর্মীরা যাতে খুব বেশী পরিমাণ উৎপাদনের কাজ ও অর্থবহ আমোদ-প্রমোদের জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পায় সামাজিক পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থা রাখতেই হবে।

৪

সমাজতান্ত্রিক কৃষিকে তার উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে এইরূপ স্তরে তুলতেই হবে যা পার্টির কর্মসূচীতে নির্ধারিত কর্তব্যগুলি সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট হবে। এইসব কর্তব্য হল :

উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদির প্রাচুর্য সৃষ্টি করা এবং সোভিয়েত পল্লী অঞ্চলের ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট উৎপাদন সম্পর্কে উত্তরণ সুনিশ্চয় করা।

এ ব্যাপারে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের একটা সর্বব্যাপী পরিপ্রেক্ষিত বিশদভাবে স্থির করার বিপুল গুরুত্ব আছে। দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী অভিমুখিনতা অনুসারে এই কাজ করা হচ্ছে এবং এতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করছেন।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের কৃষির পক্ষে বিশেষ করে উৎপাদনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে এমন নতুন নতুন চিন্তাভাবনার

এবং উদ্ভিদ ও পশুর প্রকৃতি সম্পর্কে মৌল জ্ঞানের অবিরাম প্রবাহের প্রয়োজন বর্তমান। আবাদযোগ্য জমি চাষের ও গবাদি পশু পালনের কার্যকারিতা আরও বাড়ানোর জন্য বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলির ব্যাপক অনুধাবনের এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা প্রচেষ্টাকে সম্মিলিতভাবে চালানোর দরকার। প্রজননতত্ত্ব, শারীরবৃত্ত, রসায়নশাস্ত্র ও জীবরসায়নশাস্ত্র, অনুজীববিদ্যা, অংকশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, বলবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান-সমূহের সাফল্যগুলির সফল প্রয়োগ ব্যতিরেকে কৃষির অগ্রগতি সাধন অসম্ভব।

পল্লী-অঞ্চলে সংস্কৃতি ও দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে গবেষণা চালানো, নতুন মানুষ গড়ে তোলা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কৃষি কর্মনীতি ও তার সাফল্যগুলি সম্পর্কে সক্রিয় প্রচার চালানোর সময় সমাজবিজ্ঞানসমূহ কৃষিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের পন্থা নির্ধারণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে।

যেসব বিজ্ঞানী কৃষিতে মৌল ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলিত সমস্যাগুলি নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন এবং এই উদ্দেশ্যে যুক্ত গবেষণা কর্মসূচীগুলির সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাচ্ছেন সেই সব বিজ্ঞানীর গোষ্ঠীগুলিকে আরও সংহত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন দরকার। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ (সি এম ই এ) ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাফল্যগুলির এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতার বিনিময় ব্যবস্থা আরও সক্রিয়ভাবে উন্নত করে তোলা এবং যুক্তভাবে আধুনিক শিল্পোৎপাদনের ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদনের প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা দরকার।

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে জোর দিয়ে বলা হয় যে, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক পরিচালনার সংস্থা ও পন্থার উন্নতিসাধন অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রধান উপায়। ব্যাপারটি হল সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতা ও গুণগত স্তরকে চূড়ান্ত ভাবে উন্নত করা, এই উৎপাদনের বিকাশের উচ্চহার ও নিবিড় চরিত্রকে সুনিশ্চয় করা এবং লগ্নী পুঁজি, বর্তমান উৎপাদনক্ষমতা, শ্রম ও বৈষয়িক সম্পদ আরও ভাল ভাবে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানো।

অর্থনৈতিক কর্মনীতির এই সব পথনির্দেশক আগামী পাঁচ বছরেও সোভিয়েত জনগণের তৎপরতার ভিত্তি হবে। পরবর্তী পাঁচ বছর সর্বোপরি

জনগণের আরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য উৎকর্ষ ও কার্যকারিতার কাল হবে—একথা বলেছেন লিওনিদ ব্রেঝনেভ। কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন ও সংগ্রহণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে উৎকর্ষের উপাদানগুলি ক্রমেই বড় স্থান অধিকার করছে। কৃষিতে উৎকর্ষের জন্য সংগ্রামের অর্থ চাষ-আবাদ ও গবাদি পশু পালনের ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠু হওয়া, এবং শ্রম ও উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক সংগঠন। এর অর্থ প্রতি হেক্টর জমিতে আরও বেশী ফলন, লগ্নী করা প্রতিটি রুবল থেকে এবং প্রতিটি কাজের ঘণ্টা থেকে আরও বেশী আয়।

সাথীগণ,

জনগণ কর্তৃক সক্রিয়ভাবে সমর্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির মার্চ মাসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের কর্মধারা তার বিরাট প্রাণশক্তি প্রমাণ দিয়েছে। পার্টি কর্তৃক নির্ধারিত কৃষির অবিরাম উন্নতির রাজনৈতিক কর্মধারা পার্টি, সরকার, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহ, ট্রেড ইউনিয়নসমূহ, কমসোমোল, গবেষণা পরিষদসমূহ, আমাদের সমস্ত কর্মী এবং লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের কৃষি উৎপাদনে আরও বেশী ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে হাতেনাতে কাজ করার পর্বতদৃঢ় ভিত্তি।

জীবনে যেসব নতুন নতুন কর্তব্য এবং প্রয়োজন দেখা দেবে সেগুলি যথাযথ ভাবে বিবেচনা করে পার্টি কমিউনিজম গড়ে তোলার জন্য তার কৃষিসংক্রান্ত কর্মনীতির ক্ষেত্রে অবিচলভাবে এই লেনিনবাদী কর্মধারা অনুসরণ করবে এবং এই কর্মধারাকে সৃষ্টিশীল ভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

(সংক্ষেপিত)

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৩০তম বর্ষে জি ডি আর জনগণের- নতুন সংকল্প

[জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, রাষ্ট্র-পরিষদ, মন্ত্রিপরিষদ এবং জাতীয় ফ্রন্টের জাতীয় পরিষদ ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তির ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে জি ডি আরের জনগণের উদ্দেশে যে ইস্তাহার প্রচার করেছেন তার প্রধান কয়েকটি অংশ নিচে উপস্থিত করা হল।]

হিটলারের ভেরমাখট-এর (সৈন্যবাহিনীর) নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে যে জয়লাভ স্বাক্ষরিত, ফ্যাসিস্ট জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্রদের সেই জয়লাভের ৩০তম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে ১৯৭৫ সালের ৮ মে তারিখে। সমগ্র প্রগতিশীল মানবজাতি এই মুক্তিদিবস উদযাপন করছে ইউরোপে। এই মুক্তি দিবসে সবচেয়ে রক্তাক্ত ও বিপর্যয়কর যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। এসেছিল ফ্যাসিস্ট জোয়াল থেকে আমাদের মহাদেশের জাতি-সমূহের মুক্তি। জার্মান জনগণ পেয়েছিল মুক্তি। জার্মান রাইখের পতনের ফলে পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে পথ ধরে অগ্রসর হয়ে আমাদের জার্মান গণ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৫ সালের ৮ মে তারিখে আন্তর্জাতিক শক্তি সম্পর্ক মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। সকল মহাদেশের জনগণের বিপ্লবী তৎপরতা গতিলাভ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শক্তি ও কর্তৃত্ব এবং বিশ্ব সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে ইউরোপে স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রের আরও অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যে জয়লাভ অবর্ণনীয় আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে লাভ করা গিয়েছিল তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এবং থাকবে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সাফল্য এবং আমাদের রিপাবলিকের কৃতিত্বসমূহ। লালফৌজের বীরদের উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করি। আমরা প্রণত হই তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা যুদ্ধের ফ্রন্টে ও প্রতিরোধ আন্দোলনের ফ্রন্টে ফ্যাসিবাদের

বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবনদান করেছেন, যাঁরা নাৎসী বর্বরতার বলি হয়েছেন। ফ্যাসিস্ট জার্মান সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল গোটা বিশ্বকে বিরাট একটি বন্দিশিবির করে তুলতে, চেয়েছিল সকল জাতিকে নির্মূল করতে—এবং এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করার কাজ শুরু করেও দিয়েছিল। তাদের হাত রক্তমাখা হয়ে আছে ২ কোটি সোভিয়েত নাগরিক, ৬০ লক্ষেরও অধিক পোলিশ, ১৭ লক্ষ যুগোস্লাভ, ৬ লক্ষ ফরাসী, ৪ লক্ষ আমেরিকান ও ৩,৭৫,০০০ ব্রিটিশ সমেত প্রায় ৫ কোটি মানুষের রক্তে। ফ্যাসিস্ট যুদ্ধে জার্মান জনগণকে মূল্য দিতে হয়েছে ৬০ লক্ষেরও অধিক মানুষের জীবন দিয়ে।

মৃতদের উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা দায়বদ্ধ। বহু কষ্টে অর্জিত শান্তিকে রক্ষা করার জন্য সবকিছু করতে হবে আমাদের, বিশ্বের সকল অংশে গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়কে চালিত করতে হবে ন্যায়ের দিকে। আমাদের রিপাবলিক এবং রিপাবলিকের অধিবাসী—আমরা ইতিহাসের পাঠ ও আমাদের যুগের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মহান লক্ষ্যসাধনে দায়বদ্ধ। যে যুগ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ।

জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে নির্ধারিত পথ ধরে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়ে এই দেশের শ্রমজীবী জনগণ মুক্তি দিবসের স্মৃতিকে পোষণ করে সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, শান্তিকে স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করে এবং জনগণের সুখী জীবনের জন্য নতুন ধ্যানধারণা ও কর্মকাণ্ড দিয়ে।

১

জার্মান ফ্যাসিবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদী পর্বের ধনতন্ত্রের দানবীয় ফল। তার সন্ত্রাসের ব্যবস্থায় ও জাতিবৈষম্যবাদে হিংস্রতমরূপে প্রকাশ পেয়েছিল শোষণের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আগ্রাসী ও মানবতা-বিরোধী প্রকৃতি। জার্মান একচেটিয়াপতি ও বৃহৎ জমিদারদের জন্য বিশ্বকে পদানত করার কাজ হাতে নিয়েছিল হিটলারী ফ্যাসিবাদ। অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড প্রথম বলি হয়েছিল। অন্য ইউরোপীয় দেশগুলির অধিকাংশকে কবলিত করার পরে হিটলারী ফ্যাসিবাদ কথার খেলাপ করে ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে বসে। সে চেয়েছিল মানবজাতির ইতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে, মানবিক অগ্রগতির পুরোধাকে ধ্বংস করতে।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সর্বোপরি দুই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেকার তীব্র সংঘর্ষ এবং একদিকে ফ্যাসিস্ট জার্মান রাইখের মধ্যে মূর্ত সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রূপ এবং অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মূর্ত প্রস্ফুটমান সমাজতন্ত্রের মধ্যেকার সামরিক সংঘাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ফ্রন্ট হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত-জার্মান লড়াইয়ের ফ্রন্ট। যে-সব লড়াই যুদ্ধের গতি নির্ধারণ করেছিল তা লড়তে হয়েছিল এখানেই। ফ্যাসিস্ট ভেরমাখটকে পিষে মারার মতো পরাজয় হানতে পেরেছিল লালফৌজ, যা অবশেষে ফ্যাসিস্ট জার্মান রাষ্ট্রের সামরিক ধ্বংস ঘটায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ ইতিহাসের নিয়মসঙ্গত, যেমন সঙ্গত নাৎসী জার্মানীর পরাজয়ও। লেনিনের পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ শুধু এক সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অপর সৈন্যবাহিনীর জয়লাভ নয়। এই জয়লাভ ছিল বর্বর সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একান্ত মানবিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জয়লাভ। এই জয়লাভ ছিল দাস-প্রভুদের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্ত শ্রমিক ও কৃষকের জয়লাভ ছিল মানবতা-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শের বিরুদ্ধে এবং বৃহৎ শক্তিসুলভ জাতিদম্ভ ও জাতিবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জয়লাভ। ৮ মে ১৯৪৫ ছিল সাম্রাজ্যবাদের ওপর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার সর্বাত্মক উৎকর্ষের প্রকাশ।

মহান দেশপ্রেমাত্মক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হিটলার-বিরোধী মিত্রশক্তির প্রধান শক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল তা থেকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্রিয় সহায়তা থেকে জোর পেয়েছিল ফ্যাসিস্টদের অধীনে বা অধিকারে আসা সকল দেশের প্রতিরোধ আন্দোলন এবং পার্টিজান ও মুক্তিবাহিনীর ক্রিয়াকাণ্ড।

উদ্ভূত হয়েছিল একটি ব্যাপক ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট যার লক্ষ্য ছিল আবার বর্বরতার মধ্যে গিয়ে পড়া থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করা। হিটলার-বিরোধী জোটের জনগণ ও রাষ্ট্রগুলি স্বাধীনতা ও মানবতার নামে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিল। ফ্যাসিস্ট দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে, বিশ শতকের দাস প্রভুদের বিরুদ্ধে, আউশভিৎস 'মাইডানেক'

বুখেনভালট ও রাভেন্সব্রুয়েক-এর রক্তমাখা গণ-হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়েছিল শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, কমিউনিস্ট, সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও ক্রিশ্চিয়ানরা।

জার্মান জনগণের সেরা প্রতিনিধিরাও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হিটলার-বিরোধী জোটের পক্ষে থেকে নাৎসী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কাজ করেছিল জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি এবং জার্মান ফ্যাসিস্ট-বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রাণ দিয়েছিল এ পার্টির সদস্যরাই। ফ্যাসিবাদ ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং সকল অবিচলিত ফ্যাসিস্টবিরোধীকে পথ দেখিয়েছিল। জার্মান জনগণের সম্মান বাঁচিয়েছিলেন সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা দুরূহতম গোপন অবস্থায় থেকে এবং ফ্যাসিস্টদের কারাগারে ও বন্দিশিবিরে অপ্রতিহত লড়াই চালিয়েছিলেন, সেই সমস্ত মানুষ যাঁরা নির্বাসনে থেকে, সোভিয়েত বাহিনীতে থেকে ও বহু দেশের পার্টিজান আন্দোলনে থেকে দেশ-প্রেমিক ও আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছিলেন। জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর অবিস্মরণীয় নেতা আর্নেস্ট থেলমান হয়ে উঠেছিলেন কমিউনিস্টদের ও সকল প্রতিরোধ যোদ্ধার অদম্য সাহসের প্রতীক। ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বকে উৎখাত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্ত জার্মানি জাতীয় কমিটিতে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও অফিসারদের বাহিনীর নাৎসী-বিরোধীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন কমিউনিস্টরা ও সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা। তাঁদের যৌথ উদ্যোগের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জার্মান গণফ্রন্টের বীজ, আমাদের বর্তমান জাতীয় ফ্রন্টের মূল—যা থেকে জি ডি আরের সর্বাঙ্গীণ গণ-আন্দোলনের বিকাশ। তৎকালে জার্মান জনগণ তাদের নিজেদের চেষ্টায় ফ্যাসিস্ট জোয়াল থেকে মুক্ত হতে পারে নি। কিন্তু জার্মান জনগণের সেরা সন্তানরা যে আত্মোৎসর্গপূর্ণ লড়াই চালিয়েছিলেন তারই ফলে সৃষ্ট হয়েছিল সেই অবস্থা যাতে মুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট ঐতিহাসিক সুযোগ গ্রহণ করা গিয়েছিল এবং তার ফলে ইতিহাসের এক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। কোন আত্মোৎসর্গই বৃথা হয় নি। জার্মান জনগণের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রতিরোধ লড়াইয়ের বীররা শুধু যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভে সহায়তা করেছিলেন তাই নয়, তাঁরা ছিলেন নতুন যুগের পথিকৃৎ।

মহান দেশপ্রেমাত্মক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের ফলে বিশ্ব

বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার নতুন একটি পর্ব উন্মোচিত হল। সর্বত্রই ফ্যাসিস্ট দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের সামাজিক মূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম বিস্তারলাভ করেছিল জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে। এভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রূপলাভ করতে শুরু করে। লাল অক্টোবরের পরে এইটিই ছিল মানব ইতিহাসের বৃহত্তম ঘটনা।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ নতুন প্রেরণা আনল শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে, বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিপুল বেগে অগ্রসর হল এবং তার ফলে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ল।

আজকের দিনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী। জনগণের স্বার্থে আমাদের কালের সমস্যাগুলি কেমনভাবে সমাধান করতে হয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে এই গোষ্ঠী। জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের শ্রমজীবী জনগণ বিশ্ব পরিবর্তনকারী প্রকৃত গণতন্ত্রের এই মহান শক্তির অংশ, এজন্য আমরা আস্থায় ও গর্বে পরিপূর্ণ।

২

হিটলারী ফ্যাসিবাদ থেকে সোভিয়েত বাহিনীর দ্বারা মুক্তিলাভের পরে জার্মান জনগণের সামনে উপস্থিত হল নতুনভাবে শুরু করার শুধু সুযোগ-ই নয়, দায়ও। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল—বিশেষ করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও সমরবাদের শুরু করা দুই বিশ্বযুদ্ধ থেকে। ১৯৪৫ সালের ১১ জুন তারিখে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে ইস্তাহার প্রচার করে তাতেই সর্বপ্রথম ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গণতান্ত্রিক ধারণা খাড়া করা হয় এবং তারই ভিত্তিতে একত্রিত হয় কমিউনিস্ট, প্রগতিশীল সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও অন্যান্য অবিচলিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী। এই কর্মসূচী ছিল পটসডাম চুক্তির নীতি ও জাতিসঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী। তারা এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষা এই: ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল উচ্ছেদ করা এবং এমন একটি ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্র সৃষ্টি করা যে আর কখনো তার প্রতিবেশীদের বিপন্ন করবে না।

শিক্ষা এই : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে শোষণহীন নির্যাতনহীন, দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট-হীন নতুন এক সমাজব্যবস্থার পথ রচনা করা—যে পথ সমাজতন্ত্রের পথ।

প্রয়োজন ছিল শুধু বস্তুগত আবর্জনা পরিষ্কার করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদের ফেলে-যাওয়া নীতিগত আবর্জনাও। প্রয়োজন ছিল আমাদের জনগণের সচেতনতা ও সংস্কৃতির মূলগত রূপান্তরণের।

শিক্ষা এই : আমাদের জনগণের ইতিহাসকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও মৈত্রীতে রূপায়িত করা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্ব সমাজবাদের দ্বারা মূর্ত ঐতিহাসিক অগ্রগতিতে যোগদান করা এবং কমিউনিজম-বিরোধিতা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শত্রুতা আর কখনো হতে না দেওয়া।

শিক্ষা এই : ইউরোপীয় শান্তি-ব্যবস্থার সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করা, যার ফলে আমাদের মহাদেশে বহু পুরুষ ধরে শান্তি বজায় থাকবে এবং পারস্পরিক কল্যাণে সুপ্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতা গড়ে উঠবে।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শক্তিগুলি তাদের যৌথ ক্রিয়াকাণ্ড দাঁড় করিয়েছিল এই সমস্ত ঐতিহাসিক শিক্ষার ভিত্তিতে, যা ছিল ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বব্যাপী উত্তরণের যুগকে নিয়ন্ত্রণ করে যে-সমস্ত সূত্র তার অনুসারী, যা সার্থক করে তোলা হয়েছে জি ডি আরে—জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী, সমবায়ী কৃষকশ্রেণী, সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী ও অন্য সকল মেহনতী জনগণের কৃতিত্বে। জি ডি আরের জনগণ বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিত। এই সমস্ত কিছুই সংঘটিত হয়েছে ইতিহাসের সূত্র অনুযায়ী, নিজের থেকে নয়। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সকল সূত্রের মতো এটিকেও জনসাধারণ কঠোর শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কার্যকর করেছে।

মুক্তি থেকে উদ্ভূত সুযোগ ও দায়িত্ব গ্রহণ করে জার্মানির সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টির (এস ই ডি) নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে একজোট হয়ে আমাদের দেশে অভিশপ্ত প্রাচীন ব্যবস্থা নতুন ও শ্রেয়তর ব্যবস্থার দিকে উত্তরণের প্রস্তুতি করেছিল। এই পথে—যে পথ গোড়ার দিকে বিশেষ রকমের দুরূহ ছিল—আমরা কখনো একা ছিলাম না, সোভিয়েত কমরেডরা ছিল আমাদের প্রকৃত বন্ধু, সহায়ক ও অভিভাবক। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গণতান্ত্রিক রূপান্তরণকে আমরা কার্যকর

করেছিলাম একটি সুসংহত বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায়, সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম এবং অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে শুরু করেছিলাম।

তারই মধ্যে দিয়ে, অর্থাৎ জার্মান ইতিহাসের বৃহত্তম বৈপ্লবিক রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে, জি ডি আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চিরকালের জন্য ও অপরিবর্তনীয় রূপে নিজেকে যুক্ত করেছে সমাজতন্ত্রের প্রধান শক্তি মহান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীকে উন্নত ও শক্তিশালী করার দিকে, এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে নতুন ঐতিহাসিক গুণসম্পন্ন সম্পর্ক সৃষ্টি করার দিকে, আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার দিকে প্রতিটি পদক্ষেপ হচ্ছে একটি বৈপ্লবিক ক্রিয়া ও বিশ্বশান্তির পক্ষে ক্রিয়া। অতএব, সি এম ই এর (পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদ) কাঠামোর মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক সমাজতান্ত্রিক সমন্বয়ের জন্য এবং ওয়ারশ চুক্তির রাষ্ট্রগুলির সংগঠনের মধ্যে থেকে সমাজতন্ত্র ও শান্তির পারস্পরিক সামরিক রক্ষাকার্যের জন্য আমাদের রিপাবলিক অবদান রেখেছে ও রেখে চলেছে।

এই সবকিছু দেখাচ্ছে—ফ্যাসিবাদ থেকে জার্মান জনগণের মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদের সুযোগ ও দায় এবং নতুন প্রারম্ভ, জি ডি আরের প্রতিষ্ঠা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণকার্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব—সবই ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত। আমরা কখনো এ কথা ভুলব না যে আমাদের এই রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্ভব হয়েছিল হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের জয়লাভের ফলে এবং তা হচ্ছে বিশ্বের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অংশ।

জার্মান শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ঐতিহ্যকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে গত তিন দশক ধরে যে পথে আমরা চলেছি তা সঠিক সাফল্যমণ্ডিত। এই পথ চালিত করেছে প্রকৃত সমাজতন্ত্রের দিকে এবং ধনতন্ত্রের চেয়ে তার উৎকর্ষের সুনিশ্চিত প্রমাণ উপস্থিত করছে।

—সমাজতন্ত্র মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসান ঘটিয়েছে এবং মানবিক সম্পর্কে এক মূলগত পরিবর্তন প্রবর্তিত করেছে। শ্রেণী-বিরোধিতার স্থান নিয়েছে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়তা।

—সমাজতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং উৎপাদনের উপায়গুলির সমাজতান্ত্রিক মালিকানা আর তাই সমাজতন্ত্রে সকল

জনগণের মঙ্গলের জন্য উৎপাদিকা শক্তিগুলির সংকট-মুক্ত ও অবিচল উন্নতি-লাভের নিশ্চয়তা থাকে। সমাজতন্ত্রে শুধু কথায় নয়, সামাজিক বাস্তবতায় কাজের অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে এবং সমাজতন্ত্র সামাজিক নিরাপত্তা সৃষ্টি করে।

—সমাজতন্ত্রে সম্ভব হয় সকলের জন্য সর্বাত্মক শিক্ষা, সমাজের সকল সদস্যের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তরুণ সম্প্রদায়ের দক্ষতা ও প্রতিভার উন্মোচন, নারীর সমানাধিকার কার্যকরণ, আরো বহু জিনিসের রূপায়ণ—যে জন্য বিপ্লবী শ্রমিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী শক্তি জার্মান জনগণের ইতিহাসে লড়াই করেছে।

—সমাজতন্ত্র হচ্ছে স্বাধীনতা, ন্যায়, মানবতা ও মানবিক মর্যাদার জগৎ। আজকের দিনে যে প্রকৃত সমাজতন্ত্র আবির্ভূত হচ্ছে ধারাবাহিক প্রজন্মের শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের কর্মের ফলে তার নির্ধারক পূর্বশর্ত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা মুক্তিসাধনের ক্রিয়াটি।

সমাজতন্ত্র ও শান্তি একীভূত হয়ে আছে। সমাজতন্ত্রের চাই শান্তি, সমাজতন্ত্র আনে শান্তি। সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির কল্যাণে ইউরোপের শান্তি আরো নিরাপদ হয়ে উঠেছে এবং আমাদের মহাদেশ লাভ করেছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে দীর্ঘতম কালের শান্তি। তিন দশক ধরে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী চক্রগুলো চেষ্টা করে এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলকে উলটিয়ে দিতে। কিন্তু এই তিন দশকে শান্তিকামী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী সম্ভব করে তুলেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে সরে আসা এবং উত্তেজনা-প্রশমন ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থাবিশিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দিকে যাওয়া। এটা সর্বোপরি প্রকাশ পেয়েছে মস্কো ওয়ারশ বার্লিন ও প্রাগের চুক্তিগুলিতে, পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কিত চতুঃপাক্ষিক চুক্তিতে এবং ইউরোপের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা বিষয়ক সম্মেলনের আহ্বানে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত গভর্নমেন্ট ও কমরেড লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ যে লেনিনবাদী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছেন তার প্রতি জি ডি আরের জনগণ উচ্চ প্রশংসা ও পূর্ণ সমর্থন জানায়। সকল জনগণের সাথে তাঁরা ধাপে ধাপে রূপায়িত করছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসের মহান শান্তি কর্মসূচী।

গৌরবমণ্ডিত সোভিয়েত-বাহিনী কর্তৃক হিটলারী ফ্যাসিবাদ থেকে ইউরোপের মুক্তিসাধন এবং শান্তির সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনন্যসাধারণ ভূমিকা—তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এই অনুকূল পরিবর্তনের জন্য, শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যসাধনে এই বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির জন্য নির্ধারক পূর্বাবস্থা। ত্রিশ বছর আগে যে ব্যাপক হিটলার-বিরোধী জোটের অস্তিত্ব ছিল তার জায়গায় আজ এসেছে শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতাকামী সকলের বিশ্বব্যাপী জোট। এতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে শান্তির ধারণার পক্ষে ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ, যার সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে সকল জনগণের অপরিহার্য স্বার্থের এবং সমাজস্য রয়েছে বিশ্বের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তবতার।

সাম্রাজ্যবাদ বাধ্য হচ্ছে শক্তির নতুন সম্পর্কের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে। তাই বলে আমরা এ ঘটনা থেকেও চোখ ফিরিয়ে থাকি না যে উত্তেজনা-প্রশমনের চওাল শত্রুরা তাদের কার্যকলাপ বাড়িয়ে তুলছে। 'ন্যাটো' গঠিত হবার পর থেকে অস্ত্রের জন্য ব্যয় উচ্চতম মাত্রা প্রাপ্ত। এবং কোনো কোনো পশ্চিমী মহলের বিবিধ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি, উত্তেজনা-প্রশমনের মাধ্যমে লব্ধ ফল জোরদার করার জন্য ও শান্তি-সংরক্ষণের জন্য ও শান্তিকে অপরিবর্তনীয় করে তোলার জন্য অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া কত জরুরী।

জরুরী কর্তব্য হচ্ছে উচ্চতর স্তরে ইওরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের যতটা সম্ভব দ্রুত পরি-সমাপ্তি ঘটানো এবং সামরিক উত্তেজনা-প্রশমনকে রাজনৈতিক উত্তেজন-প্রশমনের সম্পূরক করে তোলা। ইউরোপের শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতাকে অগ্রসর ও জোরদার করার জন্য জি ডি আর তার গঠনমূলক অবদান বজায় রাখবে। এই কথাটি সমাজতান্ত্রিক জি ডি আর ও পুঁজিবাদী এফ আর জি (ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মান)-র সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমাদের পররাষ্ট্র নীতির সর্বোচ্চ নীতি হচ্ছে এবং হয়ে থাকছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে, দুই সমাজতান্ত্রিক প্রতিবেশী পোলাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম মৈত্রীর সংহতি-সাধন। জি ডি আর দৃঢ়ভাবে ও অবিচলভাবে দাঁড়িয়েছে সারা বিশ্বের শান্তিকামী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির পাশে। আমরা তাদের কাছ থেকে

সংহতি পেয়েছি, আমরা তাদের দিয়েছি সংহতি ও সহায়তা। ভবিষ্যতেও শান্তি গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে শক্তি-সম্পর্কের আরও পরিবর্তন-সাধনের জন্য জি ডি আর সচেষ্ট থাকবে। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় তাদের কর্তব্য সু-সম্পাদনের জন্য আমাদের রিপাবলিকের জনগণ মনে করে, এই হচ্ছে তাদের মুক্তিলাভের দিন ৮ মে ১৯৪৫-এর উত্তরাধিকার।

ভারত সরকারের অর্থনীতি ঃ প্রতিবিপ্লবের ভরসাস্থল

চারুব্রত রায়

ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যখন প্রতিবিপ্লবী-অক্ষ সমূহ বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে, তখন সেই চক্রান্তকে প্রতিরুদ্ধ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত সরকারের আর্থনীতি, যার মূল উদ্দেশ্য পুঁজিতান্ত্রিক পথকে সুরক্ষিত করার সর্ববিধ প্রয়াস। বলা বাহুল্য, মৌলিক দিক থেকে এই জায়গায় ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া ও প্রতিবিপ্লবী অক্ষের মতৈক্য বিদ্যমান—যদিও পুঁজিতান্ত্রিক পথ সুরক্ষিত করার কৌশলগত প্রশ্নে এদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে, ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি প্রতিবিপ্লবের বিষয়গত বনিয়াদকে শক্তিশালী করছে।

ভারতের মতো মধ্যমানের পুঁজিবাদী দেশেও পুঁজিতন্ত্র যে স্বয়ম্ভর হতে পারে না, একথা আজ প্রমাণিত। পুঁজিতান্ত্রিক পথের বিকাশ একচেটিয়া পুঁজিবাদকে বিকশিত করে। পুঁজিতান্ত্রিক পথ পরিত্যাগ না করে যথার্থভাবে একচেটিয়া পুঁজিকে প্রতিহত করা বাতুলতা, কারণ ভারতের মতো দেশে (যার মতো অর্থনৈতিক বিকাশ তৃতীয় দুনিয়ার মাত্র দু'চারটি দেশ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে) একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রকে আঘাত করতে গেলে পুঁজিতান্ত্রিক পথকে অক্ষত রাখা যায় না।

- ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া দল কংগ্রেস-বিভক্তিকরণ ও মধ্যবর্তী নির্বাচনের অন্তর্বর্তী সময়ের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে। ১৯৭১ সালে টাটা বিড়লার সম্পত্তি ছিল ১,৩৯৮ কোটি টাকা। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা ঐ পরিমাণ এখন ১,৭০০ কোটি টাকা ছাপিয়ে গেছে। কংগ্রেসী শাসন একচেটিয়াদের নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট, এ কথা বলা অসমীচীন। ১৯৭১, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে টাটার নির্বাচিত ২০টি সংস্থার সম্পত্তি ছিল যথাক্রমে ৫৩৫·৮৬ কোটি টাকা, ৫৭১·৮৭ কোটি টাকা ও ৬০৮·৬৬ কোটি টাকা। বিড়লার ৪৮টি নির্বাচিত সংস্থার সম্পত্তি

ঐ বছরগুলিতে ছিল ৪৮৭·১১ কোটি টাকা, ৫৪৮·৯৬ কোটি টাকা ও ৬০১·৭৬ কোটি টাকা। মফতলালের ১৪টি নির্বাচিত সংস্থার সম্পত্তি ঐ বছরগুলিতে ছিল ১৬৬·৮৭ কোটি টাকা, ১৮৫·৪১ কোটি টাকা ও ২২৪·৩৯ কোটি টাকা (ইকনমিক টাইমস ২০।৪।৭৫)। একচেটিয়া পুঁজিকে প্রসারের সুযোগ না দিলে এটা ঘটতে পারত না। বিদেশী সংস্থাগুলির (যেগুলি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির শাখা) পক্ষে এ সময় আরো বেশী অনুকূল। ইণ্ডিয়ান অ্যালুমিনিয়ামের সম্পত্তি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩ সালে ৬৪·০৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮৩·৩৪ কোটি টাকায় বেড়েছে। লারসেন এণ্ড টুবরোর ৭টি সংস্থার সম্পত্তি ৫৭·০৮ কোটি টাকা থেকে ৭১·৫৪ কোটি টাকায় বর্ধিত হয়েছে। হিন্দুস্থান লিভারের সম্পত্তি ৪৫·৫৫ কোটি টাকা থেকে ৬৪·১০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে (ঐ)।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি যে একচেটিয়া পুঁজির স্বপক্ষে, এটা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত। প্রত্যক্ষভাবেও যে একচেটিয়াপতিদের মদত দেওয়া হচ্ছে, তার নজিরও রয়েছে। এটাও মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। মধ্যবর্তী নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্যের অব্যবহিত পরেই টাটা বিড়লা মফতলাল প্রভৃতিদের বেশ কয়েকটি সংস্থাকে উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের অনুমতি প্রদান তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (দ্রষ্টব্য : নিউ এজ ২০।৬।৭১)।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজেই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে আঘাত করতে উদ্যোগী হয়েছেন, এমন নজিরও আছে। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বণিক সংঘ ফিককাই (FICCI)-এর অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনিই প্রথম যৌথ সংস্থার (জয়েন্ট সেকটর) ধারণা উপস্থিত করেন—যে ধারণা টাটা স্মারকলিপির (মে ১৯৭২-এ প্রদত্ত) সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ঐ ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে বেসরকারী ক্ষেত্রের সাহায্যে ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে এবং 'কর্পোরেট' কাঠামো ব্যতিরেকে আর্থব্যবস্থা অকল্পনীয় (দ্রষ্টব্য : ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাইমস, ২৫।৪।৭৪)। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, সরকার-নিযুক্ত শিল্প লাইসেন্স অনুসন্ধান কমিটি (দত্ত কমিটি বলে প্রচলিত) প্রস্তাবিত যৌথ সংস্থার মূল কথা ছিল বৃহৎ শিল্পভবনগুলিতে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় ঋণকে ইকুয়িটি পুঁজিতে রূপান্তরিত করে ঐ সংস্থাগুলিতে রাষ্ট্রীয় প্রভাব বৃদ্ধি এবং টাটা স্মারকলিপি প্রস্তাবিত স্মারকলিপির উদ্দেশ্য লাভজনক রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে বেসরকারী (অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজি) নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। সুতরাং টাটা-প্রস্তাবিত যৌথ সংস্থার উদ্দেশ্য শুধু দত্ত কমিটি অভিভাবিত

যৌথ সংস্থার ধারণাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকেও আঘাত করা। কারো কারো কাছে শ্রুতিকটু হলেও এ কথা সত্য যে, টাটার এই প্রয়াসের প্রেরণা মিলেছিল প্রধানমন্ত্রীর ফিকক্কাই বক্তৃতায়।

গত তিন-চার বছর ধরে গৃহীত সরকারী নীতি এ পথ ধরেই চলেছে। "গরীবী হঠাও" জনগণের জীবনে এক নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো নেমে এসেছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে কংগ্রেস সরকার ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করেছে—তারই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে জনবিরোধী অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলি। এই নীতিগুলিই অবর্ণনীয় দারিদ্র্য, ভয়াবহ বেকার সমস্যা ও অভাবনীয় দুর্নীতির জন্য দায়ী। বলা বাহুল্য, এগুলির উপরেই স্ফীত হয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতি তথা একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী। মনোপলি এণ্ড রেসট্রিকটিভ ট্রেড প্র্যাকটিসেস কমিশন (এমারটিপিসি) গঠিত করা হল একচেটিয়া পুঁজির প্রসার অবরুদ্ধ করা ও বৃহৎ একচেটিয়া ভবনগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দেবার উদ্দেশ্যে। কার্যকালে দেখা যাচ্ছে যে, এমারটিপিসি এক বায়বীয় ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। এমারটিপিসির চেয়ারম্যান ও একাধিক সদস্যের বহু বক্তৃতায় বা বক্তব্যে এ কথা স্বীকৃত।

জনগণের দুর্দশা এক অসহনীয় স্তরে উপস্থিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি জনগণের অসন্তোষ ক্রমবর্ধমান—জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রতিবৈপ্লবিক অক্ষের বিপদ এই অসন্তোষকে লগ্নী করেই প্রসারলাভ করেছে। ভারত সরকারের অচলায়তনবাদী (statusquoist) নীতি এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। একদিকে যেমন প্রতিবিপ্লবী অক্ষ সরকারের দক্ষিণপন্থী আর্থনীতির দৌলতে পুষ্টিলাভ করছে, অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী অর্থনৈতিক পদক্ষেপের দরুণ জনজীবনের সংকট হতে সৃষ্ট তীব্র অসন্তোষের সুযোগ নিচ্ছে এই প্রতিবৈপ্লবিক শক্তিসমূহ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের ৫০তম বর্ষপূর্তির সময়ে যখন ভারতে ফ্যাসিবাদের কয়েকটি লক্ষণ নতুনভাবে দেখা দিচ্ছে, এই দক্ষিণপন্থা ঘেঁষা আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গী কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি সুব্রহ্মণিয়ম ও টি এ পাই-এর নানা তৎপরতা ও বক্তব্যে এই লক্ষণগুলি সুপরিস্ফুট। গত বছরের শেষ দিকে টি এ পাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কথা আবার উত্থাপন করেছেন। মোরারজী দেশাই সিণ্ডিকেটের দাপট থাকার সময় অর্থমন্ত্রী হিসেবে জাতীয়করণের বিকল্প হিসেবে এর প্রবর্তন করেছিলেন পশ্চিম জর্মনী ও কিছু কিছু উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের

সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর অনুসরণে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেকে নি। কিন্তু শ্রীপাই একচেটিয়া পুঁজির তোষণব্রতে মোরারজীকে টেক্কা মেরেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব কিসিঙ্গারের ভারত সফরের অব্যবহিত পরেই তিনি মন্ত্রিসভায় আলোচনার্থে একটি নোট পাঠিয়েছেন, যার মর্মকথা : বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির পথ হল উৎপাদন বৃদ্ধি ও তার জন্য প্রয়োজন শিল্পক্ষেত্রে সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, বেসরকারী ক্ষেত্রকে যথেচ্ছ প্রসারের সুযোগদান, এমারটিপিসি তুলে দেওয়া প্রভৃতি (দ্রষ্টব্য : নিউ এজ, ৮. ১২. ৭৪)। তিনি আবার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মালিকানার ৪৯ শতাংশ বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রদানের প্রস্তাব করেছেন। বলা বাহুল্য, পরোক্ষভাবে এই প্রস্তাব একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্যই। ২০ জন কংগ্রেসী এম. পি. এর প্রতিবাদ করে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছিলেন (পি টি আই, ১০.১২.৭৪)। অনুরূপভাবে শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম শিল্প লাইসেন্সে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সংজ্ঞা প্রসারিত করার কথা বলার ছলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে (core sector) বেসরকারী শিল্পের অনুপ্রবেশের উমেদারি করছেন। উল্লেখবাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও একচেটিয়া পুঁজির কথা মনে রেখেই তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আর্থ সম্পদের বিপুলবৃদ্ধি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বর্তমান কর্মসূচী রূপায়ণ অসম্ভব বলেই বেসরকারী ক্ষেত্রের সাহায্য প্রয়োজন (ইকনমিক টাইমস, ৩.১২.৭৪)।

সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যখন কংগ্রেস দল জয়প্রকাশী প্রতি-বিপ্লবকে সর্বতোভাবে মোকাবিলার আহ্বান করেছে, তখনই দেখা যাচ্ছে যে একচেটিয়া পুঁজির প্রতি সরকারী আনুকূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল আমদানীর বিধিনিষেধ শিথিলকরণ (অমৃত বাজার পত্রিকা, ৭.৫.৭৫) তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেউ কেউ মনে করবেন রপ্তানী বৃদ্ধি যখন রাষ্ট্রীয় আর্থকাঠামোর সহায়ক, তখন এই নীতি সমর্থন-যোগ্য। তাদের হয়ত খেয়াল নেই যে, রপ্তানী পণ্যের ৮৫ শতাংশ বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয় এবং এদের একটা বড় অংশ বহুজাতিক সংস্থাগুলির ভারতীয় শাখায় প্রস্তুত হয়। কাজেই এই ভরতুকি যৌথভাবে ভোগ করছে দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি ও তৎসহ বহুজাতিক পুঁজি, যার মেলবন্ধন সাম্রাজ্যবাদ তথা নয়া উপনিবেশবাদের শোষণ অবাধ করে তোলে। উপরন্তু এই সংস্থাগুলি ওভার-ইনভয়েসিং ও আণ্ডার-ইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে এর দ্বারা মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ

নিয়ে থাকে। রপ্তানীপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা-সীমাও প্রত্যাহৃত হয়েছে। প্রসঙ্গত, পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, এই নীতি হঠাৎ প্রণয়ন হয় নি। বেশ কয়েক মাস ধরেই এই প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ডিসেম্বর '৭৪ এর শেষে বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পমন্ত্রী পাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন শিল্পপতিদের কাছে (দ্রষ্টব্য : ইকনমিক টাইমস ২৭.১২.৭৪)। শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম সম্প্রতি বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলিকে (যার প্রধান অংশ হল বিদেশী ব্যাঙ্ক) আশ্বাস দিয়েছেন যে নতুন কোনো ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে না (ইকনমিক টাইমস ১১.৫.৭৫)।

কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী যে ক্রমাগত একচেটিয়া পুঁজিবাদের স্বপক্ষে যাচ্ছে, তার আর এক নিদর্শন হল ১৯৭৪ সালে ফিককাই-এর তরফ থেকে কে কে বিড়লার স্মারকলিপি। টাটা স্মারকলিপির দুবছর বাদেই। "এক জঙ্গম আর্থ-ব্যবস্থার দিকে" শিরোনামে ঐ স্মারকলিপিতে 'জাতীয় প্রয়োজন ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য বেসরকারী সংস্থাগুলির গুরুদায়িত্বের' কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অসেলে যা দাবী করা হয়েছে তা হল : ঋণ-সংকোচন—মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, বাণিজ্য প্রসারে যথেচ্ছ স্বাধীনতাপ্রদান, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের আহ্বান, প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ভোগ্যপণ্য আমদানী, কঠোর শ্রমনীতি, পি এল ৪৮০ পুনঃপ্রবর্তন প্রভৃতি (দ্রষ্টব্য : নিউ এজ ২৯.১২.৭৪)। বিড়লা স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র প্রভৃতির কার্পণ্যই বেসরকারী ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ বিনিয়োগ কমিয়েছে। এটা যে কত বড় ধাপ্পা ফিককাই-প্রকাশিত ইকনমিক ট্রেণ্ডস পত্রিকার ১.২.৭৫ সংখ্যায় তার প্রমাণ মেলে। তাতে দেখা যায় যে, ২৭.১২.৭৪ পর্যন্ত প্রদত্ত নীট ব্যাঙ্ক ঋণের ১০,০৭৬ কোটি টাকা পেয়েছে বেসরকারী ক্ষেত্র, আর সরকারী ক্ষেত্র পেয়েছে ৯৩৬৫ কোটি টাকা ; ১৯৭২-৭৩ সালে এই দুটি অঙ্ক ছিল যথাক্রমে ৭,৭৯১ কোটি টাকা ও ৭,৬৪০ কোটি টাকা।

বিড়লা স্মারকলিপিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ভ্রমাত্মক। দক্ষিণপন্থী অর্থ-নৈতিক প্রবণতা, প্রতিবৈপ্লবিক সমাবেশ এবং তার পটভূমিতে একচেটিয়া প্রভাব বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এর আত্মপ্রকাশ। তাতে বলা হয়েছে যে, ভয়াবহ আর্থনীতিক মন্দাই এই স্মারকলিপি প্রস্তুতির কারণ। কিন্তু মন্দা (recession) কি তৃতীয় দুনিয়ায় প্রযোজ্য? মজুরী পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা কি ভারতে পরিদৃষ্ট? মন্দার কথা বলা যায় না এ দুটি প্রশ্ন তুললেই। তবু

যেটুকু মন্দা তা সত্ত্বেও আছে, তা হল বিশ্ব পুঁজিবাদের অধীনতার জন্য—তাকে residual recession বা মন্দার উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তাছাড়া ভারতে শিল্পোৎপাদন সূচক সংখ্যা বেড়েছে এই সময়ে। কাজেই মন্দার কথা বলে বিড়লা এক অহেতুক ভীতিসঞ্চার করতে চেয়েছেন। আই এন টি ইউ সির সভাপতি বি সি ভগবতী এ নিয়ে শ্লেষাত্মক বক্তব্য রেখেছেন তাদের ২০তম সম্মেলনে (দ্রষ্টব্য : সোশ্যালিস্ট ইণ্ডিয়া ৪. ১. ৭৫)। আসলে ধনকুবের সম্প্রদায় চাইছে বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে সঞ্জীবতর করতে। মন্দার কারণ মুনাফা-গৃধ্নুতা। মুনাফা বৃদ্ধি হারে ভাঁটা পড়লেই এরা 'মন্দা' 'মন্দা' বলে চীৎকার করেন। মন্দাকে যদি প্রতিহত করতেই হয়, তাহলে অতি মুনাফা লুণ্ঠনের উপর হাত দিতে হয়। টাটা-বিড়লারা জানে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অত সাহস নেই। দক্ষিণপন্থী আর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সে জন্যে বিনিয়োগ ক্ষেত্র প্রসারিত করা মানে রাঘববোয়ালদের আনুকূল্য প্রদর্শন। বিড়লা স্মারক-লিপিতে তাই অনেক আব্দার করা হয়েছে—যেমন নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আয়কর ছাড়, অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য কর ছাড় কৃতিত্বপত্র প্রদান, উন্নয়ন রিবেটের মেয়াদ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আর্থসংস্থাগুলি কর্তৃক বেসরকারী ক্ষেত্রে ঋণপ্রদানের বেলায় মালিকানা পুঁজি অপরিবর্তনীয় করা (অর্থাৎ সরকারী ঋণকে ইকুয়িটি পুঁজিতে রূপান্তর বন্ধ করা), এমারটিপিসি প্রত্যাহার (যা পাই-সুব্রহ্মনিয়ম চক্রেরও ইচ্ছা—লেখক) প্রভৃতি।

যে কোনো দিকেই দৃষ্টিপাত করলে সাধারণভাবে একথা পরিষ্কার হবে যে, ১৯৭১ সালে লোকসভা (মধ্যবর্তী) নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার পরে ক্ষমতাসীন সরকার যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলেছে, ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে কথিত প্রতিশ্রুতির (যার মর্ম হল গরীবী হঠাও) সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, বরং পদে পদে সেই প্রতিশ্রুতি পালন না করার দিকেই তার গতিমুখ। এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি।

বৈদেশিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নয়া উপনিবেশবাদের বিপদ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৭৪ সালে ২৮৬টি বৈদেশিক সহযোগিতা অনুমোদিত হয়েছে। তার মধ্যে সব চেয়ে বেশী হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে (৬৮), তারপরে পশ্চিম জর্মনী (৫১) ও ব্রিটেন (৪৭)। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে

হয়েছে মাত্র ৫টি। (দ্রষ্টব্য: ইকনমিক টাইমস ১. ৭. ৭৪, ৮. ১০. ৭৪ ও ১৬. ১২. ৭৪)। ১৯৬৪ সালের পর এত বেশী বৈদেশিক সহযোগিতা অনুমোদিত হয় নি। বলাবাহুল্য, ২৮১টির (৫টি বাদে) ৯০ শতাংশই হল বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে। বহুজাতিক সংস্থাগুলিই আজ সাম্রাজ্যবাদ তথা নয়া উপনিবেশবাদের প্রাণকেন্দ্র। তৃতীয় দুনিয়া তাদের মৃগয়াভূমি। ভারতে আবার এই সহযোগিতা প্রধানত হচ্ছে একচেটিয়া ভবনের সংস্থাগুলির সঙ্গে। এই গতিমুখ ভারতকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে তা কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?

একদিকে যেমন কয়েকটি শিল্পে বহুজাতিক পুঁজি ভারতের আর্থক্ষেত্রে গভীরভাবে অনুপ্রাবিষ্ট (যেমন ধাতব শিল্প ও ভেষজ শিল্প), অন্যদিকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ইত্যাদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত সংস্থা বেছে নিচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র-বহির্ভূত অথবা রাষ্ট্রীয় আর্থকাঠামোর পক্ষে অলাভদায়ক ক্ষেত্রগুলি (যেমন শহর উন্নয়ন, বস্তিপ্রকল্প, ক্ষুদ্র সেচ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি)। বিশ্ব ব্যাঙ্কের স্বরূপ কি আমাদের জানা নেই? কয়েক বছর আগে শ্রীলঙ্কাকে অর্থ সাহায্য দেবার শর্ত হিসেবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বিধিবদ্ধ সরকারী বণ্টন ব্যবস্থা প্রত্যাহারের দাবী করেছিল। ১৯৬৭ সালে আর্জেন্টিনাতে আর্থসাহায্যের শর্ত হিসেবে ৭০ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করার শর্ত আরোপ করেছিল। ১৯৭২ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্কের চাপে উরুগুয়েতে ৯ মাসে ৭ বার মুদ্রা-অবমূল্যায়ন হয়েছিল। ভারতে তারা সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে, এ কথা কি ভাবতে পারা যায়? রেল ধর্মঘটের আগে বিশ্ব ব্যাঙ্ক রেলপথ উন্নয়নে সাহায্যের শর্ত হিসেবে রেল প্রশাসনকে তাদের পরামর্শ মতো পুনর্বিন্যাস করতে বলেছিল। আজ বিশ্ব ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি সংস্থা ভারতে যে ফাঁদ পাতছে, তার পটভূমি তৈরী হয়েছে ভারতে আর্থক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থার পুনর্বার দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে, একথা খণ্ডন করা অসম্ভব।

পুঁজিতান্ত্রিক পথ তথা একচেটিয়া পুঁজিবাদ লালন করার জন্য দরিদ্র হতে দরিদ্রতর হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণ। গ্রাসাচ্ছাদনেও অসমর্থ জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কমিশন (ESCAP—এসক্যাপ) ১৯৬৯ সালের মূল্যমান ধরে এক সমীক্ষায় (১৯৬৯) দেখেছে যে, ভারতের ৬৮ শতাংশ জনগণ গ্রাসাচ্ছাদনে অসমর্থ অর্থাৎ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে (আই পি এ সংবাদ সংস্থা ১০. ২. ৭৫)।

সমীক্ষায় বলেছে যে, সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়ত পরিস্থিতি জটিলতর করেছে। তাহলে কি গ্রাসাচ্ছাদনে সমর্থ মাত্র এক-চতুর্থাংশ ভারতবাসী ? এই কি ২৮ বছরের স্বাধীনতার মূল্য ?

অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এ সমস্ত মোকাবিলা করতে চান বাকসর্বস্বতা অথবা অসত্য ভাষণের মাধ্যমে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমীক্ষা বলছে যে, মজুরী খাতে উৎপাদন ব্যয় ১৫ ৪ থেকে ১৫.৩ শতাংশে নেমেছে ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর মধ্যে (দ্রষ্টব্য : নিউ এজ ৩০.৬.৭৪), আর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলছেন যে, মজুরী বৃদ্ধি, বোনাস প্রভৃতির জন্য টাকার মূল্য কমছে এবং বলছেন আই এন টি ইউ সির মঞ্চে (সোস্যালিস্ট ইণ্ডিয়া, পূর্বোক্ত)। মূল্যবৃদ্ধি কি মজুরীবৃদ্ধি ছাড়া ঘটেনি ? তাহলে আসল মজুরী কমছে কেন ? প্রধানমন্ত্রী সহ সমগ্র বুর্জোয়ারা পুঁজিতান্ত্রিক পথের স্বপক্ষে মরিয়া হয়ে ওকালতি করছেন। তা না হলে দেশে ১৯৭৩ সালে ৩০ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি ও ৩১০ লক্ষ শ্রমদিবস নষ্ট হচ্ছে (স্টেটসম্যান ১৪.১.৭৫ ও ২৩.২.৭৫) এবং তার প্রতিবাদে যখন চতুর্দিকে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধী তখন কি করে বলেন যে, বিক্ষোভ ধর্মঘট প্রভৃতি দেশের আর্থব্যবস্থাকে পঙ্গু করে (উপরোক্ত বক্তৃতা) ?

জনসাধারণ যে ক্ষমতাসীন দলের শাসনে ক্রমে বীতশ্রদ্ধ ও নিরাশ হচ্ছে, এ কথা ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। প্রতিবিপ্লব আজ সেই সুযোগেই 'সর্বাত্মক বিপ্লব-' এর ডেক ধরে জনমানসকে বিভ্রান্ত করতে চায়। জনগণের সেই শ্রদ্ধাহীনতা ও নৈরাশ্যকে দূর করতে গেলে দক্ষিণপন্থা-ঘেঁষা নীতি পরিত্যাগ করা অবশ্য পালনীয় শর্ত, যার গতিমুখ হতে হবে পুঁজিতান্ত্রিক পথ বর্জনের দিকেই। ভারতের আর্থনীতিক বিকাশের বর্তমান স্তরে পুঁজিতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হওয়ার অর্থ অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা আরো দূরগত করে তোলা। অধিকন্তু তা প্রতি-বিপ্লবের বিষয়গত বনিয়াদ শক্ত করে তুলছে। কাজেই প্রতিবিপ্লবকে যথার্থ অবরুদ্ধ করতে গেলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুনভাবে পরিবর্তন করতে হবে। কংগ্রেস-অনুগামী সহ গণতন্ত্রকামী কংগ্রেস সেবীদের এই সত্য অনুধাবন করে তদনুযায়ী প্রতিবিপ্লবকে প্রতিরোধ করার পথে নামতে হবে। নচেৎ প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে বায়বীয় আস্ফালন ব্যতীত অন্য কিছু হবে না।

১৯.৫.৭৫

ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝায় ?

ফ্যাসিবাদের শ্রেণীচরিত্র

(ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝায় ? এই প্রশ্নটির সদুত্তর পেতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে কমিন্টার্ণ-এর (কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল) নথিপত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। ফ্যাসিবাদের যখন জন্ম হয় তখন এর চরিত্র নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন সংজ্ঞা উপস্থিত করা হতে থাকে। তখনকার দিনে অ-কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মহলে ফ্যাসিবাদকে একটি "মধ্যবিত্ত আন্দোলন", একটি "পেটি-বুর্জোয়া আন্দোলন" হিসাবে দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল। কমিউনিস্টরা আগাগোড়াই এই মতের বিরোধিতা করেন।

বস্তুত, একমাত্র কমিন্টার্ণ ফ্যাসিবাদের একটি সঠিক সংজ্ঞা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। এই কথাটি আজ স্মরণ করা আরও বিশেষ প্রয়োজন এই কারণে যে সাম্প্রতিককালে ইওরোপে কিছু সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা এবং কিছু ট্রটস্কীপন্থী নেতা এই বলে কুৎসা প্রচার করতে চাইছেন যে কমিন্টার্ণ ফ্যাসিবাদের চরিত্রটি প্রথমে ধরতে পারে নি, তারাই নাকি যথাসময়ে এই বিপদটি বুঝতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়, ইওরোপে, এমন কি আমাদের দেশেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এমন বুদ্ধিজীবী আছেন যারা বলতে চান যে কমিন্টার্ণ প্রথম দিকে ফ্যাসিবাদের স্বরূপ ধরতে পারেন নি, এবং ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে যোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন নি।

নীচে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হচ্ছে তাতে এই কুৎসা প্রচারের যথোচিত জবাব মিলবে। প্রসঙ্গত, মনে রাখা দরকার, ফ্যাসিবাদের বিপদটি সম্পর্কে প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন লেনিন। তার পরে ফ্যাসিবাদের বিপদটি যতই বড় আকারে দেখা দিতে থাকে ততই বারে বারে কমিন্টার্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং দীর্ঘ আলোচনা ও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের একটি সঠিক ও বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। নীচে কালানুক্রমিক-ভাবে কমিন্টার্ণের সেই প্রচেষ্টা তুলে ধরা হচ্ছে।)

ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে লেনিনের সতর্কবাণী

"যেমন ধরা যাক, ইতালির ফ্যাসিস্তরা ইতালির জনগণের কাছে, তারা যে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে আলোকপ্রাপ্ত হয় নি এবং ব্ল্যাক হাণ্ড্রেডস (Black Hundreds)দের হাত থেকে তাদের দেশের নিরাপত্তা যে এখনও সুনিশ্চিত হয় নি, এই কথাটি ব্যাখ্যা করে হয়ত আমাদের খুবই উপকার করবে। হয়ত এটি খুব মঙ্গলজনক হবে।"

(লেনিন, কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট, ১৩ই নভেম্বর, ১৯২২। —রজনী পাম দত্তের "দ ইণ্টারন্যাশনাল" নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

কমিণ্টার্ণের ১৯২৮ সালে গৃহীত কর্মসূচীতে ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞা

"কোন কোন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণ ফ্যাসিবাদের রূপ ধারণ করে।

"এই পরিস্থিতিগুলি হল—পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলির স্থিতিশীলতার অভাব, শ্রেণীচ্যুত সামাজিক উপাদানের যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি, শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক স্তরের চরম নিঃস্বতা : গ্রামীণ পেটিবুর্জোয়াদের মধ্যে অসন্তোষ এবং পরিশেষে প্রলেতারীয় জনগণের গণ আন্দোলন সম্পর্কে নিরন্তর ভীতি। নিজেদের শাসনকে স্থিতিশীল ও চিরস্থায়ী করার জন্য বুর্জোয়ারা ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার, যা সমস্ত আন্তঃপার্টি বোঝাপড়া ও সহযোগিতা থেকে মুক্ত, পক্ষ গ্রহণ করে এবং সংসদীয় ব্যবস্থাকে ক্রমবর্ধিতভাবে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

"ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা হল মতাদর্শগতভাবে "জাতীয় চেতনা" ও "বিভিন্ন পেশার" প্রতিনিধিত্বের মুখোশ-পরা প্রত্যক্ষ একনায়কত্বের ব্যবস্থা (বাস্তবে, শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা) এমন এক ব্যবস্থা যা পেটিবুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী ও সমাজের অন্যান্য স্তরের অসন্তোষকে কাজে লাগাবার জন্য এক বিচিত্র ধরনের বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেয় (ইহুদিদের বিরোধিতা, তেজারতি পুঁজির বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে আক্রমণ এবং সংসদীয় "বকবকানির" প্রতি অধৈর্যের ইঙ্গিতদান)। এই ব্যবস্থা সুসংহত ও ভালো বেতনপ্রাপ্ত ফ্যাসিবাদী ইউনিটগুলি গড়ে তোলে, একটি পার্টিযন্ত্র ও আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার মাধ্যমে দুর্নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ শ্রমিকদের সবচেয়ে পশ্চাদপদ স্তরকে নিজের পক্ষে সংগ্রহ করে, তাদের অসন্তোষকে কাজে

লাগিয়ে, এবং সোশ্যাল ডেমক্রেসীর অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

"ফ্যাসিবাদের প্রধান লক্ষ্য হল বিপ্লবী শ্রমিক অগ্রবাহিনীকে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট অংশগুলিকে ও প্রলেতারীয়দের নেতৃস্থানীয় ইউনিটগুলিকে ধ্বংস করা। সামাজিক বাগাড়ম্বর, দুর্নীতি ও সক্রিয় শ্বেত সন্ত্রাসের সংমিশ্রণকে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে চরম সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সংগে যুক্ত করা হল ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য। বুর্জোয়াদের তীব্র সংকটের সময়ে ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদ-বিরোধী বাক্যজালের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর এটি পুঁজিবাদ-বিরোধী সমস্ত বকবকানি ত্যাগ করে এবং নিজেকে বৃহৎ-পুঁজির সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব হিসাবে প্রকাশ করে।"

(রজনী পাম দত্ত—"ফ্যাসিজম ও সোশ্যাল রেভোলিউশন" থেকে গৃহীত)

১৯৩৩ সালের কমিণ্টার্ণ দলিলে

১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটি ফ্যাসিবাদের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিল, যা হল—"ফিনান্স পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচেয়ে জাত্যাভিমানী ও সবচেয়ে সাম্রাজ্যবাদী অংশগুলির নগ্ন সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব।"

(ঐ বই)

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে স্তালিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ কংগ্রেসে (১৯৩৪) জে. ভি. স্তালিন বলেন: "জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের জয়লাভকে কেবল শ্রমিকশ্রেণীর দুর্বলতার লক্ষণ হিসাবে এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেসী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, যা ফ্যাসিবাদের পথকেই প্রশস্ত করছে, তারই পরিণাম হিসেবে গণ্য করলেই হবে না; একে অবশ্যই বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতার লক্ষণ হিসাবে গণ্য করতে হবে, এর দ্বারা গণ্য করতে হবে এই ঘটনার লক্ষণ হিসাবে যে, বুর্জোয়াশ্রেণী ইতিমধ্যেই সনাতন সংসদীয় ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার শাসন বজায় রাখতে অক্ষম এবং তার ফলে পররাষ্ট্রনীতিতে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, একে (ফ্যাসিবাদের জয়কে) এই ঘটনার লক্ষণ হিসাবে গণ্য করতে হবে যে, বুর্জোয়াশ্রেণী আর শান্তিপূর্ণ

পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে বর্তমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে নিতে অক্ষম আর তারই পরিণামে যুদ্ধের নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।"

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে জর্জি ডিমিট্রভের বিশ্লেষণ

"সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ধরনের ফ্যাসিবাদ হল জার্মান ফ্যাসিবাদ। এর নিজেকে জাতীয় সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করার ধৃষ্টতা রয়েছে, যদিও সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এর কোনই মিল নেই। হিটলারের ফ্যাসিবাদ শুধুমাত্র বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ নয়, এ হল পাশবিক জাতিদম্ভ। এ হল রাজনৈতিক দস্যুতার এক শাসনব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষক পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচনা ও নির্যাতনের ব্যবস্থা। এ হল মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পাশবিকতা, অন্যান্য জাতিদের সম্পর্কে বল্গাহীন আক্রমণ।"

জার্মান ফ্যাসিবাদ আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের উদ্যত খড়্গ হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রধান প্ররোচক হিসাবে এবং সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের মহান পিতৃভূমি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রবর্তক হিসাবে কাজ করে চলেছে।"

(১৯৩৫ সালে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট)

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

১৯৪৫ সালে এশিয়া ও ইউরোপে ফ্যাসিবাদকে বিনষ্ট করতে ৭০টি দেশের ৫ কোটি মানুষকে তাদের জীবন হারাতে হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২ কোটি হল রুশ ও অন্যান্য সোভিয়েত জনগণ, ৬০ লক্ষ পোল্যাণ্ডবাসী, ১৭ লক্ষ যুগোস্লাভিয়ার অধিবাসী, ৬ লক্ষ ফরাসী, ৪ লক্ষ ৫ হাজার মার্কিন এবং ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ইংরেজ। তাছাড়া আরও সাড়ে তিন কোটি মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছিল। জার্মানী ও অন্যান্য যে সব দেশের সরকার সমগ্র মানবজাতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, সেইসব দেশের জনগণকেও তাদের সরকারের এই নীতির জন্য প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছিল। ১৯৩৯ থেকে '৪৫ সালের মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ কিলোমিটার বর্গক্ষেত্র জুড়ে যে সামরিক তৎপরতা চলেছিল (যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল) তার ফলে যে পরিমাণ মৃত্যু ও ধ্বংস সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল

একেবারেই অভূতপূর্ব। ফ্যাসিবাদের প্ররোচনায় সৃষ্ট এই যুদ্ধ সোভিয়েত ইউনিয়নের ১ হাজার ৭ শত শহর, আর সত্তর হাজারেরও ওপর গ্রাম এবং ফ্রান্সের প্রায় দশ লক্ষ বাড়ী বিনষ্ট করেছিল। গ্রীসে চার শত গ্রাম একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং যুগোস্লাভিয়ার পশুসম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়েছিল। ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশের ওপর নাৎসী লুফৎওয়াফের (Luftwaffe) বিমান আক্রমণের ফলে অতুলনীয় শিল্প কর্মগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল।

বলাই বাহুল্য, ফ্যাসিবাদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল সোভিয়েত রাশিয়া ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। হিটলার তাঁর "মাইন ক্যাম্প" (Mein Kampf) নামক গ্রন্থে লেখেন—আমরা যখন ইওরোপে দেশ জয়ের কথা বলি, তখন আমাদের প্রথম চোখ পড়ে রাশিয়ার ওপর এবং সেই দেশগুলি যারা রাশিয়ার প্রতিবেশী। এই অবস্থায়, স্বাভাবিক কারণেই সোভিয়েত রাশিয়াকে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হয় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে। অন্যান্য দেশের বিশেষ করে, জার্মানী ও ফ্রান্সে কমিউনিস্টদের হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আজকে ফ্যাসিবাদকে চিনতে হলে

হিটলারী ফ্যাসিবাদ আজ মৃত। কিন্তু যতদিন সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে এবং যত দিন দেশে ঐ সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারেরা থাকবে ততদিন ফ্যাসিবাদের পুনরাবির্ভাবের ভিত্তি থাকবে। আগের দিনে বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছিল এবং আজকের দিনেও ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলির মতামতের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে (যদিও প্রায়শঃই কেবলমাত্র কৌশলগত ক্ষেত্রে)। কিন্তু আসল ঘটনা হল যে ফ্যাসিবাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা এটিকে পরিষ্কার-ভাবে চেনা যায়। ফ্যাসিবাদ

- সর্বদাই স্পষ্টভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পরিচালিত
- সর্বদাই একটি দেশের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও আগ্রাসী শক্তি-সমূহের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক
- যারা বিরোধী মত পোষণ করে, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতা ও সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে একটি খুনী সন্ত্রাসের রাজত্ব

- বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা, যদিও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের তুলনায় অনেক হীন, তথাপি জনগণকে তাদের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করতে কিছুটা অধিকার দেয়, ফ্যাসিবাদ সাধারণতঃ সেটি বিনষ্ট করে
- ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য-গুলিকে যতদূর সম্ভব বিনষ্ট করে
- কিছু পরিমাণে জনসমর্থন লাভের জন্য মাঝে মাঝেই বাগাড়ম্বরের আশ্রয় নেয়, বিশেষ করে জনসংখ্যার যে অংশগুলিকে এই শাসনের স্তম্ভ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের দাক্ষিণ্য বিতরণ করে
- দেশীয় ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদের পক্ষে আরও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা করে।

The struggle against fascism and war — G. D. R.

গ্রন্থ-পরিচয়

Politics and Society During the Early Medieval Period

—Muhammad Habib

People's Publishing House, New Delhi.

মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের নানা বিষয় নিয়ে, অধ্যাপক মহম্মদ হাবিব রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন (প্রথম খণ্ডটি) প্রকাশ করেছেন পিপলস পাবলিশিং হাউস। মধ্যযুগের ইতিহাস অনুসন্ধানীদের কাছে এই বইটি বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মহম্মদ হাবিবের এই প্রবন্ধগুলি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসকে এক নতুন দৃষ্টিতে বিচার করার সুযোগ এনে দিয়েছে। মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের যে ধর্মনিরপেক্ষ নতুন ব্যাখ্যা তিনি উপস্থিত করেছেন তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর গবেষণা ও অনুশীলনের গভীরতা দিয়ে। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে আমরা লেখকের নিজের বিশ্বাস থেকে সৃষ্ট নিছক কতকগুলি মন্তব্য পাই না, সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসের নানা দিককে তন্নতন্ন করে বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আর তাই তাঁর প্রবন্ধগুলি সত্যি করেই পাঠকের মনে নতুন ভাবনার খোরাক যোগায়।

এই গ্রন্থখানির প্রবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হল প্রথম ভাগের (part one) প্রবন্ধগুলি যেখানে তিনি মূলতঃ স্যার হেনরী ইলিয়টের রচনার একটি সঠিক মূল্যায়নের প্রয়াস করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসের পাঠকদের কাছে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান—ফার্সী ভাষায় রচিত তদানীন্তন ঐতিহাসিকদের রচনাবলী-তাকে আয়ত্ত করার চাবিকাঠিটি রয়েছে স্যার হেনরী ইলিয়টের রচনার (History of India as Told by its own Historians) মধ্যে। ভারত ইতিহাসের পাঠকরা মধ্যযুগের ইতিহাসকে চিনেছেন স্যার ইলিয়টের দৃষ্টির আলোকে। মহম্মদ হাবিব তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত সঠিক ভাবে দেখিয়েছেন যে সমস্ত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ইলিয়ট সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি এবং সাম্রাজ্যবাদী-

স্বার্থের খাতিরে তিনি মধ্যযুগের ভারত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকদের এক বিকৃত চিত্র অঙ্কণ করেছেন। মহম্মদ হাবিব অত্যন্ত ক্ষোভের সংগে লক্ষ্য করেছেন যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা স্যার ইলিয়ট উপস্থিত করেছেন ভারতের ইতিহাসবিদরা অন্ধভাবে তাকেই অনুসরণ করে চলেছেন এবং শুধু তাই নয় বছরের পর বছর ধরে শিক্ষাদপ্তরের কল্যাণে এই ধারণাই লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মনে সৃষ্টি করা হচ্ছে-ভারতের সংহতির পক্ষে যার পরিণাম ভয়াবহ এবং যে ভয়ংকর পরিণাম এখনও আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি।

মহম্মদ হাবিব দেখিয়েছেন যে স্যার ইলিয়ট তাঁর সংকীর্ণ খণ্ডিত দৃষ্টি দিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসকে বিচার করেছেন। তাই তাঁর কাছে মধ্যযুগের ফার্সী ইতিহাস অত্যন্ত একপেশে, শুধুমাত্র সুলতান আর পারিষদ, তাদের অভিযান ও কীর্তিকলাপই তার বিষয়বস্তু, সাধারণ মানুষের জীবনের কোন প্রতিফলন নেই সেখানে, নেই সেখানে কোন ইতিহাসের দর্শন। মহম্মদ হাবিব ইলিয়টের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিকে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগের শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস, তাও সম্পূর্ণ নয়, শুধু তার ওপর ভিত্তি করেই ইলিয়ট নিজ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেই রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশে পাশে মালফুজৎ (Malfuzat), দিওয়ান (Diwan), মসনভিসের (Masnavis) পাতায় পাতায় সে যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের যে বিপুল সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে সে সবই ইলিয়টের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে। আর ইলিয়টের এই সিদ্ধান্তের পেছনেও যে উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে, হাবিবের সন্ধানী দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছে। তাই তিনি ব্যঙ্গের সংগে বলেছেন যে যদিও ইলিয়ট মধ্যযুগের ফার্সী ইতিহাসে সাধারণ মানুষের জীবনের কোন প্রতিফলন দেখতে পান নি কিন্তু ঐ উপাদান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় নি যে মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের জীবন ছিল খুব দুর্দশাগ্রস্ত।

আসলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মহিমাকে, ব্রিটিশ রাজত্বের গৌরবময় অবদানকে প্রতিপন্ন করার জন্যই স্যার ইলিয়ট মধ্যযুগের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করার প্রয়াস করেছেন। 'যেসব শিক্ষিত বাঙালীবাবুরা' ব্রিটিশ শাসনে তাদের দুর্দশায় পীড়িত হয়ে, ভারতের মধ্যযুগের দিনগুলিকে স্মরণ করেন, তাদের কাছে মধ্যযুগের বর্বরতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামী, ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাবের চিত্রটি স্যার ইলিয়ট বিশদভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হল

তুলনায় ব্রিটিশ শাসনের উদারনৈতিক চরিত্রটিকে ভারতবাসীর কাছে তুলে ধরা এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তাদের অনুরাগ জাগিয়ে তোলা। স্যার ইলিয়টের এই উদ্দেশ্যটি গোপন থাকে নি। অন্যান্য ভারতীয় ঐতিহাসিকদের চোখে ধরা না পড়লেও মহম্মদ হাবিব যথার্থভাবেই ইলিয়টের নিজের উক্তির মধ্যেই তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্যটিকে ধরে ফেলেছেন এবং পাঠকদের কাছে সেটিকে তুলে ধরে ইলিয়টের রচনার প্রকৃত চরিত্রটিকে বুঝতে সাহায্য করেছেন। ইলিয়ট দেশীয় ঐতিহাসিকদের রচনা সম্পর্কে লিখেছেন—

..."They will make our native subjects more sensible of the advantages accruing to them under the **mildness and equity of our rule**. If instruction were sought for them we should be spared the rash declarations respecting Mohammedan India which are frequently made by persons not otherwisely ignorant. We should no longer hear bombastic babus enjoying under our Government the highest degree of personal liberty and many more political privileges than were ever conceded to a conquered nation, rave about patriotism and the degradation of their present position. If they would dive into any of the volumes mentioned herein it would take these young Brutuses and Phocians a very short time to learn that in the days of that dark period for whose return they sigh, even the bare utterance of their ridiculous fantasies would have been attended not with silence and contempt but with the severest discipline, the molten lead or impalement..... and show him that.....we have already, within the half century of our dominion done more for the substantial benefit of the people than our predecessors in the country of their adoption were able to accomplish in ten times that period and drawing auguries from the past he will derive hope for the future, that inspired by the success which has hitherto attended our endeavours, we shall follow them up by continuous efforts to fulfil **our high destiny as the rulers of India**."

'.....high destiny as the rulers of India...' সম্পর্কে সচেতন স্যার ইলিয়টের এই উক্তিটি একটু অনুধাবন করলেই, তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চয় আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রকৃত ঐতিহাসিকের বিচারশক্তি

দিয়েই মহম্মদ হাবিব দেখিয়েছেন যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই স্যার ইলিয়ট আধুনিক যুগের মাপকাঠিতে মধ্যযুগকে বিচার করার চেষ্টা করছেন। আর তাই সে যুগের বর্বরতা, ধর্মের নামে গোঁড়ামী ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবকে এত বড় করে দেখিয়েছেন। মহম্মদ হাবিবের প্রশ্ন হল যে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে এই ধরনের বর্বরতা, ধর্মের নামে অত্যাচারের নজিরের কি অভাব আছে? ইউরোপীয় ঐতিহাসিক-দের রচনা থেকেই তিনি সেই যুগে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধের চরম নৃশংসতার চিত্র তুলে ধরেছেন। মহম্মদ হাবিব আরও প্রশ্ন করেছেন যে মধ্যযুগের ভারত ও পারস্য সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে, মধ্যযুগের ইউরোপে কি তার কোন তুলনা মেলে?

সাম্রাজ্যবাদেরই স্বার্থে স্যার ইলিয়ট ভারত ইতিহাসে "দ্বি-জাতি তত্ত্ব"টিকে খাড়া করেছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের চিরাচরিত কৌশল 'বিভক্ত করে শাসন করার' (divide and rule) উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস করেছেন যাতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে। মহম্মদ হাবিব দেখিয়েছেন যে ভারতীয় মুসলমান যারা যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে বসবাস করেছে, ভারতকেই যারা নিজেদের দেশ বলে মনে করেছে, যাদের ৯০ শতাংশই হল ভারতীয় হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত, তাদেরই স্যার ইলিয়ট 'বর্বর বিদেশী আক্রমণকারী' বলে চিত্রিত করেছেন আর তার বিপরীতে ভারতীয় হিন্দুদের ক্ষীণ, দুর্বল, আক্রমণরোধে অপারগ বলে বর্ণনা করেছেন, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার ভাব জাগিয়ে রাখার জন্য। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত অর্থেই বিদেশী শোষণকে সমর্থন করতে গিয়েই স্যার ইলিয়ট মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমানদের ওপর এই 'বিদেশী চরিত্র' আরোপ করেছেন এবং 'দেশীয়' হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের এক বিরাট ফিরিস্তি উপস্থিত করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে এই জন্য তাকে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত নানা ঘটনাবলী থেকে। তিনি লিখেছেন—"...that we are left to draw it (the picture) for ourselves from out of the mass of ordinary occurrences recorded by writers who sympathize with no virtue and abhor no vices." (Elliot & Dowson, History of India, Vol. I, P. XXI)। অর্থাৎ

এর অর্থ দাঁড়ায় যে তিনি তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিক্ষিপ্ত নানা ঘটনাবলী থেকে তাঁর সুবিধামত অংশগুলি বেছে নিয়েছেন এবং ইতিহাসের এক বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন।

মহম্মদ হাবিব তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগের ভারত ইতিহাসের এই মূল্যায়ন সঠিক নয়। স্যার ইলিয়ট ব্যতিক্রমকে সাধারণ নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। মহম্মদ হাবিবের মতে মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র যা হল পারস্যের ঐতিহ্যের অনুসরণ তা একান্তই ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি দেখিয়েছেন যে নিছক বাস্তব শাসনতান্ত্রিক কারণেই মধ্যযুগীয় মুসলমান সুলতানদের ভারতীয় হিন্দুদের, যারাই ছিল জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ও যাদের শৌর্যবীর্যের অভাব ছিল না, তাদের প্রতি সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করতে হয়েছে। উপরন্তু মহম্মদ হাবিব মধ্যযুগীয় শাসকদের নীতি ও আদর্শ দিয়ে সমগ্র মুসলমান সমাজকে বিচার করার ত্রুটির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় মুসলমান কবি, সাহিত্যিক ও সুফী সাধুদের ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভংগীকে ও সমগ্র মুসলমান সমাজের ওপর তার প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার অসাধুতার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। মালফুজৎ (Malfuzat) এর পাতায় সাধারণ মুসলমান জীবনের যে বর্ণনা আছে সেখানে শাসকশ্রেণীর কোন অহমিকা নেই, আছে দৈনন্দিন জীবনের ক্লেশ ও অসহনীয় দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম। সেখানে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মহম্মদ হাবিব দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগের সমগ্র রাজনৈতিক ইতিহাস অথবা ধর্মীয় সাহিত্যে কোথাও মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের 'জাতীয়' প্রতিরোধের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইলিয়ট তাঁর দ্বিজাতি তত্ত্বকে খাড়া করে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে সাধারণ ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি গড়ে উঠেছে তাকেই আড়াল করতে চেয়েছেন। আর এইভাবে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তিনি সঞ্চারিত করেছেন তা ভারত ইতিহাসকে করেছে কলুষিত।

সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় হল যে কোনো কোনো ভারতীয় ঐতিহাসিক কিন্তু ইলিয়টের এই সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন এবং ইলিয়টের চোখ দিয়েই তাঁরা ভারত ইতিহাসের বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্বাধীনতার ২৬ বছর পরে আজও ইতিহাসের এই ব্যাখ্যাই স্কুলে-কলেজে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করা হচ্ছে। ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র

মজুমদার তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তা কিছু নতুন নয়, তা হল স্যার ইলিয়টের এই সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন। কাজেই, মহম্মদ হাবিব, ইলিয়টের বিশ্লেষণ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, সন্দেহাতীত ভাবে সেই কথাটি প্রমাণ করে এবং সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও বিকৃতির প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করে ভারত ইতিহাসের যথাযথ মূল্যায়নের কাজটিকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন, যা আজকের দিনের একটি জরুরী প্রয়োজন।

ভারত ইতিহাসের যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রবন্ধকার সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে ইসলামের আবির্ভাব ও তার তাৎপর্যটির বিচার করেছেন। এই বিশ্ব-দৃষ্টি, লেখকের মতে, মধ্যযুগীয় পণ্ডিতজনের কাছে ছিল প্রায় অজানা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার উৎকর্ষ সম্পর্কে সচেতন ইউরোপীয় ইতিহাস-বিদ্‌দের রচনাতেও যার অভাব দেখা যায়। মহম্মদ হাবিবের মতে একমাত্র মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদের মধ্যেই রয়েছে এই বিশ্ব দৃষ্টি, যাঁরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত নিপীড়িত মানুষের কথাই তুলে ধরেছেন তাঁদের মতাদর্শের মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে কমিউনিজম ইতিহাসের একটি বড় তত্ত্ব নয়, বস্তুত মানব ইতিহাসের একমাত্র তত্ত্ব। এটি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানব সমাজের বিচার করে আর এর ভিত্তি হল শোষিত মানুষের মুক্তি। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের চিন্তাধারার ধারক ও বাহকরাই একমাত্র ইউরোপীয় যারা প্রাচ্যখণ্ডের মানুষের প্রতি বন্ধুত্বের হাত সম্প্রসারিত করেছে এবং মানুষের সমতার আদর্শের প্রতি যাদের প্রকৃত নিষ্ঠা রয়েছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা, তাদের জীবন সম্পর্কে মমত্ববোধ মহম্মদ হাবিবকে মার্কসবাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে।

ধর্মকেও তিনি মানব প্রগতিরই নিদর্শন রূপে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সমস্ত ধর্মের বিকাশ ঘটেছে মেহনতি মানুষের মধ্যে যা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অন্যায় অবিচারের নিগড়কেই ভাঙতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সংগে সংগেই তিনি একথাও স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি যে এক একটি ধর্মের সাফল্য সৃষ্টি করেছে এক একটি শাসকগোষ্ঠী যারা ধর্মকে তাদের নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, আর তাই ধর্মের প্রকৃত রূপ বারবারই গেছে হারিয়ে। ইসলামের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

মহম্মদ হাবিব ইতিহাসের ধারাকে বিচার করেছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে। ইসলামের সাফল্য ও অগ্রগতির কারণ

হিসাবে তিনি অস্ত্রের ঝনঝনানি আর আসুরিক শক্তির প্রয়োগকে লক্ষ্য করেন নি, তিনি দেখেছেন ইসলামের সমতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে যা বর্ণভেদদুষ্ট ভারতীয় সমাজে এক বৈপ্লবিক আলোড়ন উপস্থিত করেছিল। শহরের শ্রমজীবী মানুষ যারা এতদিন সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল তারাই ইসলামের সমতার বাণীতে উজ্জীবিত হয়ে সাগ্রহে মেনে নিয়েছিল এই নতুন ব্যবস্থাকে। শহরের শ্রমজীবী মানুষের এই বিপ্লবের (urban revolution) ওপর প্রবন্ধকার বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেছেন। শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকার গুরুত্ব বিচার করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে যখন মধ্য এশিয়ার বড় বড় প্রাচীন রাজ্যগুলি মোঙ্গল আক্রমণের সামনে ভেঙে পড়েছে তখন ভারতের তুর্কী শাসন যে সাফল্যের সঙ্গে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছে তার কারণ হল শহরের শ্রমজীবী মানুষ নতুন স্বাধীনতার আস্বাদনে উদ্বুদ্ধ হয়ে তুর্কী শাসনের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে এসেছিল। লেখকের মতে ভারতীয় সমাজে তুর্কীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল শহরাঞ্চলের এই বিপ্লব (urban revolution)। তিনি মনে করেন যে আলাউদ্দিন খলজীই প্রথম মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের অপসারিত করে এবং কৃষকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করে গ্রামাঞ্চলেও এই বিপ্লবকে প্রসারিত করেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের আমূল ভূমিসংস্কার (কৃষি বিপ্লব) এর সঙ্গে আলাউদ্দিনের এই সংস্কারের তুলনা পাঠকদের কাছে একটু অতিভাষণ বলে মনে হবে।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে মধ্যযুগের সমাজ, ধর্ম, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে মহম্মদ হাবিবের কয়েকটি প্রবন্ধকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একদিকে তিনি যেমন হজরত মহম্মদের জীবন ও ইসলাম ধর্মতত্ত্বের নানা দিক আলোচনা করেছেন, তেমনি আবার মধ্যযুগের হিন্দু সমাজ, হিন্দু-ধর্মচিন্তা, তাদের রীতিনীতি জীবনযাত্রা, সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ প্রভৃতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তা করতে গিয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন আল বিরুনীর বিবরণের ওপর। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইসলাম ও হিন্দু এই দুই ধর্ম ও সমাজের ভাল-মন্দ দুই দিককেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের ফলে ইসলাম যে তার প্রকৃত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে একথা যেমন তিনি বারবার বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেছেন তেমনই আবার, হিন্দু-সমাজের উৎকর্ষের নানা দিক আলোচনা

করতে গিয়ে বর্ণভেদের অযৌক্তিকতাকেও আঘাত করেছেন। সর্বত্রই সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যবহারিক ধর্মের কপটতা ও মানুষের প্রতি মমত্ববোধই মহম্মদ হাবিবকে আকৃষ্ট করেছে রহস্যবাদের (mysticism) দিকে। আর তাই বইটির তৃতীয় ভাগের বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি মধ্যযুগে এই mystic চিন্তার জন্ম, তার পরিপ্রেক্ষিত এবং খ্যাতনামা মুসলমান mysticদের জীবন আলোচনা করেছেন গভীর সহানুভূতির সঙ্গে। ইতিহাসের উপলব্ধি থেকে তিনি জেনেছেন কিভাবে যুগে যুগে ধর্মের নামে কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান রাজনীতি-বিদরা নিজেদের শাসন আর শোষণকে বজায় রাখার চেষ্টা করে আর ধর্ম-যাজকরা করে তার কাছে আত্মবিক্রয়। আর তাই তার পাশে mysticদের সরল অনাড়ম্বর জীবন, প্রকৃত ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা, জাগতিক লাভ ক্ষতির প্রতি উদাসীনতা ও সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসা মহম্মদ হাবিবকে আকর্ষণ করেছে mysticism-এর দিকে।

সব কয়টি প্রবন্ধের মধ্যেই লেখকের অনুশীলনের গভীরতার সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে। নিছক পণ্ডিত্য জাহির করার জন্য সহজ কথাকে দুরূহ করে তোলার কোন প্রচেষ্টা নেই এবং তার লেখার এই সাবলীল ভঙ্গী পাঠকদের তাঁর বক্তব্য অনুধাবনে বিশেষ সাহায্য করে। তাঁর প্রবন্ধগুলি নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি সম্পর্কে এক নতুন সতেজ ভাবনার সৃষ্টি করবে। আশা-করি তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে মধ্যযুগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

দীপিকা বসু

সম্পাদকীয়

ভিয়েতনামের জয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

দক্ষিণ ভিয়েতনাম অবশেষে রাহুমুক্ত হয়েছে। সেখানে মার্কিন তাঁবেদার থিউ সরকারের পতন ঘটেছে। হো চি মিনের স্বপ্ন—উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

শুধু ভিয়েতনাম নয়, প্রায় একই সময়ে, একই সঙ্গে মুক্ত হয়েছে কাম্বোডিয়া এক দুর্জয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে।

পিছিয়ে নেই লাওস। সেখানে অভূতপূর্ব গণ-জাগরণের সম্মুখীন হয়ে মার্কিন দালালগোষ্ঠী একে একে পলায়মান।

সারা ইন্দোচীন আজ মুক্ত। সারা ইন্দোচীন এখন নব প্রভাতের সূর্যোদয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম বা কাম্বোডিয়ার জয় শুধুমাত্র থিউ সরকার বা লন নল সরকারের পতন সূচিত করছে না, সূচিত করছে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের "পালের গোদা," মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপমানকর পরাজয়। একথা সর্বজনবিদিত যে থিউ সরকার এবং লন নল সরকার ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক। মার্কিন অর্থ, মার্কিন সামরিক সাহায্য, মার্কিন ট্যাঙ্ক, মার্কিন বোমারু বিমান, মার্কিন সৈন্য, গত একুশ বছর ধরে ভিয়েতনামে একটি পর একটি তাঁবেদার সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ৫,৫০,০০০ মার্কিন সৈন্য। কাজেই, প্রকৃত অর্থেই দক্ষিণ ভিয়েতনামের জয় সূচিত করছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ, চূড়ান্ত পরাজয়।

আজ মনে পড়ে বৃহৎ মার্কিন ও ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের লড়াই সম্পর্কে হো-চি মিনের সেই অবিস্মরণীয় ভবিষ্যদ্বাণী: 'আজ চলছে লড়াই একদিকে হাতী, আর একদিকে ফড়িংএর মধ্যে। কিন্তু আগামীকাল হাতী ভেঙে পড়বে।'

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কিভাবে ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের পক্ষে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রকে পরাজিত করা সম্ভব হল?

উত্তর দিতে গিয়ে প্রথমেই মনে আসে ভিয়েতনাম জনগণের অমিত বিক্রমের কথা। কিন্তু এই বীরত্বের উৎস কোন্ খানে?

ভিয়েতনামের জয়ের উৎস তার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে উত্তর ভিয়েতনামে এক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাষ্ট্র ছিল সত্যিকারের জনগণের রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের নেতৃত্বে অবস্থান করেছে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টি—ভিয়েতনাম ওয়ার্কাস' পার্টি। এই রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড হল শ্রমিক-কৃষক ঐক্য। যে দেশের জনসংখ্যার ৯০ ভাগ কৃষক, সেখানে শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের অর্থ জনতার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঐক্য। আরও বড় কথা। এই শ্রমিক-কৃষক ঐক্য দেশের নির্যাতিত মেহনতী মানুষের ঐক্য—যারা দেশের সৃষ্টিশীল শক্তি, সব চেয়ে বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক শক্তি, তাদের ঐক্যের প্রতীক। শুধু, তাই নয়, এই রাষ্ট্রের সঙ্গে রয়েছে ভিয়েতনামের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক এবং গণতন্ত্রকামী বুদ্ধিজীবী, যাদের প্রতিভা এই রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ। দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়ারাও এই রাষ্ট্রকে অনবরত সাহায্য দান করেছে। এক কথায়, দেশের মেহনতী মানুষকে প্রধান ভিত্তি করে, প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রকামী মানুষের সহযোগিতায়, এই রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে ভিয়েতনামের জনগণের সবচেয়ে প্রতিনিধি স্থানীয়, সবচেয়ে প্রিয় রাষ্ট্র।

এই সরকারের পরিপ্রেক্ষিত পরিচ্ছন্ন। কি সাম্রাজ্যবাদী, কি সামন্ততান্ত্রিক, কি ধনতান্ত্রিক সর্ববিধ শোষণব্যবস্থাকে নির্মূল করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উপনীত হওয়াই ছিল প্রথম থেকে এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারাই এই রাষ্ট্রটির গতিধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে।

ভিয়েতনামের ওয়ার্কাস' পার্টি এই রাষ্ট্রটির হাল ধরে রয়েছে। বস্তুত, ভিয়েতনামের জয়, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের জয়, ভিয়েতনামের জয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের জয়।

ভিয়েতনামের জয়লাভের প্রধান উৎস এইখানে।

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই যে ভিয়েতনামের নিজের শক্তি ভিয়েতনামের জয়ের প্রধান উৎস।

সঙ্গে সঙ্গে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভিয়েতনামের এই জয়লাভের পক্ষে অভূতপূর্ব এক অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

আজ আর সেই দিন নেই, যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তার পরাজয়

অবধারিত করে তুলতে পারে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে বিশ্ব পরিস্থিতিকে নিজের খুশীমত ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের আজ আর নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অকুণ্ঠ ও অকৃপণ সাহায্য ভিয়েতনামের জয়ের হয়েছে সুনিশ্চিত গ্যারান্টি। সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সামরিক, অর্থনৈতিক, বৈষয়িক ও নৈতিক সাহায্য দিয়ে ভিয়েতনামবাসীকে এই যুদ্ধে জয়লাভে চূড়ান্তভাবে সাহায্য করেছে। সোভিয়েত ট্যাঙ্ক, সোভিয়েত বিমান, এবং সোভিয়েতের দেওয়া অতি আধুনিক সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি ছাড়া পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত মার্কিন বিমানবাহিনীকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য ছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্যের জন্যে বারবার তাঁদের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ভিয়েতনামের জয় এই কথাই আবার প্রমাণ করছে যে সারা বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যে আজ আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা ক্রমশ পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্রস্থলে রেখে বিশ্ব-বিপ্লবী প্রক্রিয়া ক্রমশ অগ্রসর হয়ে চলেছে।

ভিয়েতনামের জয় বিশ্ববিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতির স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে। বিশ্ব সমাজতন্ত্রের শক্তিগুলি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শক্তিগুলিকে যে চূড়ান্তভাবে সাহায্য করছে, ভিয়েতনাম তার আবার আর একটি নতুন প্রমাণ উপস্থিত করছে। এটাই আবার প্রমাণিত হয়েছে যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। শুধু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যই নয়, দুনিয়ার দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নিযুক্ত শক্তিগুলি, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক ও বৈপ্লবিক আন্দোলনও ছিল ভিয়েতনামের সংগ্রামের নির্ভরযোগ্য সাথী। কাজেই ভিয়েতনামের জয় বিশ্ব বিপ্লবী প্রক্রিয়ার জয়।

ভারত সমেত জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি যারা ভিয়েতনামের সংগ্রামকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, ভিয়েতনামের জয় তাদের নীতিরও সারবত্তা প্রমাণ করছে। আমেরিকা সমেত পৃথিবীর প্রতিটি দেশে শ্রেণী-নির্বিশেষে যে কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ ভিয়েতনামের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, যারা

নানা স্তরে নানা ভাবে, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করেছে, এটি তাদেরও জয় সূচিত করছে। পৃথিবীতে এমন কোনো মুক্তি সংগ্রামের নজির নেই যা দুনিয়ার প্রতিটি দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের এমন অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছে। এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা, যেখানে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ভিয়েতনামের সমর্থনে সংগঠিত হয়েছে অসংখ্য সভা, শোভাযাত্রা, সংগঠন। ভারত সমেত কত দেশের কত মানুষ যে ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তার হিসাব কে রাখে? কাজেই ভিয়েতনামের জয় দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়া মুক্তিকামী, শান্তিকামী মানুষের জয়। ভিয়েতনামের জয় সত্যিই দুনিয়ার জনগণের জয়।

ভিয়েতনামের জয় ভারত সমেত সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে এই শিক্ষা দিচ্ছে যে :

(১) সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী চরিত্র কখনও বদলাবার নয়। ইন্দোচীনের ভূখণ্ড থেকে অপসারিত হবার পরেও সাম্রাজ্যবাদ কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজি নয়। তারা দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানকে কেন্দ্র করে এশিয়ার ওপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখার নতুন চক্রান্ত আরম্ভ করছে। ভিয়েতনামে পরাজিত হবার পরে তারা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের আগ্রাসী কাজকর্ম বৃদ্ধি করছে। দিয়েগো গার্সিয়া নিয়ে চক্রান্ত, তুরস্ক-ইরান-পাকিস্তান শাসক-চক্রকে কেন্দ্র করে সিয়াটো জোটের তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ভারত উপমহাদেশে মার্কিন চক্রান্তের এক নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করতে চলেছে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে একটি অতি জরুরী কর্তব্য হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

(২) ভিয়েতনামের বিজয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিই হল সদ্য স্বাধীন দেশগুলির অকৃত্রিম বন্ধু। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির মিত্রতা-চুক্তি এই সব দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার সহায়ক। এই সব দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনয়নের কাজকে এই চুক্তিগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করছে। এই দেশগুলিকে সামাজিক প্রগতির দিকে অগ্রসর হতে হলে সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে বেশী বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

(৩) ভিয়েতনামের যুদ্ধ আরও প্রমাণ করছে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী

সংগ্রামকে যদি জয়যুক্ত হতে হয় তাহলে এই সদ্য স্বাধীন দেশগুলিকে শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। ভিয়েতনাম দেখিয়ে দিচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম যখন সামাজিক মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হয়, যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও ধনতন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখনই এই সংগ্রাম দেশের ভিতরের সমস্ত বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, তখনই এই মুক্তি সংগ্রাম দুনিয়ার সর্বদেশের বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়, তখনই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

ভিয়েতনাম আমাদের এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে দুনিয়ার জনগণের পয়লা নম্বরের শত্রু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও দেশের ভিতরে সাম্রাজ্যবাদের যে অনুচরেরা রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

জাক দুক্লো

গত ২৫ এপ্রিল '৭৫ ফ্রান্সের তথা বিশ্বের যুগন্ধর কমিউনিস্ট নেতা দুক্লোর জীবনাবসান হয়েছে। একে একে মার্শেল কাশ্যাঁ, মরিস তোরে ও দুক্লোর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান ঘটল ফরাসী কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ে।

মাত্র কিছুদিন আগে তিনি ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পান শারীরিক কারণে। ১৯২৬ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। তারপর থেকে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তিনি সর্বদাই পুরোভাগে থেকেছেন। আবার একই সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সর্বহারার আদর্শ সামনে তুলে ধরে ফরাসী কমিউনিস্ট আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামী ঐতিহ্যের উপক্রমনিকা রচনা করেছেন। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে, বিশেষত: প্রতিরোধ সংগ্রাম (resistance movement) পপুলার ফ্রন্টের কালে এরাই ছিলেন সর্বাধিনায়ক।

যুদ্ধোত্তর কালে শান্তি আন্দোলন, ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর অননুকরণীয় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে দুক্লোর ভূমিকা সুবিদিত। সাম্প্রতিক সময়ে মস্কো থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ইতিহাস রূপরেখা' (Outline History of the Communist International) রচনায়, যাদের অবদান অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, দুক্লো তাঁদের অন্যতম ছিলেন। ফ্রান্সে কমিউনিস্টরা 'অগ্রসর গণতন্ত্রের' যে আহ্বানে তাবৎ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার পথে এগিয়ে চলেছেন, শুধু ফ্রান্সের কমিউনিস্টরা নয়, বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট ও গণতন্ত্রীরা জানেন যে, কাশ্যাঁ-তোরে-দুক্লোর আদর্শই তাদের গতিকে দুর্বার করে তুলেছে।

বর্ষসূচী

দশম বর্ষ

১৩৮১

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

ভারতে বৃটিশ শাসন/কার্ল মার্কস
উনিশ শতকের নবজাগরণ ও মাইকেল মধুসূদন/অমর দত্ত
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ
সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্ব/সত্য রায়
জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সম্পর্কে/অনুবাদ : দীপিকা বসু
সিস্টার নিবেদিতা/কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তাত্ত্বিক সমস্যা/রণধীর দাশগুপ্ত
জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে কয়েকটি
বিতর্কিত প্রশ্ন/নরহরি কবিরাজ
পর্তুগালের গণজাগরণ/চারুব্রত রায়
ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট

ভবানী ঘোষ

আষাঢ়-শ্রাবণ

ডঃ কে. এম. আশরফ/পত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়
চিলির শিক্ষা/বোরিস পনোমারিয়ভ
আমার রোজনামচা থেকে/ম্যাক্সিম গোর্কি : সুশীল জানা অনূদিত
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে
শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা/কিরিল শিরিনায়া
সোভিয়েত বিরোধিতার এক বিপজ্জনক দিক/সুবিনয় সেন
কমিউনিস্ট পার্টি ও পি-[illegible]/রণধীর দাশগুপ্ত
পিপলস লিট্‌ল থি[illegible]টার অভিনীত "টোটা"/নরহরি কবিরাজ
পুস্তক পরিচয়

শারদীয় (ভাদ্র-আশ্বিন)

জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অ-ধনতান্ত্রিক পথ সম্পর্কে/নরহরি কবিরাজ
পুঁজিবাদের চক্রাবর্তিত সংকট : সেকালে ও একালে/সুকুমার মিত্র
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য/সত্য রায়
লাতিন আমেরিকায় জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ/ভানুদেব দত্ত
আরব দেশগুলিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতি/তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত সরকারের নীতি : ভারতে ধনতন্ত্রের প্রসার/চারুব্রত রায়
ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য/মার্কসবাদী
ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে
শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর তাৎপর্য/বিভাস ঘোষ
ফোর্ড ফাউণ্ডেশন—নয়া-উপনিবেশবাদের
গোপন হাত/নির্ঘাল্য বাগচী
কংগ্রেসে প্রগতিশীল বিচারের মানদণ্ড/রণধীর দাশগুপ্ত
পত্রিকা পরিচয়

কার্তিক-অগ্রহায়ণ

লালন ফকির/গিরীন্দ্রনাথ দাস
পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট : আজকের দিনের
কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ/সুকুমার মিত্র
বাংলা লোকনাট্যের ধারা ও 'আলকাপ'/মানিক সরকার
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানসমূহ এবং
আমাদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে
সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা/সি. রাজেশ্বর রাও : অনুবাদ অরিন্দম ইন্দ্র
প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে সি-পি-এম কোন পক্ষে ?/নরহরি কবিরাজ
কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকা বলতে কি বোঝায় ?/রণধীর দাশগুপ্ত
আলোচনা : আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের
বিকৃত ব্যাখ্যা বন্ধ হোক/প্রভাতকুমার কামিলা
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এ মুহূর্তের প্রধান কাজ
বিয়োগ পঞ্জী : রজনী পাম দত্ত, নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ

পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র

নীলদর্পণ ও রেভারেণ্ড জেমস লঙ/অমর দত্ত

ঐতিহাসিক আশাবাদের দর্শন/ডি. প্রিপিসনভ

পুরনোর পরিবর্তে নতুন বিশ্ব/রজনী পাম দত্ত

রজনী পাম দত্ত ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি/নির্মাল্য বাগচী

রজনী পাম দত্তের সঙ্গে পত্রালাপ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দলের নেতার ভাষণ

আলোচনা : জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা/বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য

7 JUN 1975

এই প্রতীক কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে নিজস্ব ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে মূলতঃ সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্
আপনার সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

EIPC-FR-10 BEN

মূল্যায়ন

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানো

নারী মুক্তির প্রশ্নে লেনিন

নারী জাতির প্রতি বৈষম্য অবসান

নতুন যুগ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্য

নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ইতিহাস

CALCUTTA UNIVERSITY

১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৮২

মূল্য ঃ দেড় টাকা

নিজের সংগ্রহে রাখার ও উপহার দেবার মত কয়েকখানি বই

★

তরী হতে তীর : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২০·০০
রূপনারানের কূলে : গোপাল হালদার	৬·০০
মানুষের পার্থিব সম্পদ : লিও হুবারম্যান	১০·০০
আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা : সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	১০·০০
ধর্ম ও মার্কসবাদ : অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	২·৫০
দ্বীপান্তরের বন্দী : নলিনী দাস	১০·০০

★

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

আবেদন

গ্রাহকদের প্রতি

মূল্যায়ন জীবনের এক দশক পেরিয়ে দ্বিতীয় দশকে পদার্পণ করেছে। গত দশকটি চিহ্নিত হয়ে আছে নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করা ও নানা প্রতিকূল ও বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম দ্বারা।

এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের চলার পথকে উত্তরোত্তর সুগম করেছেন আমাদের গ্রাহক বন্ধুরা। একাদশ বর্ষের শারদীয় মূল্যায়ন প্রকাশের প্রাক্কালে আমাদের এই সব পুরাতন বন্ধুদের কাছে আবেদন তাদের পুরনো ও নতুন বছরের গ্রাহক চাঁদা যাদের বাকী পড়েছে তারা যেন যথাসম্ভব তা মিটিয়ে দেন।

মূল্যায়নের গ্রাহক হোন
মূল্যায়নের গ্রাহক করুন

For all your transport needs
to Assam & Tripura

Contact :

M/S. AIR LIFT

91, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-14

Phone : 24-9174

PROBLEMS OF NATIONAL LIBERATION

A journal of theoretical studies and research

Vol. 1 No. 1

- ☐ Growth of Nepali Nationality
- ☐ Santhal Agitation on Rent—1861-81
- ☐ Tanzania's Road to Socialism

Discussion :

Non-Capitalist Path in India :
Some Implications

Price : Rs. 3/-

To be had of :

Manisha Granthalaya (P.) Limited

4/3B, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

10, Bondel Road, Calcutta-19

আবেদন

এজেন্টদের প্রতি

অন্যান্যবারের মতই এবারেও শারদীয় মূল্যায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা ও তত্ত্বগত ও তথ্যনিষ্ঠ বিষয়ের ওপর আলোচনা থাকবে।

শারদীয় মূল্যায়ন মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে।

আমাদের নতুন ও পুরাতন এজেন্টদের সকলের নিকট আবেদন তারা যেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক মূল্যায়নের অর্ডার যথাসত্বর আমাদের জানিয়ে দেন।

বিনা অর্ডারে মূল্যায়ন পাঠানো সম্ভব হবে না।

শারদীয় মূল্যায়ন

অন্যান্য বছরের মত এবারও শারদীয় মূল্যায়ন বিচিত্র রচনা সম্ভারে প্রকাশিত হবে মহালয়ার পূর্বেই।

কালান্তর (দৈনিক)

কালান্তর (সাপ্তাহিক)

পড়ুন

ও

পড়ান

১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
আষাঢ়-শ্রাবণ
১৩৮২

সূচী

	পৃষ্ঠা
নারীমুক্তির প্রশ্নে লেনিন	১
নতুন যুগ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্য / নরহরি কবিরাজ	৪
নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব / ভ. রাইবাকভ	৮
বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ইতিহাস / অসিত রায়	১৮
বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সামাজিক ভিত্তিভূমির সম্প্রসারণ / কোন্ডালেভ	৩২
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম / ভানুদেব দত্ত	৪২
নারী জাতির প্রতি বৈষম্য অবসানের ঘোষণাপত্র	৬৩
গ্রন্থ পরিচয় ঃ	
ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস / চিত্রলেখা ভট্টাচার্য	৬৬
লেখার বিষয় / সুশীল জানা	৬৯
দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানো	৭৩
অরুণাচল বসু	৭৬

প্রচ্ছদ : অমূল্য দাস

সম্পাদক :
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
নরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বঙ্কিম রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত।

চাঁদার হার—বার্ষিক ৯ টাকা।

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

্যায়ন-এর এজেন্ট হতে গেলে :—

: কমপক্ষে পাঁচ কপি পত্রিকা নিতে হবে।

: পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হবে।

: ভি. পি. খরচ বহন করবে মূল্যায়ন।

: এজেন্সী কমিশন দেওয়া হবে শতকরা ২৫%।

াযোগের ঠিকানা :

কর্মাধ্যক্ষ

নারী-মুক্তির প্রশ্নে লেনিন

পুঁজিবাদ ও নারী শ্রম

'আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ তার গর্ভে নিঃস্বতা ও নিপীড়নের এমন বহু ঘটনা লুকিয়ে রাখে যা অবিলম্বে চোখে পড়ে না। পেটিবুর্জোয়া, কারুশিল্পী, শ্রমিক, কেরানি, ক্ষুদে কর্মচারীদের ছত্রভঙ্গ পরিবারেরা অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে বাস করে, একান্ত সুদিনেও তাদের সংসার চলে বহু কষ্টে। এসব পরিবারের লক্ষ লক্ষ নারী যাপন করে (বরং বলা ভালো, ভোগে) 'সাংসারিক দাসীর' জীবন, নিত্যকার একটা মরীয়া প্রচেষ্টা ও নিজের পরিশ্রমটি ছাড়া সব কিছুতেই 'ব্যয় সংকোচের' বিনিময়ে যারা পরিবারের দীন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চেষ্টিত।

এই মেয়েদের মধ্যে থেকে পুঁজি সাগ্রহেই কর্মী সংগ্রহ করে তার ঘরোয়া শিল্পের জন্য, নিজের ও সংসারের জন্য এক টুকরো রুটির আশায় যারা বিকট রকমের নিচু মজুরিতে 'উপরি রোজগার' করতে রাজী। এই নারীদের মধ্য থেকেই পুঁজিপতিরা (ঠিক প্রাচীনকালের দাস মালিক আর মধ্যযুগের ভূমিদাস-পতির মতই) সবচেয়ে 'ন্যায্য' মূল্যে যত খুশি উপপত্নী সংগ্রহ করে। এবং গণিকাবৃত্তি নিয়ে কোনো রূপ 'নৈতিক ধিক্কারই' (১০০র মধ্যে ৯৯টা ক্ষেত্রেই ভণ্ডামি) নারীদেহ নিয়ে এই ব্যবসার বিরুদ্ধে কিছু করতে অক্ষম: মজুরি দাসত্ব যতদিন থাকছে, ততদিন গণিকাবৃত্তি থাকবে। মানব সমাজের ইতিহাসে সমস্ত উৎপীড়িত ও শোষিত শ্রেণীরা শোষকদের নিকট চিরকালই বাধ্য হয়েছে (শোষণ ব্যাপারটাই তাই) প্রথমত নিজের অবৈতনিক শ্রম এবং দ্বিতীয়ত 'প্রভুর' উপপত্নীস্বরূপ নিজেদের বৌদের তুলে দিতে।

এদিক থেকে ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব ও পুঁজিবাদ একই প্রকার। বদল হয় কেবল শোষণের রূপ, শোষণটা থেকেই যায়'।

'প্রাভদা,' ৭ই মে, ১৯১৩ তে প্রকাশিত
(সংগৃহীত রচনাবলী, ২৩শ খণ্ড,
পৃঃ ১৩৬-৩৭)

মহান সূত্রপাত

মেয়েদের অবস্থা ধরা থাক। আমাদের শাসনের প্রথম বছরেই আমরা যা করেছি তা বিশ্বের কোনো সর্বাগ্রগণ্য বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রে কয়েক দশকেও কোনো একটি গণতান্ত্রিক পার্টি করে নি, বলতে কি তার শতাংশও করে নি। নারীদের অসমাধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের বাধানিষেধ, তার বহিরঙ্গের জঘন্য ঠাট-সর্বস্বতা, বিবাহ বহির্ভূত সন্তানদের অস্বীকার, তাদের পিতৃত্ব সন্ধান ইত্যাদি নীচ আইনকানুন আমরা প্রকৃত অর্থেই চূর্ণবিচূর্ণ করেছি, বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদের কলঙ্কস্বরূপ যেসব আইনের অসংখ্য জের রয়েছে সমস্ত সুসভ্য দেশেই। এই ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা নিয়ে আমাদের হাজার বার গর্বের অধিকার আছে। কিন্তু সাবেকী বুর্জোয়া আইন ও প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা থেকে ভূমি আমরা যত নির্মম করে সাফ করেছি ততই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে এটা খাস ইমারৎটা নয়, মাত্র সে ইমারতের জন্য ভূমি সাফ।

সমস্ত মুক্তিদায়ী আইন সত্ত্বেও মেয়েরা সাংসারিক বাঁদীই থেকে যাচ্ছে, কারণ তাকে দাবিয়ে রাখছে, শ্বাসরুদ্ধ করছে, বিমূঢ় করছে, হীন করে রাখছে ক্ষুদে সাংসারিক গৃহস্থালি, টেনে রাখছে তাকে রান্নাঘরে আর শিশুপালন করে, তুচ্ছ খিটখিটে, ভোঁতা, একঘেঁয়ে, অন্নাভাবিক রকমের অনুৎপাদক কাজে অপচয় হচ্ছে তার শ্রম। সত্যকারের নারী-মুক্তি, সত্যকারের কমিউনিজম শুরু হবে কেবল তখনই এবং সেখানেই যখন এবং যেখানে শুরু হবে এই তুচ্ছ গেরস্থালির বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রাম (রাষ্ট্র ক্ষমতাধর প্রলেতারিয়েতের পরিচালনায়) অথবা আরো সঠিকভাবে বললে, শুরু হবে, সে গেরস্থালিকে বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিরূপে ব্যাপক পুনর্নির্মাণ'।

সংগৃহীত রচনাবলী, ২৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭-৩৯৭

নারী গণ আন্দোলন

'নারী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিজেরই হওয়া দরকার এক গণ আন্দোলন, আর শুধুই প্রলেতারিয়েতদের আন্দোলনের অংশ নয়, সমস্ত শোষিত ও নির্যাতিত, পুঁজিবাদের কাছে যারাই বলি তাদের সবাইকার আন্দোলনেরই অংশ। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণীসংগ্রাম এবং তার ঐতিহাসিক সৃষ্টিধর্মী কর্তব্য, অর্থাৎ কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলার যে কর্তব্য তার কাছে নারী আন্দোলনের তাৎপর্য এখানেই নিহিত রয়েছে। অবিশ্যই, আমাদের পার্টির

মধ্যে বিপ্লবী স্ত্রী-জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ যে রয়েছে, এর জন্য গর্ব করার অধিকার আমাদের আছে। কিন্তু এখনো এটার তাৎপর্য চূড়ান্ত নয়। আমাদের লড়াইয়ে, এবং বিশেষ করে সমাজকে কমিউনিস্ট আদর্শে পুনর্গঠনের কাজের মধ্যে টানতে হবে শহরের ও গ্রামের কোটি কোটি মেহনতী নারীদের। মেয়েদের বাদ দিয়ে আসল গণ আন্দোলন হতেই পারে না।

ক্লারা সেৎকিন-এর 'আমার স্মৃতিতে লেনিন' গ্রন্থ থেকে

নতুন যুগ ঃ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশে মার্কসবাদী মহলে নতুন যুগে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যে নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাচ্ছে তা নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছে। একথা সুবিদিত যে 'মূল্যায়ন'-এর পাতায় নতুন যুগে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে একটি সুর। এই বিষয়ে 'মূল্যায়ন' তুলে ধরেছে ধারাবাহিকভাবে একটি সুস্পষ্ট বক্তব্য। 'মূল্যায়ন'-এর এই বক্তব্য সকলে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেউ কেউ এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন, কেউ কেউ রীতিমত আক্রমণ করেছেন।

আমাদের যুগে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে যে বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দিচ্ছে তা নতুন, তার বিকাশও অনেক ক্ষেত্রে জটিল। কাজেই বিতর্ক ওঠা স্বাভাবিক এবং এই বিতর্কের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে বিতর্কের জন্যে বিতর্ক নয়। এই বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমরা যাতে একমতের দিকে অগ্রসর হতে পারি সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই কাজে আমাদের সাহায্য করতে পারে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। সর্বশেষ আন্তর্জাতিক দলিল অধ্যয়ন, মার্কসবাদী সম্মেলনের সর্বশেষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ, বিশ্ববরেণ্য মার্কসবাদী পণ্ডিতদের লেখা নানা গবেষণা গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয়—এইগুলিই আমাদের একমতে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। সম্প্রতি "শান্তি, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র" নামক বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায় সোভিয়েত পণ্ডিতদের লেখা বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটির নাম "নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব"। এই প্রবন্ধের মূল বিষয়গুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আমরা বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণের ভূমিকা

প্রথমেই, আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে—নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে কি চোখে দেখছে। লেনিনীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে উপরোক্ত প্রবন্ধে এই বিষয়ে বলা হয়েছে—আমাদের যুগ হল ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। এই যুগের জাতীয়

মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হল এইখানে যে শ্রমজীবী জনগণ (working people) এতে সক্রিয় হয়ে উঠছে।

লেখক মন্তব্য করেছেন—"পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের যুগে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রধান বিপ্লবী মিত্র হচ্ছে এই অঞ্চলের (জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম যেখানে চলছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে) শ্রমজীবী জনগণ।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন মনে করে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে প্রধান শক্তি কৃষক। তাদের চোখে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে মৈত্রীর প্রতীক।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের গণতন্ত্র-বিরোধিতার দিক

এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে—নতুন যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সাধারণভাবে গণতান্ত্রিক চরিত্র বিশিষ্ট। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সামনে রয়েছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজগুলিকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব—বিশেষ করে অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার দায়িত্ব। কিন্তু তাই ব'লে এই সংগ্রাম এখন আর শুধু জাতীয় মুক্তির (অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি এখন সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধ শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত। লেখকের কথায়—"বর্তমানে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম একত্রিত হচ্ছে এবং এই বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক উভয় শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে।"

নতুন যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমজীবী জনগণ সক্রিয় ভূমিকা নিতে আরম্ভ করায় এতে ধনতন্ত্র-বিরোধী ধারাটি ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধকার বলছেন—"জাতীয় মুক্তি অঞ্চলে বিষয়গত ও বিষয়ীগতভাবে যে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নির্ণয় করা," এখন জরুরী কর্তব্য।

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে মুখ্য শক্তি কারা?

যেহেতু নতুন যুগের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, ধনতন্ত্র-বিরোধী, তিনটি প্রবণতাই বিকাশলাভ করছে তাই

আন্দোলনের এই নতুন স্তরে কোন্ কোন্ শ্রেণী মুখ্য শক্তি (motive force) হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে—এই প্রশ্নটির অবতারণা করে প্রবন্ধকার লিখেছেন—"যে সব শক্তি বিপ্লবী উপায়ে সাধারণ কর্মসূচীকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে কেবলমাত্র তারাই এর মধ্যে পড়ে। এরা হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক (প্রধানত এর মেহনতী ও শোষিত অংশ) এবং মধ্যবর্গ।" জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী কি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান স্তরে অন্যতম মুখ্য শক্তি (motive force) বলে বিবেচিত হতে পারে ? উত্তর দিতে গিয়ে প্রবন্ধকার লিখেছেন—"এই নতুন স্তর, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের যে স্তর বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে যায় সেই স্তরে যে সমস্যাগুলি হাজির হয় তাদের আলোতে এই প্রশ্ন আলোচিত" হওয়া প্রয়োজন।...."জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও বৈপ্লবিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য টানা" প্রয়োজন। "পূর্ববর্তী স্তরে যখন লক্ষ্য ছিল জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি তখন এই দুই প্রবণতা প্রায়ই এক প্রবণতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করত। এখন যদিও বিষয়গতভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থের সংঘাত ঘটছে, তবুও জাতীয় বুর্জোয়ার প্রবণতা হল বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা এবং এরা বিপ্লবের মূল শক্তি হতে পারে না।"

অ-ধনতান্ত্রিক পথের মর্মবস্তু

সর্বশেষে, লেখক অ-ধনতান্ত্রিক পথের মর্মবস্তু কি তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—অ-ধনতান্ত্রিক পথ শুধুমাত্র একচেটিয়া পুঁজির সংকোচন নয়, ধনতন্ত্রের নিয়মগুলির গতিরোধ করা। তাঁর ভাষায়—"অ-ধনতান্ত্রিক পথের ভিত্তিতে স্বয়ং পুঁজিবাদের নিয়মগুলিকে কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমেই পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা যায়।"

"যদি ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি সুদৃঢ়ভাবে ও বৈপ্লবিক পথে সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজগুলি সমাধা করে, তাহলে তারা যে সংস্কারগুলি শুরু করে, সেগুলো বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করবে।

এইভাবে অ-ধনতান্ত্রিক পথে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। "অ-ধনতান্ত্রিক পথের" প্রধান মর্মবস্তু হল "সমাজতান্ত্রিক প্রবণতাটি বেছে নেওয়া।" তাঁর কথায়—"সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জন হল সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া।"

পাঠকেরা অবগত আছেন যে—আমাদের মধ্যে সম্প্রতি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃতি নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিল তাতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল (১) জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ধনতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে—এ কথা বলা ঠিক কিনা, (২) জাতীয় বুর্জোয়াকে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে অন্যতম মুখ্য শক্তি (motive force) বলা যায় কিনা, (৩) জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির (শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া) এবং জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা সমগোত্রীয় কিনা। (৪) অ-ধনতান্ত্রিক পথ ধনতন্ত্রের নিয়মের বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার পথে পরিচালিত কিনা।—উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিতর্কিত প্রশ্ন নিয়ে এই প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাতে একটি সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

আমাদের মার্কসবাদী মহলে বিতর্ক নিরসনে প্রবন্ধটি বিশেষ সাহায্য করতে পারে—এই বিবেচনায় প্রবন্ধটির পূর্ণপাঠ আমরা প্রকাশ করছি।

নরহরি কবিরাজ

নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি বিপ্লব

ভ্যেসেভোলোদ রাইবাকভ

মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞান সব সময় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমস্যাবলীর প্রতি অনেক মনোযোগ দিয়েছে। বিশ্ব বৈপ্লবিক বিকাশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভূমিকা বিচার করার জন্য যেসব জটিল ও পরস্পর-বিরোধী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই আন্দোলনে ঘটছে, সে সব প্রক্রিয়াকে তত্ত্বগতভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের এ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক মার্কসবাদী আলোচনার প্রয়োজন আছে, কারণ এই আন্দোলনে যে অঞ্চল জড়িয়ে পড়েছে সে অঞ্চলের শ্রমজীবী জনগণ হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই যুগে প্রধান বিপ্লবী মিত্র।

লেনিনের শিক্ষা থেকে এই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় নির্যাতিত জনগণের ভূমিকার প্রতি এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞান উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মসমূহ উদ্ঘাটিত করার জন্য অনেক কিছু করেছে। বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ঐ বিষয়ের অধিকতর সামগ্রিক ও সামান্যীকরণের উপযোগী গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে! ষাট দশকের শেষভাগে এই সব গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। গত বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই রকম তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তাদের লেখকরা হলেন ইতিহাসের ডক্টরেট[১] অধ্যাপক কে ব্রুটেন্টস, ইনস্টিটিউট অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইনটারন্যাশন্যাল রিলেশন্স (আই. এম. ই. এম. ও)-র সোভিয়েত বিজ্ঞান এ্যাকাডেমীর একটি গবেষকদল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হলেন এ্যাকাডেমীর করেসপণ্ডিং

---

১ কে. এন. ব্রুটেন্টস, **Sovremennіye nabsional no-osvoboditelnіye revolyutsii. Nekotoriye voprosy teorii** (সমসাময়িক জাতীয় মুক্তি বিপ্লব : তত্ত্বগত কয়েকটি সমস্যা) পলিটিজাট, মস্কো, ১৯৭৪।

সদস্য ভি. ত্যাগাণ্ডনেস্কো[২] এবং এ্যাকাডেমিশিয়ান বি. গফুরভ ও অধ্যাপক জি. কিম, ইতিহাসের ডক্টরেট[৩], এদের নেতৃত্বে পরিচালিত এ্যাকাডেমির ইনস্টিটিউট অব্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের একটি গবেষকদল। এই বইগুলিতে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ সম্পর্কে অতি সাম্প্রতিককালের সোভিয়েত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে সব প্রক্রিয়া ও প্রবণতার উদ্ভব হচ্ছে তাদের সারার্থ।

দৃষ্টিভঙ্গি ঃ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক কাঠামোগুলি এত বিভিন্ন ধরনের এবং এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের এবং এক দেশ থেকে আরেক দেশের অর্থনৈতিক স্তর ও সামাজিক গঠনের এত বিরাট পার্থক্য রয়েছে যে বর্তমানে কয়েকজন বুর্জোয়া বিশ্লেষক যাঁরা আগে 'তৃতীয় দুনিয়া' শব্দটি যথেচ্ছ ব্যবহার করতেন তাঁরা 'তৃতীয় দুনিয়াসমূহ' বলতে শুরু করেছেন।[৪] তথাপি, এমন কয়েকটি দিক আছে যার ফলে ঐ সব দেশের পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

প্রথমত, জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের অসমাপ্ত চরিত্র রয়েছে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্য রয়েছে। বর্তমানে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে সামাজিক মুক্তির সংগ্রাম একত্রিত হচ্ছে এবং বিপ্লব সামন্ত-তান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক উভয়েই শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। অধ্যাপক ব্রুটেন্টসের রচনায় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে এই সব বিপ্লব হল নতুন ধরনের বিপ্লব। "এ সব বিপ্লব হল এক ঐতিহাসিক লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ; এই লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদী যুগের ও অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী বিপ্লব-গুলির লক্ষ্য থেকে ভিন্ন।

আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল যে এই সব সমাজে বহুবিধ উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে ; ঐতিহ্যগত ও আধুনিক, সেকেলে ও উদীয়মান উপাদানের সংমিশ্রণ

---

২ **Razvivayushchiesya strany : zakonomernosti, tendensii. perspektivy** (উন্নয়নশীল দেশসমূহ : বিষয়গত নিয়ম, প্রবণতা ও ভবিষ্যৎ) মিসেল, মস্কো, ১৯৭৪।

৩ **Zambezhnyi Vostok i sorremennoʻst. Osnovniye zakonomerrosh i spetsifika razvitia osrobodivshikhsya stran** (প্রাচ্য দেশসমূহ ও আমাদের যুগ : প্রধান বিষয়গত নিয়ম ও সদ্যস্বাধীন দেশসমূহের বিকাশের বৈশিষ্ট্য) দুই খণ্ড নৌকা, মস্কো, ১৯৭৪।

৪ দেখুন. পি. ড্রুয়েইন, "**Les 'Twes mondes**", **Le Monde**, অক্টোবর ২৪, ১৯৭৪।

রয়েছে যার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোসমূহে জটিলতা ও বিশেষত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ দবের ফলে ইনস্টিটিউট্ অব্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত যে বইতে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় দেশগুলি সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেই বইতে সদ্য স্বাধীন দেশসমূহের সাধারণ চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। বহুবিধ কাঠামো সম্বলিত সমাজ সম্পর্কে লেনিনের তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে লেখকরা জোর দিয়েছেন যে বর্তমানে এই বহুবিধ কাঠামোর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য দেশে তাদের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে সাধারণত ছিল না।

ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশন-এর লেখকরা মনে করেন যে মূলত প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতার ফলে নির্ভরশীল বিকাশের অঞ্চল হিসাবে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলির বিকাশ ঘটেছে, কারণ ঔপনিবেশিকতার ফলে এ সব ঐতিহ্যগত কাঠামো অধিকতর উন্নত একচেটিয়া পুঁজির কাঠামোর সেবায় নিযুক্ত। এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শ্রম বিভাজনে উন্নয়নশীল দেশগুলির অংশগ্রহণ করায় এ প্রক্রিয়া ঘটছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে বর্তমান কাঠামোগুলি ততটা স্বাধীন বিকাশের ফল নয়, যতটা এর পিছনে যে বাইরের উপাদান কাজ করছে তার ফল। বাইরের উপাদানগুলিই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং অন্যদিকে এ প্রক্রিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে, উপরি কাঠামোর রূপ এ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

সমীক্ষাধীন বইগুলির প্রধান বিষয় হল জাতীয় মুক্তি অঞ্চলে বিষয়গত ও বিষয়ীগতভাবে যে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নির্ণয় করা।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পশ্চাৎপদতা ঃ প্রধানত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে পরিচালিত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা প্রকাশিত হচ্ছে। ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশন্স-এর লেখকদের মতে এই পশ্চাৎপদতার জন্য পুঁজিবাদী বিকাশের সাধারণ নিয়মসমূহের মন্থর গতি দায়ী নয়, এর জন্য দায়ী হল ঐসব নিয়মের অদ্ভুত 'আঞ্চলিক' অভিব্যক্তি যা হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জড়িয়ে পড়ার ফল। সুতরাং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে "যদিও কৃত্রিমভাবে সাধিত প্রগতিশীল পদক্ষেপ ও সংস্কারগুলি হল আগেকার

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের অনুরূপ, তবুও অ-ধনতান্ত্রিক পথের ভিত্তিতে স্বয়ং পুঁজিবাদের নিয়মগুলিকে কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমেই পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠা যায়।"

এমন কি সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটলেও দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা হল আগেকার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলির নির্ভরতার ভিত্তি। ব্যতিক্রম হল যে বর্তমানে রয়েছে নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন। কারণ, ইনস্টিটিউট অব ইস্টার্ন স্টাডিজ কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির মতে, যদিও সদ্য-স্বাধীন দেশগুলো এক স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণে সমর্থ এবং মোটামুটি সাফল্যের সাথে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাথে অসম সম্পর্কের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করে তবুও অর্থনৈতিক অসমতা থেকেই যায় (প্রাচ্যের দেশগুলিতে)। অধিকন্তু বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রসারের (বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নত কারিগরি বিদ্যার উপর উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির একচেটিয়া আধিপত্য ইত্যাদি) ফলে নতুন ধরনের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চাৎপদ দেশগুলির উপর নয়া-উপনিবেশবাদী শোষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এইভাবে, অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশগুলির 'নেতৃত্ব অনুসরণ' করার প্রচেষ্টার ফল হল মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদনের নামমাত্র বৃদ্ধি; অর্থাৎ "অগ্রগতি-হীন বিকাশ" এবং এ প্রচেষ্টা নির্ভরশীল বিকাশের ফলে উদ্ভূত সঙ্কটকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে (ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স)। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অধিকসংখ্যক জনগণ উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন যে সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সহযোগিতা ও সম্পর্ক প্রসারিত না করলে, নির্ভরশীলতা ও পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটানো অসম্ভব।

মূল কাঠামো : অধ্যাপক ব্রুটেন্টস মন্তব্য করেন, জনগণের অধিকাংশের মধ্যে যে চিরাচরিত জীবনধারণের পদ্ধতি বিরাজ করে তা নির্ভরশীল পুঁজিবাদ অদূর ভবিষ্যতে 'হজম' করতে পারে না। ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশনস-এর লেখকরা জোর দেন যে এই জন্যই চিরাচরিত কাঠামোগুলির ভাঙনের অর্থ এই নয় যে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। নিশ্চিতভাবে, এশিয়া ও আফ্রিকার সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশগুলিতেও ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটছে। এটা কেবলমাত্র নিজস্ব বিকাশের

স্বাভাবিক পরিণতি নয় এবং অধিকন্তু, এটা অধিকতর উন্নত সামাজিক সম্পর্কের প্রতিনিধি, নতুনতম রূপের রাষ্ট্রীয় বা বৈদেশিক পুঁজির অধীন।

এর মানে এই যে, পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে মূল কাঠামোতে পরিণত হওয়ার জন্য দুর্বল দেশীয় পুঁজিবাদের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এবং 'ইনস্টিটিউট্ অব্ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' দেখিয়েছেন যে, এইরূপ কয়েকটি দেশে অত্যন্ত উন্নত হলেও "দেশীয় বৃহৎ ব্যবসা বহুবিধ আর্থব্যবস্থা সমন্বিত সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের প্রধান প্রধান নিয়মগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে না—এবং এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" যাই হোক, ইনস্টিটিউট্ অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশন্স-এর লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, এই সব দেশে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে এবং এটা দেশের উপর বিকাশের ভিন্ন রূপ ভালোমতো চাপিয়ে দিতে পারে।" এক্ষেত্র বহুজাতিক একচেটিয়া পুঁজির উপর নির্ভর করে বিকাশ লাভ করছে।

দেশীয় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদের দুর্বলতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের একক অভ্যন্তরীণ পদ্ধতির অভাব বিষয়গতভাবে বহু কাঠামোযুক্ত সমাজে সংগঠক হিসাবে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা সৃষ্টি করছে। যে সমস্ত দেশ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে সেসব দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে এবং এ সম্পর্কে সব লেখকেরা একমত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হল সবচেয়ে গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো যে সবচেয়ে আধুনিক উৎপাদিকা শক্তির উপর কেন্দ্রীভূত করছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি হতে পারে, বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে, অন্যান্য কাঠামোকে তার অধীনে রাখতে পারে বা নিজের মতো করে তাদের তৈরি করতে পারে। সুতরাং এই ক্ষেত্রকে নিয়ে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম চলে। কিভাবে সংগ্রাম চলছে তার উপর নির্ভর করে এটা নয়া-উপনিবেশবাদ, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি বা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজির উপর নির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদে বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু এটা আবার সমাজতন্ত্রমুখিনতা, স্বাধীন অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তিও হতে পারে। এর মধ্যে কোন্ প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠবে তা নির্ভর করে সেই সামাজিক শক্তিগুলির উপর যারা ক্ষমতা দখল করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই প্রশ্নটা জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব ও চালিকা শক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের অংশ।

বিপ্লবের চালিকাশক্তি ঃ মুক্তি বিপ্লব তার নতুন স্তরেও তার ব্যাপক

জাতীয় চরিত্র বজায় রাখে। অধ্যাপক ব্রুটেন্টস লিখেছেন, "প্রথম দৃষ্টিতে এই বক্তব্য মনে হতে পারে অত্যন্ত ভুল। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে পূর্ববর্তী স্তরে যখন ব্যাপক জাতীয় বিপ্লবের কথা বলা হয়, তখন আমরা জাতি বলতে শুধুমাত্র নৃতাত্ত্বিক বর্গ বুঝি না, জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রাণিত সামাজিক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠীকেও বুঝি এবং এর থেকে বেশির ভাগ সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও মুৎসুদ্দি দলগুলি বাদ পড়ে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে দ্বিতীয় স্তরে বিপ্লবের কর্মসূচীতে 'জাতি'র যে অর্থ করা হয় তাতে জাতির সামাজিক সীমা কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, যদিও বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিতে জড়িত জাতির 'ভিত্তি' প্রসারিত হয়।" বিপ্লবের চালিকাশক্তির ব্যাপকতা আরো সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং যে সব শক্তি বিপ্লবী উপায়ে সাধারণ গণ-তান্ত্রিক কর্মসূচীকে কার্যকর করতে চেষ্টা করে কেবলমাত্র তারাই এর মধ্যে পড়ে। এরা হল শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক (প্রধানত এর মেহনতী ও শোষিত অংশ) এবং মধ্যবর্গ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ক্রমশ স্পষ্ট শ্রেণীচরিত্র গ্রহণ করে এবং সামাজিক বৈরিতা ও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয়।

এই স্তরেও, বেশির ভাগ পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত এখনও এত দুর্বল যে সে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এটা লেখক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন যে সমস্ত শ্রেণী ও সামাজিক দলগুলির মধ্যে এই শ্রেণীই শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে বাড়ছে না : তার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানও সংহত হচ্ছে। অবশ্য এই ঘটনা বিপ্লবের উপর অধিকতর প্রভাব ফেলে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এল. আই. ব্রেঝনেভ বলেন[১] যে কৃষকের দৃষ্টিভঙ্গি হল জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বর্তমান স্তরে চূড়ান্ত প্রশ্ন। কৃষক হল এই সমাজের সামাজিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি ; কিন্তু এরা বেশির ভাগ অপ্রস্তুতভাবে এবং প্রলেতারিয়েত-প্রভাবিত রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন না করে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়। এখানেই সামাজিক সংগ্রামে কৃষকদের অংশগ্রহণের বিশিষ্ট রূপ ; অর্থাৎ "এরা এদের নিজস্ব শ্রেণী রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে নয়, বরং শহরের শ্রেণী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'প্রকৃত' কৃষক মনোভাব জাতীয় প্রতিষ্ঠান সামরিক বাহিনীর মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে…" (প্রাচ্য

১ দেখুন, এল. আই. ব্রেঝনেভ, লেনিন নির্দেশিত পথে খণ্ড-২, রুশ সংস্করণ, পৃঃ-৩৮৬।

দেশসমূহ)। পরাধীন দেশগুলিতে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আঁকাবাঁকা পথের জন্য কৃষকদের এই এবং অন্যান্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলিই হল অন্যতম কারণ।

জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী হল কমিউনিস্ট রণনীতি ও রণকৌশলের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই নতুন স্তর, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য সংগ্রামের যে স্তর বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে যায় সেই স্তরে যে সমস্যাগুলি হাজির হয় তাদের আলোতে এই প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সমীক্ষাধীন বইগুলিতে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও বৈপ্লবিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য টানা হয়েছে। পূর্ববর্তী স্তরে যখন লক্ষ্য ছিল জাতীয়, রাজনৈতিক মুক্তি তখন এই দুই প্রবণতা প্রায়ই এক প্রবণতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করত। এখন, যদিও বিষয়গতভাবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের সাথে জাতীয় বুর্জোয়ার স্বার্থের সংঘাত ঘটছে, তবুও জাতীয় বুর্জোয়ার প্রবণতা হল বৈপ্লবিক সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা এবং এরা বিপ্লবের মূল শক্তি হতে পারে না। অধিকন্তু ক্রুটেন্টস মন্তব্য করেন যে, সর্বত্র তার শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও সমাজতন্ত্রমুখিনতাকে বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে; এ সংগ্রাম "শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত নয়; এ সংগ্রাম হল তিনটি প্রবণতা, সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াপন্থী শক্তিসমূহ, শ্রমজীবী ও শোষিত জনগণের মধ্যে মুখোমুখি সংগ্রাম।"

এর অর্থ এই নয় যে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিকে ছোট করে দেখা হচ্ছে। বিপরীত পক্ষে—এবং এটার উপর সব লেখকরা জোর দিয়েছেন—জাতীয় বুর্জোয়ার বেশ একটা অংশ জাতীয় মুক্তির জন্য, সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য-বিরোধী মোর্চায় সক্রিয়ভাবে কাজ করে থাকে।

মধ্যস্তরের জনগণের নেতৃত্ব সম্পর্কে ঃ ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স-এর লেখকদের মতে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা সমাজের পরিবর্তনশীল চরিত্রের ফলে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে। তথাকথিত মধ্যস্তরের জনগণ, প্রধানত যে দলগুলি সমাজের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্ব, বিশেষ করে সরকার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত তারা এই শূন্যতা পূরণ করছে।

এই তথ্য থেকে ইনস্টিটিউট-এর গবেষণা সিদ্ধান্ত করছে যে রাষ্ট্রের ভিত্তিতে

জন্য নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করছে এবং সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক (শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিকই নয়) সীমানার মধ্যে তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব সংহত করছে।"

এইভাবে আপেক্ষিক স্বাধীনতা অর্জন করে এই সব দল এই মত প্রকাশ করে যে, তারা হল অ-বুর্জোয়া ও অ-প্রলেতারীয়, মধ্য বর্গীয় 'তৃতীয় পথের' প্রতিনিধি। ব্রুটেন্টস লেখেন, প্রকৃতপক্ষে "অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে এই সামাজিক মধ্যস্তরের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক প্রবণতার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত···। এদের লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র। অথবা এই জনগণ বুর্জোয়ামুখী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পুঁজিবাদ হল এদের লক্ষ্য। এর মধ্যে কোন্ প্রবণতা প্রধান হয়ে উঠবে তার উপর নির্ভর করে জাতীয় মুক্তি বিপ্লব হয় অথবা বিলম্বে পরস্পর-বিরোধী এই দুই পথের যে কোনো একটি পথ অনুসরণ করে হয় সমাজতন্ত্র না হয় পুঁজিবাদের দিকে পরিচালিত হবে।"

মাঝে মাঝে আমরা শুনি যে পুঁজিবাদের কোনো ভিত্তি নেই ; কারণ জাতীয় মুক্তি অঞ্চলের দেশগুলিতে বুর্জোয়ারা দুর্বল বা নির্ভরশীল। যাই হোক, এর শ্রেণীগত কাজ অন্যান্য সামাজিক স্তরের উপর বর্তায়। এই পরিস্থিতিতে, সমীক্ষাধীন বইগুলিতে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বিশ্লেষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ভিত্তিতে একটা স্বাধীন সামাজিক স্তর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বুর্জোয়া জীবনযাত্রার প্রতি এদের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং যেভাবে দেশীয় বুর্জোয়াদের জন্ম হচ্ছে সেভাবে এদের বিকাশকে সঠিক-ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়···(ব্রুটেন্টস)।" সামাজিক পথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটাই হল মধ্যবর্গের অস্থিরচিত্ততার কারণ।

মানসিকতা ও প্রচেষ্টার তীব্র দোদুল্যমানতা হল এই সব সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক একই ঘটনাসমূহের প্রতি এদের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়। সোভিয়েত লেখক আই. বেলিয়ায়েভ ও ওয়াই. প্রাইমানভ নাসেরের শাসনে মিশর সম্পর্কে তাদের বইতে[১] বলেন, "ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক মানসিকতা, মনস্তত্ত্ব, এমন কি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও তাদের মতাদর্শগত বিবর্তন, সবই প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ।" আফ্রো-এশিয়ার অন্যতম প্রধান প্রধান দেশ সম্পর্কে তাদের

১ Egipet, vremya prezidenta Nasera, Mysl, মস্কো, ১৯৭৪।

আকর্ষণপূর্ণ গবেষণায় সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোগুলির প্রাথমিকভাবে 'বাছাই' করার স্তরে রয়েছে এরকম অবস্থায় বিকাশের পথ স্থির করার সংগ্রামের বহু দিক নিয়ে আলোচনা আছে।

পথ নির্ণয়, বিপ্লবী গণতন্ত্র ঃ ইনস্টিটিউট অব ওয়ার্ল্ড ইকনমি এ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্স-এর গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, "বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে : আমাদের যুগের দুই প্রধান শক্তি, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ তৃতীয় দুনিয়ার সামাজিক বিপ্লবকে প্রভাবান্বিত করছে, কিন্তু বেশির ভাগ দেশে তাদের কারুরই কোনো দৃঢ় সামাজিক ভিত্তি নেই।" এটাই বিষয়ীগত উপাদানের ভূমিকার গুরুত্ব তুলে ধরে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শীর্ষে কোন শক্তি রয়েছে তার উপর নির্ভর করে কোন্ পথ বেছে নেওয়া হবে। যদি ক্ষমতাসীন শক্তিগুলি সুদৃঢ়ভাবে ও বৈপ্লবিক পথে সাধারণ গণতান্ত্রিক কাজগুলি সমাধা করে, তাহলে তারা যে সংস্কারগুলি শুরু করে, সেগুলি বিষয়গতভাবে পুঁজিবাদ-বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করবে।

এইভাবে অ-ধনতান্ত্রিক পথে উত্তরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। প্রথম পদক্ষেপ হল সমাজতন্ত্রমুখিনতা বেছে নেওয়া এবং এর মানে হল এই যে সাধারণ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জন হল সচেতনভাবে সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া, পুঁজিবাদী সম্পর্ক সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে সীমিত করা।

বর্তমান স্তরে এই দায়িত্ব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপর বর্তায় এবং এই শক্তিগুলির প্রতি সমীক্ষাধীন পুস্তকগুলির রচয়িতারা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন।

ব্রুটেন্টস লিখেছেন (এই সমস্যার উপর বিশেষ একটি অধ্যায়ে), "বিপ্লবী গণতন্ত্র হল কৃষক জনতার রাজনৈতিকভাবে জাগ্রত স্তর, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শহরের পেটিবুর্জোয়া ও আমূল

---

১ যাইহোক, জোর দেওয়া হয়েছে যে প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিগুলির হাতে ক্ষমতা থাকলে, জাতীয় মুক্তি বিপ্লব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হিসাবে বিকাশ লাভ করতে পারে এবং সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর বিবর্তন ঘটতে পারে, যেমন হয়েছিল ভিয়েতনামে ও কোরিয়াতে। প্রখ্যাত সোভিয়েত পণ্ডিত আর. এ. উলিয়ানোভস্কি লিখেছেন: "অ-ধনতান্ত্রিক পথ বাধ্যতামূলক নয়, এটা হল সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রয়োজনীয় অনেক সম্ভাব্য ও পরীক্ষিত পথের মধ্যে একটি পথ…।" (আর. এ. উলিয়ানোভস্কি Sotsializm i osvobodwshiyesya strany সমাজতন্ত্র ও নব্য স্বাধীন দেশসমূহ ; নৌকা, মস্কো, ১৯৭২)।

সংস্কারপন্থী জাতীয় বুদ্ধিজীবী।" তিনি বলেন যে, এদের প্রতিশ্রুতি বিপ্লব গণতান্ত্রিক পার্টি, সংগঠন ও দলগুলির মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ঘটনার গতিই বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের সেই সব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে যা পেটিবুর্জোয়া সম্পর্কের সীমানা ছাড়িয়ে সমাজতন্ত্র অভিমুখে যাত্রা করে। তাদের মধ্যে অধিকতর প্রগতিশীল অংশ এই সমাজতন্ত্রমুখিনতাকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ জাতীয় মুক্তির ভিত্তি বলে মনে করে। ব্রুটেন্টস এরকম গুরুত্বপূর্ণ উক্তিও করেছেন: জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কৃষক, আধা-প্রলেতারীয় ও পেটিবুর্জোয়া জনতাকে, এমনকি প্রলেতারিয়েতের যে সব অংশ এখনও শ্রেণীচেতনা অর্জন করে নি সেই সব অংশকেও পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব এবং বুদ্ধিজীবীদের দৃঢ় দেশপ্রেমিক অংশকেও সমাজতন্ত্রমুখিনতার দিকে জয় করে আনা যায়" (বড় হরফ আমার—ভি. আর)।

কিন্তু অভ্যন্তরীণ ও বাইরের শ্রেণীশক্তিগুলি যারা বিপ্লবকে এর বুর্জোয়া বা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চৌহদ্দির মধ্যে ধরে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের সাথে সংগ্রামে এই প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করে।

বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সাথে শাসক বিপ্লব গণতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ মৈত্রী, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর সাথে এর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সৌহার্দ্য হল এই গ্যারান্টি যে পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রবণতা ও সমাজতন্ত্রমুখিনতা হারিয়ে যাবে না। অবশ্য এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে সমস্ত বৈদেশিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে পুনর্গঠিত হবে। বেলিয়ায়েভ ও প্রাইমাকভ এটা প্রমাণ করার জন্য দৃষ্টান্ত দেন যে "পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার অঙ্গ হয়েও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে ব্যাপক ও বহু ধরনের সহযোগিতার ফলে সমাজতন্ত্রমুখিন দেশগুলি তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে ও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়।" এটাই কার্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে তাদের বেরিয়ে আসার ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত করে।

সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি, বিশেষ করে তাদের প্রভাব বাড়ার ফলে এবং শাসক বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টিগুলির সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে এই সব প্রক্রিয়ায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য।[১]

১ ব্রুটেন্টস বিস্তারিতভাবে এই ধরনের সহযোগিতার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ডব্লিউ. এম. আর. কর্তৃক সংগঠিত আন্তর্জাতিক তাত্ত্বিক সম্মেলনে তার প্রদত্ত প্রবন্ধও দেখুন। বেলিয়ায়েভ ও প্রাইমাকভও এই সমস্যা আলোচনা করেছেন।

এই সব সোভিয়েত বইতে এই রকম কয়েকটি সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে, তাঁরা যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করেছেন সেই সব প্রশ্নের অনেকগুলি সম্পর্কে পত্রিকার একটি সমীক্ষায় আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেমন মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি ও বিশ্ব সমাজতন্ত্রের মধ্যে সহযোগিতার ভূমিকা ও রূপ, নয়া-উপনিবেশবাদ, বিভিন্ন মতাদর্শগত ধারণা (জাতীয়তাবাদ ও অ-মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রীরা যে সব তত্ত্ব হাজির করছে সে সব তত্ত্ব), রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলির বিবর্তন, বিশেষ করে, সামরিক শাসনের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। যাই হোক, এই সমীক্ষা হল জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিকাশের সমস্যাগুলির প্রতি সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ইতিহাস

অসিত রায়

প্রযুক্তিবিদ্যা (technology) সমাজের উৎপাদিকা শক্তিকে (productive force) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই অগ্রসর করে। প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বারা উৎপাদন যন্ত্রের (instruments of production) এবং উৎপাদন সামগ্রীর (materials of production) প্রকৃতির ও সংখ্যার এবং উৎপাদন পদ্ধতির সরাসরি পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ হয়। কাজেই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সাথে সাথে উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয় যার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখা দেয় অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের সূচনা হয়। তাই প্রযুক্তিগত বিবর্তন ও বিপ্লব সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে যথাক্রমে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে পরিবর্তিত করে। অন্যদিকে উৎপাদনের পরিমাণ প্রকৃতি ; সামাজিক চাহিদা, জনসংখ্যা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির উপর প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ নির্ভরশীল। মোটের উপর ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল তত্ত্ব অনুযায়ী প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজকে পরিবর্তিত করে আবার উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি ও সামাজিক প্রগতি প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক থাকার ফলেই প্রযুক্তিগত বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্যে বারংবার ঐতিহাসিক যোগাযোগ ঘটেছে।

মানবসমাজে এ যাবৎ অসংখ্য প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ঘটেছে যার একটি অসম্পূর্ণ কিন্তু ধারাবাহিক চিত্র পূর্বের তালিকাগুলিতে দেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তিগত আবিষ্কার মাত্রই তা সে যত নগণ্যই হোক, প্রযুক্তি জগতের মোট আয়তন বা পরিমাণকে এবং তার সামগ্রিক শক্তিকে কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করে। কিন্তু কতকগুলি আবিষ্কারের প্রকৃতি এমনই যা প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যান্য শাখার চেহারাকেও পাল্টে দেয়, উৎপাদন শক্তিকে বিপুলভাবে বিকশিত করে এবং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটা আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন করে দেয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার ইতিহাসের এই ধরনের কয়েকটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার ও পরিবর্তন সম্পর্কে এবং তাদের সামাজিক ফলাফলের বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

চার্লস ডারুইন এবং পরবর্তী কালের জীববিজ্ঞানী ও পুরাজীব তাত্ত্বিকরা (palaeontologists) প্রচুর তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন মানুষের আদি-পুরুষ হল বনমানুষ (apo)। প্রাণীবিদ্যার শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আজকের মানবগোষ্ঠী (Homo Sapiens), আদি মানবের বিভিন্ন প্রজাতি (যথা জাভায় প্রাপ্ত ফসিল Pithecanthropus erectus, ইউরোপে আবিষ্কৃত Homo Neaderthalensis, চীনে প্রাপ্ত Sinanthropus বা পিকিংম্যান) এবং লাঙ্গুলহীন নরসদৃশ বানররা (Anthropoid apes) একই মূল শাখার বিভিন্ন প্রশাখা। অ্যানথ্রপয়েড এপ শাখার জীবগুলি হচ্ছে গিবন, ওরাং ওটাং, গরিলা ও শিম্পাঞ্জী।

আজ থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর ইতিহাসের মায়োসিন যুগে (Miocene period) পুরাতন পৃথিবীর বানরদের মধ্যে ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus) নামে একটি জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের দাঁতের গঠন ছিল অন্যান্য বানরদের তুলনায় আলাদা। এই জীবগুলির ফসিল ভারতের শিবালিক পর্বতমালায় এবং ইউরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ড্রায়োপিথেকাস গোষ্ঠী থেকেই পরবর্তীকালে গরিলা ও শিম্পাঞ্জীর সৃষ্টি হয়েছিল। এখন থেকে ১ কোটি ১০ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্লায়োসিন যুগে (Pliocene period) আফ্রিকায় আর একটি মানবসদৃশ বনমানুষ গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল যার নাম অষ্ট্রেলো পিথেকাস (Australo pithecus)। ১৯২৪ সালে বেচুয়ানাল্যাণ্ডের কালাহারি মরুভূমিতে প্রথম এই জাতীয় জীবের ফসিল পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে আরও ফসিল আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে অষ্ট্রেলো পিথেকাসরা ছিল আদিমানব ও বনমানুষদের মাঝামাঝি—প্রায় সমদূরবর্তী। এদের মস্তিষ্কের আয়তন (cranial capacity) ৫০০-৬০০ ঘন সেন্টিমিটার (শিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের আয়তন ৩০০-৫০০ ঘন সেন্টিমিটার, জাভায় প্রাপ্ত আদিমানবের ৯০০ ঘন সেন্টিমিটার এবং আধুনিক মানুষের ১৫০০-২০০০ ঘন সেন্টিমিটার)। অষ্ট্রেলো পিথেকাসরা কিন্তু দু'পায়ে হাঁটত, জন্তু শিকার করে মাংস খেত এবং সেদিক থেকে তারা শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি উদ্ভিদভোজীদের তুলনায় পৃথক ছিল। এই গোষ্ঠী পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আদি মানব বা Homo গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয় সম্ভবত ৬ বা ৭ লক্ষ বৎসর পূর্বে—প্লাইস্টোসিন যুগের (pleistocene period) মাঝামাঝি সময়ে। এই যুগের মধ্যভাগে সমগ্র উত্তর গোলার্ধ তুষারে ছেয়ে গিয়েছিল। এশিয়ায় ও উত্তর আমেরিকায় প্রায় ৮০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে কয়েক শত মিটার পুরু তুষার স্তর জমে উঠেছিল। এই হিমযুগের (glacial period) আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে এখনও গবেষণা চলেছে। সমগ্র প্লাইস্টোসিন যুগে (ব্যাপ্তি ৯ লক্ষ ৯০ হাজার বৎসর) চারবার হিমযুগ এসেছিল। সুইস আল্পস অঞ্চলের গবেষকরা এদের নামকরণ করেছেন (Günz, Mindel, Riss এবং Würm। প্রত্যেকটি হিমযুগের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২৫ হাজার বৎসর। এই চারটি হিমযুগের অন্তবর্তীকালে এসেছিল তিনটি অন্তর্হিমযুগ (interglacial period)। প্রথম ইন্টারগ্লেসিয়াল যুগের দৈর্ঘ্য ছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার বৎসর, দ্বিতীয়টির ২ লক্ষ বৎসর এবং তৃতীয়টির ১ লক্ষ বৎসর। (M. Nesturkh, The Origin of Man. Foreign Language Publishing House, Moscow, p. 242). প্রথম হিমযুগ বা Günz-এর শুরু হন প্লাইস্টোসিন যুগ আরম্ভ হবার ৪ লক্ষ বৎসর পরে। কিন্তু প্রথম হিমযুগের পূর্বে গঠিত শিলাস্তরেই আদি মানব কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরের টুকরো ও অস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

মানবজাতির যে প্রাচীনতম পূর্বপুরুষরা সম্ভবতঃ প্রথম হিমযুগের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিল সেই আদি মানবগোষ্ঠীর নাম পিথেক্যানথ্রপাস্। জাভায় এদের ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এরা এসেছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের শুরুতেই অর্থাৎ আদি প্রস্তর যুগের শুরুর সময়। দ্বিতীয় হিমযুগের পর এরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পিথেক্যানথ্রপাসরা কতকটা সোজা হয়ে হাঁটত—যদিও মুখের গঠন ছিল বনমানুষের মত। এদের জীবনধারণের উপায় ছিল ফলমূল সংগ্রহ, এবং পাথর নিক্ষেপ করে জন্তু শিকার। এরা আকারে প্রকারে যতই বনমানুষের কাছাকাছি হোক পাথরের অস্ত্র ও হাতিয়ার (tools) উৎপাদন এবং তার সাহায্যে শিকার কোন বনমানুষের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। সুতরাং পাথরের অস্ত্র ব্যবহারই মানব ইতিহাসের প্রথম প্রযুক্তিগত আবিষ্কার—যার ফলে উৎপাদন শুরু হল এবং মানুষের ব্যবহারিক জীবনযাত্রা জীবজগতের অন্যান্য সমস্ত জীব থেকে ভিন্ন হয়ে গেল। পাথরের অস্ত্র তৈয়ারী ও শিকার এবং এই দুই কাজের জন্য বিশেষ ধরনের শ্রমের ফলে আদি মানবের দৈহিক গঠন,

শারীরিক বৈশিষ্ট্য, স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের উন্নতি শুরু হয়। তবে সম্ভবত পিথেক্যানথ্রপাসরা আগুনের ব্যবহার জানত না, কাঁচা মাংস ও ফলমূল খেত। জীববিজ্ঞানীরা এদের মাথার খুলির প্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে স্থির করেছেন যে আদি মানবদের অধিকাংশই ছিল left hander বা ন্যাটা।

Güinz-Mindel অন্তর্হিমযুগীয় কালে পিথেক্যানথ্রপাসদের উত্তর-পুরুষদের সমসাময়িক যে মানবগোষ্ঠী দেখা দিল তাদের বলা হয় পিকিংম্যান। ১৯২৭ সালে পিকিং-এর ৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে চৌকৌতিয়েন গ্রামের নিকটবর্তী পাহাড়ের কতকগুলি গুহায় এদের ফসিল পাওয়া যায়। পিকিং-ম্যানরা আগুনের ব্যবহার জানত। এদের গুহায় ছাই, কাঠকয়লা, আধপোড়া ডালপালা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। গুহার কয়েক মিটার পুরু ছাই-এর স্তরে পাথরের টুকরো এবং হাড় দেখা গেছে। আগুনের ব্যবহার আদি প্রস্তর যুগের দ্বিতীয় প্রযুক্তিগত বিপ্লব। আগুনের ব্যবহার শেখার ফলে এরা মাংস পুড়িয়ে খেত। তবে পিকিংম্যানরা কাঁচা মাংসও খেত। এরা ছিল অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির এবং নরখাদক। খাদ্যের অভাব ঘটলে বৃদ্ধ ও শিশু এবং দুর্বলদের হত্যা করাটা এদের অভ্যাস ছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখলো কেমন করে? এ সম্পর্কে সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। পিকিংম্যানরা পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাত। কিন্তু অন্য উপায়েও যথা আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত জ্বলন্ত লাভাস্রোত থেকে ডালপালা জ্বালিয়ে নিয়ে আসা এবং বনে আগুন লাগলে সেখান থেকে আগুন সংগ্রহ করা ইত্যাদি উপায়েও আদি মানব আগুন সংগ্রহ করত। অরণ্যদাহের (forest fire) ফলে পোড়া বা আধপোড়া জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করার অভিজ্ঞতা থেকেই সম্ভবতঃ তারা রোষ্টকরা মাংসের স্বাদ টের পেয়েছিল। পিকিংম্যানরা দলবদ্ধভাবে গুহায় বাস করত, দলবদ্ধ-ভাবে শিকার করত। তারা পাথরের অস্ত্র তৈরী করত আবার হাড় দিয়ে যন্ত্রপাতিও তৈরী করত।

আদি প্রস্তর যুগের মধ্যস্তরে অর্থাৎ তৃতীয় বা Riss হিমযুগে নিয়ানডারথ্যাল মানবগোষ্ঠী দেখা দিল। এরা আরও ভালভাবে আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। ঐ প্রচণ্ড শীতের যুগে গুহাবাসী মানবের কাছে আগুন অপরিহার্য ছিল। তাছাড়া রাত্রের অন্ধকারে গুহার প্রবেশ পথে বা মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে রাখলে তখনকার মানুষের ভয়ানক শত্রু জীবজন্তুরা অর্থাৎ লোমশ হস্তী (woolly

mammoth), গণ্ডার, বিরাট দাঁতালো আদি বাঘ (Smilodon), নেকড়ে প্রভৃতি গুহায় প্রবেশ করতে পারত না। নিয়ানডারথ্যালরা জন্তু মেরে পাথরের হাতিয়ারের সাহায্যে চামড়া ছাড়াত। সেই চামড়া শীত নিবারণের পোষাক। এরা হাড়ের মজ্জা বার করে খাবার জন্য হাড়ের চুঁচ তৈরী করত এবং মাথার খুলি ভেঙে মস্তিষ্ক খেত। অবশ্য কাঁচা এবং রোষ্ট করা দুরকম মাংস খাওয়ার অভ্যাস ছিল। নিয়ানডারথ্যাল গোষ্ঠীর মধ্যেই প্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রমবিভাগ শুরু হয়। তার কারণ দলবদ্ধভাবে শিকার, পাথরের ও হাড়ের নানারকম অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরী, আগুনকে রক্ষা করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজের উৎপত্তি হয়েছিল। আগুনের আলোয় রাত্রে কাজ করা এবং স্ফূর্তি করাও সম্ভব হয়েছিল। নারী ও পুরুষের মধ্যে শ্রম বিভাগের সূত্রপাতের কারণও শিকার এবং গুহার অভ্যন্তরীণ কাজকর্মের মধ্যে বৈষম্য। দীর্ঘ দূরত্ব ধরে হাতি, বাইসন ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর পিছন পিছন তাড়া করে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষরাই বেশী উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল।

চতুর্থ বা Würm হিমযুগের প্রারম্ভকাল থেকে নূতন এক মানবগোষ্ঠী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এদের নাম ক্রোম্যাগ্‌নন (Cromagnon)। এরা আদি প্রস্তর যুগের তৃতীয় স্তরের মানুষ। এরাও ছিল প্রধানতঃ গুহাবাসী এবং শিকারী। কারণ আবহাওয়া তখনও অতি শীতল, গুহাবাস ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু চতুর্থ হিমযুগের পর যখন আবহাওয়া ক্রমশঃ উষ্ণ হয়ে উঠল তখন এরা খোলা জায়গায় বসবাস শুরু করল। ক্রোম্যাগ্‌ননরা বিভিন্ন ধরনের জীব-জন্তু শিকার করলেও ঘোড়া শিকার করেছে সবচেয়ে বেশী। ফ্রান্সের এক স্থানে ক্রোমাগ্‌ননদের বাসস্থানের কাছে প্রায় ১ লক্ষ ঘোড়ার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। এই মানবগোষ্ঠীই প্রথম পশুপালন শুরু করেছিল এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে শিকারের সন্ধানে দূর-দূরান্তে ভ্রমন করত। এদের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত আবিষ্কার—জাল দিয়ে মাছ ধরা। পশু-পালন যখন শুরু হয় তখন প্রথমেই পোষ মেনেছিল বন্য কুকুর। এরা ভুক্তাবশিষ্টের লোভে ক্রোম্যাগ্‌ননদের গুহার ধারে-কাছেই বাস করত। শিকারের ব্যাপারেও এদের উপযোগিতা ছিল খুব বেশী। তারপর ক্রমশঃ ঘোড়া, শুয়োর, গরু ও ভেড়া পালন শুরু হল। ক্রোম্যাগ্‌নন মানুষের সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটেছে গুহা চিত্রে। ফ্রান্স, স্পেন ও মধ্য এশিয়ায় এইসব

চিত্রে শিকার, অস্ত্র এবং নাচের দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। ক্রোম্যাগ্‌ননদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পূর্ববর্তী যুগের মানুষরা ২৫-৩০ বছরের বেশী বাঁচত না কিন্তু ক্রোম্যাগ্‌ননদের পরমায়ুও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন ক্রোম্যাগ্‌ননদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গুহার অধিকার নিয়ে লড়াই হত। এছাড়া শ্রমবিভাগও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল এবং বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অনুযায়ী পেশার উৎপত্তি হল। কিন্তু তখনও শ্রেণীহীন আদি সাম্যবাদী ব্যবস্থা অটুট ছিল।

আদি প্রস্তরযুগের অবসানকালে মানুষ ক্রমশঃ চাষ করতে শিখলো। কৃষি-কার্যের আবিষ্কার মানব ইতিহাসের তৃতীয় প্রযুক্তিগত বিপ্লব। এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নব্য প্রস্তরযুগের সূচনা হয়। কৃষিকার্যের ফলে চাল, গম, ও নানা ধরনের খাদ্যশস্যের উৎপাদন শুরু হয়, রন্ধন শিল্পের উদ্ভব হয়। তুলোর চাষ এবং কাপড় বোনা আরম্ভ হল। কাঠের ও বাঁশের কাজ, কুটির নির্মাণ এবং গ্রামের পত্তন পর পর সম্ভব হল। কৃষির জন্য প্রয়োজন চাষের স্থায়ী জমি, স্থায়ীভাবে বসবাস এবং উন্নততর শ্রম-বিভাগ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করা সম্ভব। কাজেই জমির মালিকানা এবং উদ্বৃত্ত খাদ্যের মালিকানা নিয়ে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই চলতে লাগল। একদিকে উন্নততর শ্রমবিভাগ, অন্যদিকে সম্পত্তির মালিকানার ফলে সমাজের শ্রেণীবিভাগের সূচনা হল। অর্থাৎ, দাসতন্ত্রের পূর্বসর্ত সৃষ্টি করল কৃষিকার্য।

মানব ইতিহাসের চতুর্থ প্রযুক্তিগত বিপ্লব হচ্ছে ধাতু নিষ্কাশন। আদিম পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন করতে হলেও কতকগুলি কাজ জানা অপরিহার্য। যে কোন ধাতু নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজন হয় ঐ ধাতুর আকর (ore) বা খনিজ (mineral) সংগ্রহ, জ্বালানি সংগ্রহ, মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং দিনের পর দিন একই কাজ করার অভ্যাস ও ধৈর্য। শিকারী মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না। কারণ তারা দীর্ঘদিন কোথাও স্থায়ীভাবে বাস করত না। কিন্তু শিকারী মানুষ যখন শিকারের সন্ধানে বহু দেশ ঘুরে বেড়াত তখন নানারকম পাথর, খনিজ, খনি ও আকর তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কাজেই আকরের সন্ধান তারাই প্রথম পেয়েছিল। তাছাড়া অস্ত্র নির্মাণ, হাতিয়ার নির্মাণ এবং অলংকারের প্রয়োজনে তারা নানা ধরনের, ও নানা রংয়ের পাথর সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু নব্য প্রস্তরযুগে যখন স্থায়ী বসতি গড়ে উঠল একমাত্র তখনই ধাতু নিষ্কাশনের উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হল। ধাতু নিষ্কাশন পদ্ধতি চালু

হবার সঙ্গে সঙ্গে মধ্য প্রস্তরযুগের অবসানকাল ঘনিয়ে এল এবং সূচনা হল ব্রোঞ্জযুগের। ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা, টিন, দস্তা প্রভৃতি ধাতুর একটা সংমিশ্রণ। এটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না—কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে হয়। ব্রোঞ্জ তৈরী করতে গিয়ে মানুষ একই সাথে ধাতুবিদ্যা, ব্যবহারিক রসায়ন, উত্তাপ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আয়ত্ত করে। ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরী হল অস্ত্র-শস্ত্র, যা পাথরের অস্ত্রের তুলনায় অনেক মজবুত, গড়ে উঠল মন্দির, দেব-দেবীর ধাতু মূর্তি ও রথের চাকা। তার ফলে একদিকে শ্রমবিভাগ অনেক উন্নত পর্যায়ে উঠল অন্যদিকে নানা ধরনের মূল্যবান ও স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টি হল। নব্য প্রস্তরযুগে যে শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল ব্রোঞ্জযুগে তা দাসত্বরূপে দেখা দিল। দাসদের বাঁচিয়ে রাখার উপকরণ ছিল অতি সামান্য। প্রয়োজন না থাকলে তাদেহ হত্যা করাও সম্ভব ছিল। কাজেই দাসতন্ত্র সমাজে বিপুল পরিমাণ সস্তা শ্রমের সৃষ্টি করেছিল। এই দাসদের শ্রম, ঘাম ও রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি হল বড় বড় খনি, নগর, জনপদ, অট্টালিকা এবং মানবসভ্যতা।

ব্রোঞ্জযুগের মানুষ যে ধাতুবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল শীঘ্রই তার দ্রুত উন্নতি ঘটতে লাগল। মানুষ সংগ্রহ করেছিল লোহার আকর। কাঠকয়লার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার এবং বাতাস দিয়ে চুল্লীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার পদ্ধতিও তারা আয়ত্ত করেছিল। ব্রোঞ্জযুগের পর শুরু হল লৌহযুগ। ব্রোঞ্জের জন্য তামার আকর প্রয়োজন। এটা প্রকৃতিতে অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু লোহার আকর অনেক সহজলভ্য। তাই লৌহ সহজেই ব্রোঞ্জের স্থান দখল করতে পেরেছিল। আধুনিক সভ্যতার প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক উৎ-পাদনের শতকরা ৯০ ভাগই লোহার উপর নির্ভরশীল। কাজেই লৌহযুগ আজও চলেছে। যতদিন না পৃথিবীর সমস্ত লোহার আকর নিঃশেষিত হচ্ছে অথবা মানুষ অল্প খরচে অল্প আয়াসে ইস্পাতের চেয়েও কঠিনতর এবং উন্নততর কোন কৃত্রিম বস্তু (কতকগুলি এ ধরনের প্লাস্টিক ইতিমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে) ব্যবহার করতে পারছে ততদিন লৌহযুগ চলবে। কিন্তু আমরা আলোচনা করছি আদি লৌহযুগ সম্পর্কে এবং সেই অর্থেই 'লৌহযুগ' কথাটির ব্যবহার করা হয়। লৌহযুগে খনিজবিদ্যা দ্রুত বিকাশলাভ করল। নানা ধরনের লোহার যন্ত্রপাতি যেমন চাষের জন্য কাস্তে, কোদাল, গাছকাটার কুড়ুল, শিল্পের জন্য হাতুড়ি, ঘরবাড়ী বানাবার জন্য শিক, পেরেক প্রভৃতি তৈরী হতে লাগল। একইসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তীরের ফলা, তলোয়ার, বল্লম প্রভৃতি

উন্নত যন্ত্র। তার ফলে প্রত্যেকটি যুদ্ধের প্রকৃতি হল আরও বীভৎস ও রক্তাক্ত এবং দাসশ্রেণীর উপর দাস মালিকদের আধিপত্য আরও নিরংকুশ, নির্দয় ও ভয়াবহ আকার ধারণ করল। আবার লৌহের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগ দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হল।

প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, হিন্দু ও চৈনিক যুগে মানবসমাজের জ্ঞানবিজ্ঞান ও দর্শনের প্রযুক্তিগত ভিত্তি লোহার ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি দাসতন্ত্র। এ যুগে নানা প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের মধ্যে জাহাজ নির্মাণ একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ ক্যানো বা ডিঙি তৈরী করতে শিখেছিল কিন্তু লোহার ব্যবহার চালু হওয়ায় সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ সম্ভব হল। জাহাজ নির্মাণ ভৌগলিক জ্ঞানের দ্বারোদ্ঘাটন করল, মানুষ সমুদ্রযাত্রা শুরু করল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পেল। আবার শোষণ, যুদ্ধ ও ধ্বংসের পরিধি বিস্তৃত হল। কিন্তু দাসতন্ত্রের ভিত্তিতে যে প্রাচীন সভ্যতার উন্নতি ঘটছিল তার মধ্যে সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। বারংবার দাসবিদ্রোহ ও অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই অন্তর্বিরোধের প্রকাশ ঘটেছে। দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ, দর্শন ও ধর্ম বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে। দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবমুক্তির ঐতিহাসিক আহ্বান নিয়ে রোমের স্পার্টাকাস বিদ্রোহ। ভারতের বুদ্ধ এবং ইস্রায়েলের মোজেস ও ও যিশুখৃষ্টের আবির্ভাব একই আহ্বানের অভিব্যক্তি। দাসতন্ত্রের বিরুদ্ধে নবাগত ধর্ম ও দর্শন এবং ব্যাপক গণবিদ্রোহের মিলিত শক্তি এক নতুন সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল।

ইতিহাসে সভ্যতার কেন্দ্র বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দীপশিখাকে বহন করে সময়ের ঘোড়া ছুটেছে ব্যাবিলন থেকে গ্রীসে, গ্রীস থেকে রোমে, কখনও চীনে, কখনও ভারতে, কখনও ফিরে এসেছে এক আদি সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে, কখনও ছুটে গেছে কোন অজ্ঞাত অনাগত ভবিষ্যতের দেশে। এই ঘোড়াকে যারা যখন ধরতে পেরেছে তারা তখন জ্ঞান-গরিমার শীর্ষে উঠেছে আবার সেই ঘোড়া পালিয়ে গেছে—এক ধ্বংসস্তূপকে পিছনে ফেলে। পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতার যে রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল ৫০০ থেকে ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তার ধ্বংস হয়ে গেল পুরাতন দাসতন্ত্রের পতন শুরু হল এবং তার স্থান দখল করতে গড়ে উঠল নতুন শোষণ-

ব্যবস্থা—সামন্ততন্ত্র। পুরাতন সামাজিক কাঠামোর এই পরিবর্তন অশান্তি, যুদ্ধ ও বর্বরতায় আকীর্ণ। ৫০০ খৃষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান এথেন্সের প্রাচীন আকাডেমি বন্ধ করে দিলেন। তারপর অতি দ্রুত ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, যুদ্ধ ও হানাহানির মধ্যে ইউরোপে সভ্যতার দীপ নির্বাপিত হল। ইউরোপে তখন শুরু হল অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইউরোপ থেকে নির্বাসিত হল।

ইউরোপে যখন অন্ধকার যুগের শুরু ঠিক তখনই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোক জ্বলে উঠেছে প্রাচ্যে। মধ্যযুগের সূচনাকালেই চীনে আবিষ্কৃত হল মুদ্রণ (Block printing) পদ্ধতি, তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বারুদ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে ছাপাখানা। প্রায় একই সময়ে ভারতবর্ষ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, বীজগণিত ও জ্যামিতির ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহন করল। হিন্দুরা যে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত রাশিমালা এবং শূন্য (০) রাশির আবিষ্কার করলেন তার ফলে গণিতের দ্বারা অসীম ও অনন্ত জগৎকে এবং বস্তুজগতের ঘটনাকে সংখ্যা দ্বারা বা পরিমাণগতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল এবং উত্তরকালের বিজ্ঞান-চর্চার গাণিতিক ভিত্তি গড়ে উঠল। আরবরা হিন্দু গণিত ও বিজ্ঞানের অনুবাদ করে তাকে বহন করে নিয়ে গেলেন ইউরোপে যার ফলে ইউরোপে পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের নবজাগরণ সম্ভব হয়েছিল। সমগ্র মধ্যযুগ—দাসতন্ত্র থেকে সামন্ততন্ত্রে পরিবর্তনের যুগ। এই সুদীর্ঘ প্রায় হাজার বছরে ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নি। কিন্তু চীনে মুদ্রণের আবিষ্কার এমন এক বিপ্লব যা জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে সর্বজনীন করার পথ খুলে দিয়েছে এবং অপরদিকে বারুদের আবিষ্কার যুদ্ধ ও হত্যাকেও সহজতর করেছে। মধ্যযুগে অন্ধতা ও গোঁড়ামির পাশাপাশি বিজ্ঞান ও দর্শনের অদ্ভুত স্ফুরণ ঘটেছে।

পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে রেনেসাঁ যুগের আরম্ভ। এই সময় থেকে একদিকে সামন্ততন্ত্রের প্রসার অন্যদিকে সওদাগরি পুঁজির উত্থান শুরু হয়। রেনেসাঁ যুগের প্রযুক্তিগত প্রধান কীর্তি সমুদ্রপাড়ি, মানচিত্র আবিষ্কার, কম্পাস আবিষ্কার, এবং অ্যালকেমি থেকে রসায়নে উত্তরণ। কলম্বাস, ভাস্কো ডা গামা, ম্যাগেলান প্রভৃতি বেপরোয়া নাবিকরা এ যুগের প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পথিকৃৎ। সমুদ্রপাড়ির প্রয়োজনে সৃষ্টি হল মানচিত্র, কম্পাস, নক্ষত্রের গতি-পথ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান, উন্নত ধরনের জাহাজ, দিকজ্ঞ, ঝোলর, ওয়াপ্পে

ইত্যাদি। প্রযুক্তিগত বিপ্লব এই জিনিষগুলির চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের গবেষণার জন্য নতুন নতুন পথ খুলে দিল। এই পথগুলি ধরেই যাত্রা শুরু করলেন কোপার্নিকাস, টাইকোব্রাহে, গ্যালিলিও, কেপলার প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ, আধুনিক ভূতত্ত্বের জনক এগ্রিকোলা এবং কিছু কিছু অ্যালকেমিষ্ট। তখনও বিজ্ঞান ও দর্শন দুই পৃথক শাখায় বিভক্তি হয় নি। তাই বিজ্ঞানের ও দর্শনের বিকাশ একই সাথে ঘটল। দর্শনের ক্ষেত্রে 'মানবতাবাদ' এই নবজাগরণের প্রকাশ। সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁ যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমশঃ একটা আন্তর্জাতিক রূপ নিতে শুরু করেছিল। ইতালীতে বিজ্ঞান আকাদেমী, ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল সোসাইটি, ফ্রান্সে বিজ্ঞান আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত হল এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও প্রকাশিত হল। সমগ্র তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের জগৎকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি সুনির্দিষ্ট যান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করলেন আইস্যাক নিউটন। তার ফলে আসন্ন শিল্প-বিপ্লবের জন্য অপরিহার্য বৈজ্ঞানিক ধারনার আবিষ্কার হয়ে গেল। নিউটন প্রবর্তিত এই যান্ত্রিক ভিত্তি কেবলমাত্র বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ রইল না—এটা প্রসারিত হল দর্শনে। দর্শনে গড়ে উঠল রেনে ডেকার্টের দ্বৈতবাদ, স্পিনোজার যান্ত্রিক বস্তুবাদ এবং তারই চরম বিকাশের ফলে উনিশ শতকে সৃষ্টি হয়েছিল ফয়ারবাখের যান্ত্রিক বস্তুবাদ।

শিল্প-বিপ্লবযুগের প্রযুক্তিগত আবিষ্কারের তালিকা অতি দীর্ঘ। প্রথমতঃ কয়লার আবিষ্কার ও কোক কয়লার ব্যবহার, দ্বিতীয়তঃ বাষ্প শক্তির সাহায্যে নিউটনের বলবিদ্যাকে যন্ত্র নির্মাণের কাজে প্রয়োগ এবং তৃতীয়তঃ পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎ শক্তিকে যন্ত্রশিল্পে ব্যবহার এই তিনটি প্রযুক্তিগত সাফল্যের দ্বারা এ যুগের বিপ্লব সংঘটিত হল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সৃষ্টি হল বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বৃহৎ বৃহৎ কারখানা, রেলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজ। শিল্পোৎপাদন দ্রুত উন্নত হল। ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের দূরপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল এবং পণ্য বোঝাই জাহাজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বাজার গড়ে তুলল। পেট্রোলিয়াম ও বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার উৎপাদন, পরিবহণ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সম্প্রসারিত ও উন্নত রূপ দিল। তারপর একে একে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, মোটর গাড়ী ও বিমানের আবিষ্কার আধুনিক সভ্য জগৎকে গড়ে তুলছে।

শিল্প-বিপ্লবের যুগ সামন্ততন্ত্রের ধ্বংস ও পুঁজিবাদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখলের

যুগ। কিন্তু পুঁজিবাদের বিরোধ অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও বিপ্লবী চেতনাও শক্তিশালী হয়েছে একই সময়ে। তাই উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটেছে জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে। শিল্প-বিপ্লব জন্ম দিয়েছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর তার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ ও বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন করেছে। এই বিপ্লবী চেতনা এবং সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের সমন্বয়ে সৃষ্টি হল মার্কসবাদ—যার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস এবং তাঁর সহযোগী ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস। ১৮৭১ সালের প্যারি কমিউন পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ইতিহাসের অনিবার্য্য অগ্রগতির নির্দেশ দিয়েছিল।

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে প্রযুক্তিগত বিপ্লব এবং তার সামাজিক ফলাফলের যে বিবরণ হল তাকে সংক্ষিপ্ত আকারে তালিকাবদ্ধ করে দেখানো যেতে পারে। তালিকাটি পরের পাতায় দেওয়া হল।

তালিকায় বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে যে পারমাণবিক যুগ শুরু হয়েছে এবং বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। এ বিষয়ে পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার চেষ্টা করবো।

সর্বশেষে আর একটি ব্যাপার সম্পর্কে একটু বলা দরকার। ব্যাপারটি খুব সুস্পষ্ট। এটি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সাথে প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার স্থায়িত্বকাল হ্রাস পেয়েছে।

আদি প্রস্তরযুগ এবং নব্য প্রস্তরযুগের প্রথমার্ধ অর্থাৎ আদি সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার মোট স্থায়িত্ব কাল প্রায় ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর। তারপর ধীরে ধীরে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উৎপত্তি হয়। নব্য প্রস্তরযুগের শেষভাগ থেকে প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের সমাপ্তিকাল অর্থাৎ দাসতন্ত্রের বিকাশের যুগের স্থায়িত্বকাল প্রায় ৬ হাজার বৎসর। মধ্যযুগের শুরু থেকে রেনেসাঁ যুগের শেষ পর্যন্ত সামন্ততন্ত্র বিকাশের যুগ গণ্য করলে তার স্থায়িত্বকাল হয় ১২ শত বৎসর অর্থাৎ দাসযুগের বিকাশ কালের এক পঞ্চমাংশ। শিল্প-বিপ্লব-যুগের সূচনা থেকে ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিপ্লব পর্যন্ত আধুনিক পুঁজিবাদের বিকাশ-যুগ ধরলে তার স্থায়িত্ব কাল হয় ২৬৭ বৎসর অর্থাৎ সামন্তযুগের বিকাশ-কালের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। তারপর ১৯১৭ থেকে ১৯৭৪ এই ৫৭ বৎসরে পৃথিবীর স্থলভাগের ২৬ শতাংশ অঞ্চল এবং বর্তমান দুনিয়ার মোট জনসংখ্যার

যুগ	প্রযুক্তিগত বিপ্লব	ফলাফল
আদি প্রস্তর।	পাথরের অস্ত্র ব্যবহার।	বনমানুষ থেকে আদি মানুষের পৃথকীভবন। শিকারী জীবনের সূচনা।
	আগুনের আবিষ্কার।	সামাজিক উৎপাদন ও সংস্কৃতির প্রাথমিক ভিত্তি গঠন।
নব্য প্রস্তর।	কৃষিকার্য।	গ্রামীণ সভ্যতার উৎপত্তি। শ্রেণী-বিভাগের সূচনা।
ব্রোঞ্জ।	ধাতু নিষ্কাশন।	নগর সভ্যতার আরম্ভ। দাসতন্ত্রের সৃষ্টি।
আদি লৌহ।	লোহার ব্যবহার।	সভ্যতার উন্নতি। দাসতন্ত্রের প্রসার। উন্নত মারণাস্ত্র ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।
প্রাচীন ঐতিহাসিক।	জাহাজ নির্মাণ।	ভৌগলিক জ্ঞান ও বাণিজ্যের বিকাশ। দাসতন্ত্রের চরম বিকাশ ও প্রসার। দাস বিদ্রোহ। যুদ্ধ।
মধ্য	মুদ্রণ।	জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক চরিত্র গড়ে ওঠার পূর্বসর্তের উৎপত্তি।
	বারুদ।	যুদ্ধের নতুন পদ্ধতি। সামন্ততন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়।
রেনেসাঁ	কম্পাস মানচিত্র রসায়ন	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সওদাগরী পুঁজির জন্ম।
শিল্প বিপ্লব	কয়লা ও কোক শক্তি, ইঞ্জিন পেট্রোলিয়াম, বিদ্যুৎশক্তি।	বাষ্প- ব্যাপক যন্ত্রশিল্প। সামন্ততন্ত্রের পতন। পুঁজিবাদের ক্ষমতা লাভ। শ্রমিক বিপ্লব শুরু।

৩৫ শতাংশ বুর্জোয়া শাসনমুক্ত হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। তারা ইতিমধ্যেই পুরাতন উপনিবেশগুলির প্রায় সবই হারিয়েছে। ১৯১৭ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বাস করত উপনিবেশ বা আধা উপনিবেশে আর ১৯৭৪-এ বাস করে শতকরা ১ ভাগ। (Leninism and the world revolutionary working class movement, Progess Publishers, Moscow, First printing 1971, p. 40)

কাজেই কেবলমাত্র ইতিহাসের ব্যাখ্যা থেকেই নয় এমনকি পরিমাণগত ভাবেও (quantitatively) আজ এটা সুস্পষ্ট যে বর্তমান যুগ পুঁজিবাদের ধ্বংসের ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের যুগ। অনেকে প্রশ্ন করেন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি হতে কতদিন লাগবে তার কোন হিসাব করা যায় কি? পূর্বে এটা পরিমাপ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আজ সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বোধ হয় একথা বলা যায় যে আগামী অল্প কয়েক দশকের মধ্যেই বিশ্ব পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটবে। তবে এই সময়টা দীর্ঘতর হবে না আরও সংক্ষিপ্ত হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করছে বিষয়ীগত দিকটির উপর—অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম, নেতৃত্বের নির্ভুলতা, আদর্শগত এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতির উপর।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সামাজিক ভিত্তিভূমির সম্প্রসারণ

এ. কোভালেভ

বর্তমান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রধান বাহিনীগুলি হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন। এরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং সবকয়টি মিলেই হল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সত্তা। এই সত্তাটি সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে বিরোধেরই এক স্বাভাবিক পরিণাম।

কিছু কিছু বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানী এবং সংশোধনবাদীরা বিশ্বাস করে যে আজকের পরিস্থিতিতে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধ গুরুত্ব হারিয়েছে এবং সে বিরোধের স্থান গ্রহণ করছে মানুষ ও মেশিনের মধ্যের বিরোধ। তাঁদের তত্ত্ব অনুযায়ী, এই বিরোধী মীমাংসায় বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াতে প্রধান ভূমিকা নেয় সমকালীন তরুণ সমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং শ্রেণীচ্যুত লোকজন, এবং কোনক্রমেই শ্রমিকশ্রেণী সে ভূমিকা নেয় না, কারণ তারা নাকি "বুর্জোয়ায়" পরিণত হয়েছে, পুঁজিবাদীব্যবস্থার মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে তারা নাকি সমাজে তাদের বিপ্লবী ভূমিকাকে খুইয়ে ফেলেছে।

মাওবাদী তাত্ত্বিকরাও সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকা, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভূমিকা অস্বীকার করার পথই নিয়েছে। শ্রেণীভিত্তিক নীতিতে তথাকথিত "গরীব" ও "ধনী" দেশ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বকে ভাগ করে মাওপন্থীরা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং সমগ্রভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের বিরুদ্ধেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে স্থাপনের চেষ্টা করছে। সমকালীন সামাজিক বিরোধগুলির চরিত্রকে সচেতনভাবে বিকৃত করে বাম-সংকীর্ণতাবাদী তাত্ত্বিকরা

বলছেন যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পথনির্দেশদানকারী শক্তি হল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই।

এর অর্থ, সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধটি আমাদের কালের প্রধান বিরোধ নয়।

এর আরো অর্থ হল, প্রলেতারিয়েত নয়, কৃষক সমাজই এখনকার মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে এবং তাদেরই তা করতে হবে। অন্যভাবে বললে, বিপ্লবী আন্দোলনে প্রলেতারিয়েতের অধিনায়কত্বের, সমাজের মুক্তি-দাতা হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব ঐতিহাসিক ব্রতের, সমকালীন বিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নেতৃ-ভূমিকার মূল নীতিগুলিকে বিপ্লবের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব থেকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে।

জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে আজকের পরিস্থিতিতে চরিত্রগত-ভাবেই বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সবচেয়ে দৃঢ়নিষ্ঠ শক্তি, বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া বিকাশের নিয়ামক উপাদান।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রবাহিনীর ভূমিকা নিহিত কার মধ্যে?

প্রথমত, সমকালীন সমাজের রূপান্তর ঘটার একেবারে আমূল পরিবর্তনসূচক প্রক্রিয়াটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে অত্যন্ত পূর্ণাকারে গভীরভাবে এবং দৃঢ়নিষ্ঠভাবে যে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার সঙ্গেই এই ভূমিকা সম্পর্কিত।

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের, প্রতিবিপ্লব রপ্তানি বন্ধ করার, এবং সমগ্রভাবে বিশ্ব সমাজ বিকাশের গতিধারার উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সর্বাপেক্ষা বেশি বৈষয়িক সঙ্গতি আছে।

তৃতীয়ত, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক, সমাজতান্ত্রিক মর্মবস্তুর বলে একমাত্র এই ব্যবস্থাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে কার্যকরভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করতে পারে, সদ্য স্বাধীন দেশগুলির অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথে বিকাশ লাভকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার নেতৃশক্তি হল শ্রমিকশ্রেণী। বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামের সমগ্র গতিধারা থেকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃভূমিকার বিষয়গত ও বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলি অবিচলভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রুশিয়ার অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং অন্যান্য অনেক দেশের বিপ্লবই

প্রলেতারিয়েত সহ কোন না কোন শ্রেণীর নেতৃ-ভূমিকাও নির্ধারিত হয় সুনির্দিষ্ট শ্রেণী-সম্পর্ক দ্বারা এবং নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ীগত পূর্বশর্তের অস্তিত্বের দ্বারা।

প্রলেতারিয়েতের অধিনায়কত্ব গ্রহণের অবস্থা সেইসময় পরিণত হয়ে ওঠে যখন উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং উৎপন্নসামগ্রী ভোগের ব্যাপারে ব্যক্তি-মালিকানার ধরনের মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার নেয় এবং তাছাড়াও, যখন কেবল প্রলেতারিয়েতই নয়, অন্যান্য শোষিত শ্রেণীও তার ফলে আক্রান্ত হয়, যখন সামাজিক বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধির ফলে শাসকশ্রেণী দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং পুরানো ও প্রচলিত উপায়গুলির সাহায্যে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে সে আর সমর্থ হয় না।

বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় মেহনতী জনগণের উপর শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বের মূল বিষয়ীগত পূর্বশর্ত হল তার এমন একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি থাকা যে পার্টি এই প্রক্রিয়াকে শ্রেণী সংগ্রামের সঠিক খাতে পরিচালনা করবে। লেনিন বলেছিলেন যে, প্রলেতারিয়েতের শক্তির উপরই প্রলেতারীয় অধিনায়কত্বের শক্তি ও সংগঠন নির্ভর করে, প্রলেতারিয়েত তার নেতৃভূমিকা একমাত্র তখনই পালন করতে পারে যদি সে এমন একটি মার্কসবাদী পার্টির পতাকাতলে একক ও স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হয়, যে পার্টি কেবল ভাবাদর্শের দিক থেকেই নয়, কার্যক্ষেত্রেও তার সংগ্রাম পরিচালনা করবে।

প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলি হল প্রলেতারিয়েতের চেতনার ও সংগঠনের স্তর এমন হওয়া যার ফলে সে শুধু যে তার স্বাধীন শ্রেণীগত দাবি নিয়েই বিপ্লবী সংগ্রামে যোগ দিতে সমর্থ হবে তা নয়, নিজের পতাকাতলে অ-প্রলেতারীয় স্তরের জনগণের ব্যাপক অংশকে, প্রধানত কৃষক-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও টেনে আনতেও সমর্থ হবে। তার মিত্রদের কেবল স্বতস্ফূর্তভাবে প্রতিবাদ জানাতে সমর্থ হলেই চলবে না, তাদের শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, বিপ্লবী রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম করতে সমর্থ হতে হবে।

বিষয়ীগত পূর্বশর্তগুলির মধ্যে অন্যান্য যেসব অপরিহার্য শর্ত রয়েছে সেগুলি হল, বুর্জোয়াশ্রেণীগুলির জন-বিরোধী নীতির স্বরূপ উদঘাটন, রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি।

কিন্তু যে শ্রেণীশক্তিগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি, তারা সকলেই একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে তাদের বিষয়গত সামাজিক অবস্থার দরুন সক্রিয় বৈপ্লবিক সংগ্রামে সামিল হতে সমর্থ। এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি এবং রাজনৈতিক বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। বিপ্লবের সামাজিক ভিত্তি হল সেইসব শ্রেণী ও সামাজিক স্তর যারা তাদের বিষয়গত সামাজিক অবস্থার দরুনই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে, সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর সংগ্রামে আগ্রহশীল ; আর বিপ্লবের রাজনৈতিক বাহিনী তৈরি হয় কেবল সেইসব সামাজিক শক্তিকে নিয়ে যারা সে সংগ্রামের আবশ্যকতা উপলব্ধি করতে পেরেছে, সে সংগ্রামের লক্ষ্যগুলি সমর্থন করে এবং তাতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সম্মত থাকে।

শ্রমিকশ্রেণীর ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিষয়গত ও বিষয়ীগত অসুবিধা থাকা বা না থাকায় কোন অবস্থান্তর না ঘটে বর্তমান যুগে কেবল যে মুক্তি সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তি প্রসার লাভের পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, শ্রমিকশ্রেণীর ও তার মিত্রদের চেতনা ও সংগঠনের স্তরও বাড়ছে, তাদের রাজনৈতিক কাজকর্মও আরো বেশি নিবিড় হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে এর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ১৯১৭ সালে পৃথিবীতে কমিউনিস্টের সংখ্যা ৪০০০০০-এর সামান্য বেশি ছিল, আর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিতে সদস্যসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ ; ১৯৬৮ সালের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সংখ্যা হয় ১ কোটি ৫০ লক্ষ, আর কমিউনিস্টদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫ কোটিতে। বিশ্ব বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার আরো প্রসারলাভের এবং তার সাফল্যলাভের এটাই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি।

পূর্বেকার উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে শিল্পের ত্বরণধর্মী বিকাশ ঘটার দরুন এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। গত ১৫-২০ বছরে এই সব দেশের অনেকগুলিতেই শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা তিনগুণ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ৫ থেকে ৬ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে। এই সব দেশে কারুশিল্পী ও কায়িক শ্রমের শ্রমিকদের স্থান গ্রহণ করছে আধুনিক শিল্প-প্রলেতারিয়েত যারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ক্রমেই বেশি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা অর্জন করছে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আজ তার বিকাশের এক নতুন ও উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই পর্যায়ের মর্মবস্তু হল এই যে বহু দেশেই জাতীয় মুক্তির

জন্ম সংগ্রাম কার্যত সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উভয় ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে শুরু করেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নতুন নতুন প্রক্রিয়াও বিকাশলাভ করতে শুরু করেছে, এবং তা কেবল জাতীয় নিপীড়কদের বিরুদ্ধেই নয় সামাজিক নিপীড়কদের বিরুদ্ধেও তার আক্রমণকে উত্তরোত্তর বেশি করে পরিচালনা করছে। এটা তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল উপাদানে, বিশ্ব সমাজতন্ত্রের মিত্রশক্তিতে রূপান্তরিত করছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বর্তমান পর্যায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি হল গোটা একটা দেশগোষ্ঠীর অ-পুঁজিতান্ত্রিক বিকাশের পথে এবং ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পথে উত্তরণ। যে দেশগুলি আজ বিকাশের অ-পুঁজিতান্ত্রিক পথ নিয়েছে, তারা বিশ্বের এমন এক ব্যাপক এলাকা জুড়ে রয়েছে যাতে কৃষকরাই হল জনসংখ্যার প্রধান অংশ।

প্রাক একচেটিয়া পুঁজির কালপর্বে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রলেতারিয়েত তার মুক্তির সংগ্রামে প্রকৃতপক্ষে সমাজের অন্যান্য শ্রেণী ও সামাজিক স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কর্মতৎপর হয়, এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে—জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তার কর্মতৎপরতা চালাতে হয়। সাম্রাজ্যবাদের কালপর্বে মাঝারী স্তরের, মেহনতী কৃষক-সমাজের শ্রমিকশ্রেণীর অভিমুখে এক সাধারণ ও ঐতিহাসিক মোড়-পরিবর্তন ঘটল, আর জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিণত হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রশক্তিতে। "কৃষকরা হল জনসাধারণের এক প্রতিক্রিয়াশীল অংশ" বলে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা যে-কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন, সেই নেতাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে লেনিন প্রমাণ করলেন যে, কৃষকরা একই সঙ্গে হল সম্পত্তিকারী ও মেহনতকারী। মেহনতকারী হিসাবে কৃষকরা প্রলেতারিয়েতের মত একই সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা—পুঁজি দ্বারা—শোষিত হয়। সুতরাং, মেহনতী কৃষকরাও প্রলেতারিয়েতের মত মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে আগ্রহশীল। এর মধ্যেই লেনিন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে, এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম নির্মাণের ব্যাপারেও প্রলেতারিয়েত ও কৃষক-সমাজের শ্রেণী মৈত্রীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভিত্তি দেখেছিলেন।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক-সমাজের মৈত্রী গভীরতর হওয়ার, মুক্তি সংগ্রামে মেহনতী কৃষক-সমাজের উত্তরোত্তর ব্যাপকতর অংশের

শ্রমিকশ্রেণীকে ঘিরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

একথা সকলেই জানেন যে সর্বাপেক্ষা গরীব কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে এবং মাঝারি কৃষকদের নিরপেক্ষ করে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী অক্টোবর বিপ্লব সম্পাদন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইওরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিতে সম্পাদিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি এবং কিউবার বিপ্লব ঘটেছে মাঝারি কৃষকসহ সমস্ত মেহনতী কৃষকের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে।

কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবনের ফলে বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে মেহনতী কৃষকদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তারাই হল শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান মিত্রশক্তি।

পুঁজিবাদী সমাজের বিরোধ প্রসার লাভের এবং আরও তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সামাজিক শক্তিগুলির সম্প্রসারণ ঘটছে।

মহাজনী পুঁজির আধিপত্যের ফলে কেবল যে ছোট ও মাঝারি চাষীদের একটা বড় অংশই ধ্বংস হচ্ছে তা নয়। বৃহৎ পুঁজি কর্তৃক শহরের জনসাধারণের মাঝারি স্তরের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলিও পদদলিত হচ্ছে। শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ প্রগতির সংগ্রামে হাতে-কাজ-করা ও মস্তিষ্কের সাহায্যে কাজ করা কর্মীদের মৈত্রী উত্তরোত্তর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে।

মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের বাহিনী বুদ্ধিজীবীর দ্বারা স্ফীত হচ্ছে এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে তাদের অংশ ও ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লেনিনও শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে বুদ্ধিজীবীদের টেনে আনা আবশ্যক বলে মনে করেছিলেন। লেনিন শিখিয়েছেন, "বিজ্ঞানী, প্রলেতারিয়েত ও প্রযুক্তিবিদদের মৈত্রীর সামনে কোন অন্ধকারের শক্তিই টিকতে পারে না।"* আমাদের কালে লেনিনের এই শিক্ষা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে যে আজ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সামাজিক স্বার্থ "শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।"

স্বভাবতই, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে শ্রমিকশ্রেণীর বর্গভুক্ত করা ভুল হবে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে কেবল কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত করাও ভুল হবে।

* ভি. আই. লেনিন, রচনা সংগ্রহ, খণ্ড ৩০, পৃ. ৪০২

শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীর মধ্যে যে প্রক্রিয়াটি ঘটছে তার সারকথা মোটেই এটা নয় যে শ্রমিকশ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে বা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শ্রমিকশ্রেণীর বাহিনীতে চলে যাচ্ছে ; আসল ঘটনাটি হল আধুনিক বৃহদায়তন শিল্প উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যায় এমন সব বৃত্তি সৃষ্টি করছে যার জন্য মাধ্যমিক বা আরো উচ্চতর শিক্ষা থাকা আবশ্যক। কিন্তু এর অর্থ শুধু এটাই যে শ্রমিক-শ্রেণীর নিজের মধ্যেই মানসিক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ছে।

সমকালীন সমাজে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও স্থানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে তাদের অংশ গ্রহণের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চূড়ান্ত বিপ্লবী শক্তির ভূমিকা ও অধিনায়কত্বের ক্ষমতা প্রদান করা ভুল হবে—যেটা আধুনিক সংশোধনবাদীরা করছেন। এটা করা হলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে প্রলে-তারিয়েতের বিরুদ্ধে স্থাপন করা হবে এবং সমাজ জীবনের প্রলেতারিয়েতের চূড়ান্ত বিপ্লবী ভূমিকার গুরুত্বকে ছোট করা হবে।

প্রথমত, এমন একটিও আধুনিক পুঁজিবাদী দেশ নেই যেখানে মানসিক শ্রম এরকম একটা স্থান অধিকার করেছে যে তা বৈষয়িক উৎপাদনে প্রাধান্যযুক্ত ও নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে, এবং তার উপর, সমগ্রভাবে সমাজ বিকাশের নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, সেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে এবং ভোগের সামগ্রী উৎপাদনে ও কৃষির ক্ষেত্রে নতুন নতুন স্তর দেখা দেওয়া বা ক্ষেত্রগুলি সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রলেতারিয়েতের বাহিনী স্ফীত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আগের মতই শ্রমিকশ্রেণী সমাজের সর্বাপেক্ষা কম সংস্থাসম্পন্ন শ্রেণীই রয়েছে। প্রলেতারীয়দের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই। এর দ্বারাই প্রলেতারিয়েতের সর্বাধিক বিপ্লবী চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, কোন কোন সময় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা ঘটলেও শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন ও চেতনার স্তর এবং তার বিপ্লবী ঐতিহ্যের দরুনই সে বর্তমান সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শ্রেণী থাকছে।

মোটা একটা পুঁজিবাদী দেশগোষ্ঠীতে সমাজ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে তরুণ-সমাজের সংখ্যাবৃদ্ধির ও তাদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ঘটনাটি। বিপ্লবী সংগ্রামে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের "অগ্রবাহিনীর

ভূমিকা" সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত ধারণাটির কথা তরুণ সমাজের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে।

যুবস-মাজের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ হল সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আধুনিক পুঁজিবাদ যে-সমস্ত বিরোধ সৃষ্টি করছে এবং বাড়িয়ে তুলছে তার বিরুদ্ধে যুব-সমাজের মধ্যে সহজাত প্রতিবাদের মেজাজের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া। ন্যায়বিচার ও মুক্তি সম্পর্কে তরুণ-সমাজের মনোভাব সর্বাপেক্ষা বেশি প্রতিফলিত হয় এমন এক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা চেষ্টা করছে। ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিকদের পার্টিগুলির আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চূড়ান্ত দলিলে বলা হয়েছে, "তরুণ সম্প্রদায়ের সংগ্রামে সমকালীন বুর্জোয়া সমাজের গভীর সংকটেরই প্রতিফলন ঘটছে।...শ্রমিক-শ্রেণীর আন্দোলনের এবং তাদের কমিউনিস্ট অগ্রবাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ঐক্য গড়ে তুললেই শুধু তাদের জন্য সত্যিকারের বিপ্লবী সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হতে পারে।"

শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যবর্তী স্তর বুদ্ধিজীবী, তরুণ-সম্প্রদায়, নারীসমাজ ও ধর্মবিশ্বাসী লোকজন মিলে জনগণের ব্যাপক অংশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আরো বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে কেবল এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে পুঁজিবাদের বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণী তার প্রতিষ্ঠা হারাচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে যে একচেটিয়া সংস্থা-গুলির ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তি ক্রমেই সংকীর্ণ হচ্ছে, আর অপরদিকে প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বের সামাজিক ভিত্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম

ভানুদেব দত্ত

ভারতের বুকে প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন ক্রমেই একটা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করছে। বিপ্লব বিরোধী দলগুলি জয়প্রকাশ নারায়ণকে মধ্যমণি করে, ক্ষমতা দখলের জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন দেশের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে।

এরই বিপরীত দিকে চলেছে সারা দেশ জুড়ে ধনতান্ত্রিক পথের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রাম এবং প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে রুখবার জন্য প্রতিরোধ-প্রস্তুতি। পরস্পর-বিরোধী এই দুই আন্দোলন বিগত এক বছর ধরে একে অপরের চ্যালেঞ্জ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই সংগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মিত্রশক্তিকে সমাবিষ্ট করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এটা হচ্ছে বলেই পক্ষ অবলম্বনের প্রশ্নটা বহুল পরিমাণে সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। নিরপেক্ষতা অবলম্বনের বাস্তব-ভিত্তি ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে এবং দেশের মানুষও এই অবস্থানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

আজকের মত দেশের সামনে দুটো পথের কথা কোনদিন এত জোরদার ভাবে আগে উচ্চারিত হয় নি। ভারত কোন্ পথে যাবে, এই প্রশ্ন নিয়েই হচ্ছে সংঘাত। এই সংঘাত যে আগামী দিনে তীব্র আকার ধারণ করবে, সেটা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বেজওয়াদা কংগ্রেস অত্যন্ত সঠিকভাবে ঘোষণা করেছে। ঘোষণাটি হচ্ছে—"আগামী দিনগুলি হবে একদিকে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির এবং অন্যদিকে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলির মধ্যে তীব্রতর সংঘাতের, ভারতের উন্নয়ন কোন্ পথে হবে এই মূল-কেন্দ্রিক প্রশ্নের ওপর তীব্রতর সংগ্রামের দিন। ঐ দিনগুলি হবে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এবং পরিস্থিতির মধ্যে ঘুরপাক এবং মোড় ঘোরার দিন।" (রাজনৈতিক প্রস্তাব)। সংঘাতপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে দেশের প্রগতির কথা উল্লেখ করে বিবদমান পক্ষের লক্ষ্য যেমন ঘোষিত হচ্ছে, তেমনি কৌশল ও রচিত হচ্ছে। মেরুধর্মী তার এই দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়ায় যে জটিল

... ...

কিছুই নয়। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে প্রতিক্রিয়ার পক্ষ অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

তৃতীয়ত, ভারতের রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ থেকে যারা বা যে সমস্ত দল আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত, তারাই যখন জয়প্রকাশ পরিচালিত আন্দোলনের সারথী, সে-সময় এই আন্দোলনের থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা অনুচিত। সর্বাত্মক বিপ্লবের সারথীরা যে বস্তুত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমন্বয়, কোন রকম বিচ্ছিন্ন শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান নয়, একটা জোট বা গোষ্ঠীর চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এটা মনে রাখা দরকার।

চতুর্থত, বেশ কিছু বামপন্থী দল রয়েছে, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর আস্থাশীল বলে নিজেদেরকে জনসমক্ষে পরিচয় দেন, তাঁরাও জয়প্রকাশ পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে ক্রমেই একাত্ম হয়ে পড়েছে। এটা নাকি ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য ভারতের মাটিতে 'মার্কসবাদী' রণকৌশলের একটা সুনির্দিষ্ট রূপ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী কার্যকলাপগুলিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা দিয়ে যুক্তিসঙ্গত করার যে অপচেষ্টা এইসব বামপন্থী দল করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে মার্কসবাদের পবিত্রতাকে রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব থেকেই জয়প্রকাশ পরিচালিত আন্দোলনকে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখা উচিত।

জয়প্রকাশ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তি

আমাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মূল শত্রু হচ্ছে তিনটি—সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব, সামন্ততন্ত্রের অবশেষ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ। এই তিন শত্রুকে নির্মূল করার জন্য—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, একচেটিয়া-বিরোধী ও সামন্তবাদ-বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্প, দ্রুত শিল্পায়ন ইত্যাদি পদক্ষেপগুলি নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক কাঠামো অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্বশর্ত সৃষ্টির সূচনা বলা চলে। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এই ধরনের যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার প্রতি জয়প্রকাশের মনোভাব তাঁর আন্দোলনের চরিত্রকেই নির্ধারণ করে। কখনও তিনি এইসব বিষয়গুলির প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন, আবার কখনও ভারতের গতিপথ কোন্‌দিকে যাবে সে ব্যাপারে নিজের বক্তব্যকে তিনি গোপন করার কোন চেষ্টা করেন নি। দেশের অভ্যন্তরে যতই তিনি 'সর্বাত্মক বিপ্লবে'-এর স্লোগান দিন না কেন, আসলে এই স্লোগানের আড়ালেই

তিনি জাতীয় ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গতিপথ উন্মুক্ত হওয়ার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান করে নিয়েছেন।

বুর্জোয়াশ্রেণীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশবিশিষ্ট দলগুলি চায় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সান্নিধ্য স্থাপন করে দেশকে ধনতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করতে। অন্যদিকে কংগ্রেসও চায় দেশকে ধনতান্ত্রিক পথে নিয়ে যেতে—তবে তা এক স্বাধীন বিকাশের মধ্যে দিয়ে। জয়প্রকাশের আক্রোশ ঠিক এই জায়গাতে। আমাদের জাতীয় জীবনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান মৈত্রীতে আতঙ্কিত হয়ে জয়প্রকাশ ও তাঁর সংগে যুক্ত দক্ষিণপন্থী শক্তিবর্গ কতটা রুষ্ট হয়েছেন, তার দু' একটি উদাহরণ এখানে যথেষ্ট।

প্রথম উদাহরণটি নিউজ প্রিন্ট চুক্তি সম্পর্কে। এ ব্যাপারে জনসংঘের 'অর্গানাইজার' পত্রিকা লিখছে, "The News print deal, however, disclosed the myth and the socialistic cat came out of the proletariat drum with its imperialist hunger and ugly and sharp claws. The episode demonstrated that socialistic hunger and the nature of exploitation were no less imperialistic in character then that witnessed during the British regime. The episode also established how a country, being fellow signatory of our friendship treaty and self-proclaimed ally in our economic progress (or it is social ?) continues overcharging its best friend, taking advantage of its difficulties and demands a black market price..." (Organiser—3. 8. 74)। অতিরিক্ত ধার্য্য মূল্যের অঙ্কটাত তুলে এবং সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি ভুলে গিয়ে, এই পত্রিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিড়াল, সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে অধিকতর শোষণের রূপ দেখতে পেয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে রুপী-রুবল এর সম্পর্ক নিয়ে Financial Express-এর মনোভাব। গোয়েঙ্কার কাগজ Express তার সম্পাদকীয়তে লিখছে, "The periodic revaluation of the rouble in relation to the rupee was not after all an academic exercise on the part of the Soviet authorities. Its purpose has been unfolded now by the rather brusque demand for a mark-up of as much as Rs 400 Crores in India's repayment liability on past credits."

উভয় দেশের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে

আক্রমণ উঠছে, তা নয়, আমাদের দেশের সরকারী প্রকল্পগুলিতে যেখানে তার অবদান চিরকাল স্মরণযোগ্য সেখানেও এই দক্ষিণপন্থী শক্তিবর্গ আক্রমণ করতে পেছপা হয় নি। ভারত যে আজ ব্যাপক শিল্পায়নের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং এর ফলে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি নির্ভরশীলতা ক্রমান্বয়ে কমছে এই ব্যাপারটি এ সব শক্তিবর্গের কাছে নৈরাশ্যজনক বলে মনে হচ্ছে। সেইজন্য তারা শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহকে এইভাবে প্রকাশ করেছে যে, "Most of the Soviet Union's investment in our industrial development was made in the public sector undertakings in order to ensure royalty, dividend, technical fees, interest etc as this sector would never be closed down inspite of heavy losses. Further, our government usually runs 'Core sector' which requires huge capital. Now, as the development and expansion of other sectors as well as the growth of national economy largely depend on the advancement of this sector, investment in the same and subsequent control over it enable the investor direct the national economy in his favour. And this explains the Soviet Union's particular interest in this sector" (Organiser 3. 8. 74)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃপণ সাহায্যের প্রতি এই ধরনের অযথা সন্দেহ প্রকাশ করে জনসংঘের মুখপত্রটি কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন করতে চায় নি। দ্রুত শিল্পায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের প্রতি বীতরাগ থেকেই তাদের এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, এই তিনটি বিষয়ই আমাদের দেশকে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি দিচ্ছে তা নয়, শক্তি দিচ্ছে দেশের একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার। অথচ দ্রুত শিল্পায়নের পরিবর্তে আমরা যাতে কৃষির উপর জোর দিই এবং এইভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার প্রতি যাতে নির্ভরশীলতা অটুট থাকে তারই কথা এই দক্ষিণপন্থী শক্তিবর্গ দেশবাসীকে বোঝাতে চান। বিস্ময়ের ব্যাপার যে এই ক্ষেত্রে তাঁরা আবার এম. এন. রায়কে সালিশী মানারও চেষ্টা করেন। জয়প্রকাশের মুখপত্র লিখছে, "When the first plan was drafted, the late M. N. Roy pointed out...lacunae in it.

...Agriculture must pay its due share for economic

development—that's what M. N. Roy said twenty years ago" (Everyman's 20. 7. 74)।

ভারতে ব্যাপক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সরকারী প্রকল্পের অবদান রয়েছে। এই সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে জয়প্রকাশের মনোভাব অত্যন্ত পরিষ্কার। ষ্টেটসম্যান পত্রিকা তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছে, "সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে জে. পি বলেছেন, গাছের পরিচয় তার ফলে। উত্তর যদি এই হয় যে সরকারী ক্ষেত্র তবে তাই, আর উত্তর যদি বেসরকারী ক্ষেত্রের পক্ষে যায় তবে নির্দ্বিধায় বে-সরকারী ক্ষেত্রকেই গ্রহণ করতে হবে। আর যদি এমন হয় যে সরকারী ও বে-সরকারী ক্ষেত্রের যুগপৎ অস্তিত্বের দ্বারাই সমাধান সম্ভব তাহলে তাই করতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সরকারী ক্ষেত্রের কাজকর্ম অত্যন্ত নীচুমানের। ৫০০০ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু প্রতিদানে আমরা কি সুফল পেলাম? দায়িত্বশীল যে কেউই ব্যবহারিক সমাধান খুঁজে বার করবার জন্য সচেষ্ট হবেন। অর্থনীতিবিদদের সকলেই একমত যে উৎপাদন বাড়াতেই হবে, মূলধন সৃষ্টি করতেই হবে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারী ক্ষেত্র কোন অবদানই যোগাল না। বস্তুত কোন কোন সরকারী ক্ষেত্রের প্রকল্পকে বে-সরকারী হাতে তুলে দেবারও প্রস্তাব উঠেছিল। এই প্রস্তাবের সারবত্তা ইন্দিরা গান্ধী উপলব্ধি করতে পেরেছেন। মতাদর্শগত বুলির পরিবর্তে জনগণের স্বার্থ, জনগণের মঙ্গল যার ওপর নির্ভর করছে তারই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত" (The Statesmen 16.6.74)। সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে জয়প্রকাশের নির্লজ্জ ওকালতির পরিণতি ঘটেছে এক আতঙ্ক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে।

এই কারণেই তিনি জাতীয়করণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবস্থার অধিগ্রহণ এবং শহর ও গ্রামের ভূসম্পত্তির ওপর সিলিং সম্পর্কিত নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। এই কারণেই তিনি পার্লামেন্টে যে দাবী সনদ পেশ করেছিলেন, তাতে মূল্যবৃদ্ধি, দুর্নীতি, বেকারী ইত্যাদির কথা উল্লেখিত থেকেও একচেটিয়া পুঁজি, সামন্তবাদ, কালো টাকা ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন। কারণ তিনি মনে করেন, "দেশের একচেটিয়া শিল্পগুলি নিশ্চিহ্ন করার দাবী অপ্রাসঙ্গিক" (Commerce 1.2.75)।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রধান বিরোধে যেহেতু জয়প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদের

পক্ষে, জাতীয় ক্ষেত্রের সামাজিক বিরোধে যেহেতু তিনি একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

জয়প্রকাশী আন্দোলনের রাজনৈতিক অ'াতাত

জয়প্রকাশের আন্দোলন যে প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই কেবল তাঁর আন্দোলনের চরিত্র নির্ধারণ করবে না, তিনি যে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে তাঁর আন্দোলনের পিছনে জড়ো করতে পেরেছেন, সেটিও ঐ আন্দোলনের চরিত্র বোঝার ব্যাপারে সহায়ক। কোন আন্দোলনকে শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার সময়, ঐ আন্দোলনে কোন্ কোন্ শক্তির অংশগ্রহণ রয়েছে এবং এর নেতৃত্ব করে হাতে সেটিও প্রধান বিচার্য বিষয়। শ্রেণী হিসাবে আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও জমিদার এদের সঙ্গে আরও যে সমস্ত গোষ্ঠী রয়েছে তারা হল—কালোবাজারী, মুনাফাখোর, জোতদার প্রভৃতি। এই সমস্ত শ্রেণী বা গোষ্ঠী যে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে এবং নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী কর্মসূচী এই সব দলের রাজনৈতিক কর্মসূচীতে প্রতিবিম্বিত তারা সকলেই জয়প্রকাশের চতুর্দিকে গ্রহ-উপগ্রহের মত বিরাজ করছে। এইসব দলের মধ্যে রয়েছে—জনসংঘ, সংগঠন কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, ভারতীয় লোকদল, প্রগতি পার্টি ইত্যাদি। এই সমস্ত রাজনৈতিক দল ছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, আনন্দমার্গ, শিবসেনার মত উগ্র জাত্যভিমানী ও সাম্প্রদায়িক প্রভৃতি গোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়া 'ট্রয়ের ঘোড়া'র রূপ নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একদল রয়েছে যারা জয়প্রকাশের আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত। দেশের ক্রমবর্ধমান সংকটে পিষ্ট বিক্ষুব্ধ জনগণের কাছে এরা ১৯৭১ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে কংগ্রেসের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেন। আবার বিক্ষুব্ধ জনগণকে দমন করার জন্য এরা বাইরের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্র স্থাপন করে ১৯৭৬ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনের মধ্যে দিল্লী ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখেন। অস্তিত্ব কংগ্রেসের অভ্যন্তরে হলেও, মনটা রয়েছে সংগঠনের বাইরে। এদের অস্তিত্ব এতদিন অনুভব করা গেলেও, জরুরী অবস্থার আনুকূল্যে এরা আজ দৃষ্টিসীমার মধ্যে।

জয়প্রকাশের রাজনৈতিক অ'াতাতের আকৃতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে একথা বলা যায় যে তাঁর আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রভাবের উপকেন্দ্র ভারতের সমস্ত

প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী, দল এবং গোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত। উপকেন্দ্রের এই শ্রেণী-ভিত্তিক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যভিত্তিক বিস্তৃতিও ঘটেছে। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের প্রতিক্রিয়াবাদীরা জয়প্রকাশকে 'জাতীয় পরিত্রাতা' হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে ইতিবাচক দিক হচ্ছে এই সব দল বা গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের কাছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজ করছে। ভারতের রাজনীতিতে যখনই সাধারণ ভাবে গণচেতনার উন্মেষ এবং নির্দিষ্টভাবে বামমুখিনতার ঝোঁক প্রবল হয়েছে, সে সময় এরা সকলেই সাধারণ মানুষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ১৯৭১ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে এবং ১৯৭২ সালে বহু রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন এরই স্বপক্ষে সাক্ষ্যদান করে।

তৃতীয় দিকটি হচ্ছে—রাজনৈতিক আঁতাতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের চরিত্র। এই আঁতাতের মধ্যে রয়েছে আকালী দলের নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল যিনি দুর্নীতির জন্যে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, মধ্যপ্রদেশের মাধো সিং যিনি পূর্বে চম্বল অঞ্চলের ডাকাত ছিলেন, বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহামায়া প্রসাদ সিংহ যিনি কুখ্যাত রামগড় মামলা তুলে নেবার ব্যাপারে কলকাতা কর্তৃক নিন্দিত হয়েছিলেন, বিহারের আরেকজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর যার আচরণকে মুখলকার "স্পষ্টতই অসঙ্গত" বলে নিন্দা করেছিল প্রভৃতি। এই রাজনৈতিক আঁতাতটির পিছনে রয়েছে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতির অন্যতম গোয়েন্দা। প্রকৃত বিপ্লবের জন্য চারিত্রিক অখণ্ডতা রক্ষা করা একটা বড় দিক।

স্বয়ং জয়প্রকাশ 'সর্বাত্মক বিপ্লব'-এর জন্য আন্দোলন শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন—কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম, এশিয়া পীস ফাউণ্ডেশন, গান্ধী পীস ফাউণ্ডেশন, পীস কোর প্রভৃতি সংগঠনগুলির সঙ্গে। এই সমস্ত সংগঠন মার্কিনী অর্থপুষ্ট।

দেশের প্রতিক্রিয়াবাদীরা জয়প্রকাশকে 'জাতীয় পরিত্রাতা' হিসাবে গণ্য করার পিছনে কারণ রয়েছে। কংগ্রেসের ভাঙ্গনের সময় থেকে ১৯৭১ সালের নির্বাচন পর্যন্ত এই কাজটিকে করার জন্য মোরারজী দেশাই চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় নামে মহাজোট তৈরী হলেও, এর কাজ মূলত নির্বাচনী উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল। অর্থাৎ যথার্থ অর্থে মহাজোটের সৃষ্টি সেদিন সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয়েছিল এক বিশেষ অর্থে। জয়প্রকাশের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি এটিকে যথার্থ অর্থে সম্ভব করে তুলেছেন। বিপ্লব যেমন দেশের কাঠামোতে

এক আমূল পরিবর্তন আনে, প্রতিবিপ্লবও এক আমূল পরিবর্তন আনে—তবে বিপরীত দিকে। জয়প্রকাশের মহাজোটটি যথার্থ, কারণ তিনি দেশকে কংগ্রেসের প্রাক-ভাঙ্গন স্তরে নিয়ে যেতে চান। তবে তাঁর সাফল্য বা কৃতিত্ব আরো অনেক বেশী। তিনি তাঁর আন্দোলনী আঁতাতে কেবলমাত্র দক্ষিণ-পন্থীদেরই একত্রীভূত করেছেন তাই নয়, পরন্তু তিনি কিছু কিছু বামপন্থী দলকেও কাছে টানতে পেরেছেন।

আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বামপন্থী দল সমাজতন্ত্রের পক্ষে নিজেদেরকে দাবী করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পক্ষে থাকাটা কোন বিমূর্ত অবস্থান গ্রহণ করা নয়। যারা প্রকৃতই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকা। এমন কি যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী নয়, অথচ সমাজতন্ত্রের কথা বলে তাদের উচিত এই আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করা। যে সমস্ত বামপন্থী দল জয়প্রকাশের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলেও, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে এবং এমন কি, কম বেশী সোভিয়েত-বিরোধিতার অবস্থান গ্রহণ করেছে। জাতীয় ক্ষেত্রের সামাজিক বিরোধে এরা তাই ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে যাওয়ার ফলে আটপৌরে রাজনীতির জালে আটকে পড়ছে। লেনিনের নির্দেশমত এরা আন্তর্জাতিক বিরোধের কাঠামোতে সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণের শুরু করছে না বলেই, সামাজিক বিরোধ নির্ণয়ে কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিতে পারছে না। তাই দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণী-ভিত্তিক না হয়ে পার্টিভিত্তিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সামাজিক বিরোধকে পরস্পর-বিরোধী শ্রেণীর বিরোধ হিসাবে না দেখে, পরস্পর-বিরোধী পার্টির বিরোধ হিসাবে দেখছে।

এই কারণেই জয়প্রকাশের আন্দোলনের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী এই উভয় দিক থেকে পার্টিগুলো এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। এদের মিলনের সাধারণ ভিত্তি হচ্ছে—সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধিতা।

জয়প্রকাশের রাজনৈতিক অতীত আজকের রাজনৈতিক আঁতাতে প্রতিফলিত

গোলওয়ালকরের মতাদর্শে বিশ্বাসী জনসংঘ ও আর. এস. এস, গান্ধীজীর

মত ধর্মে বিশ্বাসী বলে কথিত স্বতন্ত্র ও বিশুদ্ধ কংগ্রেস এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্বজাধারী সি. পি. এম ও এস. ইউ. সি প্রভৃতি পার্টিকে মতাদর্শ-শূন্যতার ভিত্তিতে এক জায়গায় আনতে পারার প্রচেষ্টা জয়প্রকাশ বহুকাল আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। আমরা যদি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রায় বিশ বছর আগেকার পাতা ওলটাই, তা হলে দেখতে পাব, পার্টিবিহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন আজ তিনি শুরু করেছেন, তার ইঙ্গিত তিনি সে দিনই দিয়েছিলেন।

১৯৫৭ সালে জয়প্রকাশ "ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য" যে গবেষণা করেন, তার মূল প্রতিপাদ্যই ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে পার্টি-বিহীন গণতন্ত্রের প্রয়োগ। এর ঠিক আগেই তখন কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসনের এক জায়গায় অর্থাৎ কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টি চিড় ধরাতে পেরেছিল। কেরালায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রভাব যাতে অন্য রাজ্যে না পড়ে অথবা তার দৃষ্টান্তে অন্য কেউ যাতে অনুপ্রাণিত না হয়, সেটাই ছিল জয়প্রকাশের অন্তত উদ্দেশ্য।

পরের ঘটনা ঘটে ১৯৬৭ সালে, যখন কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সরকার গঠিত হয়। যে সময়েও ভারতে রাজনীতিতে দ্রুত শক্তিবিন্যাস লক্ষ্য করে জয়প্রকাশ পার্টিবিহীন গণতন্ত্রের কথা প্রচার করেন। এমন কি তাঁর এই গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তাও তাঁর কথায় প্রকাশ পায়।

এমনকি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে যে পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে তাতেও তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য ভারতকে আগামী দিনে পশ্চিমী দুনিয়া থেকে যে বিচ্ছিন্ন করবে এটাও তিনি বুঝতে সক্ষম হন। তিনি ১৯৫৯ সালে A plea for the reconstruction of Indian Policy নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি ব্যাপক শিল্পায়ন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "As for large-scale industrialisation, there is a very large measure of agreement among social thinkers that it inevitably leads to shrinkage of democracy (p. 9)। জয়প্রকাশের এহেন মন্তব্যের কারণ হল ভারতের ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করেছিল। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভিলাই

ইস্পাত কারখানার জন্য ১৯৫৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীতে এক চুক্তি হয়। ১৯৫৬ সালের ১৫ই আগস্ট দুরাটগড় কেন্দ্রীয় খামারের কাজ শুরু হয়। ১৯৫৭ সালে ৯ই নভেম্বর রাঁচীর ভারী শিল্প, দুর্গাপুরে খনির যন্ত্রপাতি, নেইভেলীতে থার্মাল পাওয়ার স্টেশন, কোরবাতে কয়লাখনি প্রভৃতি ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদিত হয়। তিনি আর বাক-সংযমী থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, "Private enterprise would have fullest scope in the community" (Ibid, p 60)।

ভারী শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞান প্রয়োগের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে, তিনি আনবিক শক্তি ব্যবহার সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে, "Atomic energy for peaceful pnrposes, on a-scale calculated.to replace coal and oil. is a prospect even appalling than atomic and hydrogen bomb" (Ibid p 5)।

জয়প্রকাশের অতীত সম্পর্কে এই আলোচনা থেকে তিনি যে তিনটি বিষয়ের প্রতি বীতরাগ তার একটা মনোভাব পাওয়া গেল যা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য করবে। এই তিনটি বিষয় হল :—

বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অনুকূলে দ্রুত শক্তিবিন্যাস (খ) সরকারী প্রকল্পগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য এবং (গ) দ্রুত শিল্পায়নের পথে অগ্রগতি।

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি

বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতের পরিস্থিতিতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অনুকূলে দ্রুত শক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লক্ষণীয় দিকগুলি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে, তা হল :

(ক) ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের ভাঙনের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরম-প্রতিক্রিয়াশীল অংশ কংগ্রেস সংগঠন নামে এক নতুন পার্টি গঠন করে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের মধ্যে এক জাগরণের উন্মেষ হয়।

(খ) ১৯৭১ সালে বুর্জোয়াশ্রেণীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশের পার্টি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক দল পার্লামেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়।

(গ) কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বাম ও মধ্যপন্থী শক্তিবর্গ ক্রমেই দক্ষিণপন্থার বিপদে সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে।

(ঘ) কংগ্রেসের একটি অংশের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির আলোচনা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংযোগসূত্র বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত লক্ষণীয় দিকের কথা চিন্তা করে, জয়প্রকাশ উত্তর প্রদেশের বালিয়া শহরে কংগ্রেসীদেরকে দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন করার পরিবর্তে কমিউনিস্টদের বিপদ থেকে সাবধান হতে বলেন। খবর সংস্থা পি. টি. আই লিখছে—"The Sarvodaya leader, Mr. Jaya Prakash Narayan today warned the congressmen against the 'ugly designs' of Communists who 'taking advantage of the current political and economic situation, sought to share power at the centre and elsewher'e" (The Statesmen 9. 11. 74)।

দ্বিতীয়ত সরকারী প্রকল্পগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য বিগত কয়েক বছরে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। যেমন : ১৯৭১ সালে ৯ই আগস্ট ভারত-সোভিয়েত চুক্তি, ১৯৭২ সালের ৩রা জুলাই ভিলাই-এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত চুক্তি, ১৯৭৩ সালের ২৫শে জুন ইণ্ডিয়ান ড্রাগস ও ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-এর সম্প্রসারণকল্পে চুক্তি, ২৯শে নভেম্বর লিওনিদ ব্রেজনেভের ভারত সফরকালে আরো কয়েকটি চুক্তি ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দৃঢ়তর করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কয়লা ও তৈল নিষ্কাষণ, খাদ্য ও কেরোসিন সরবরাহ, বাণিজ্যের উন্নতি ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এর ফলে একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ রুদ্ধ হয়, অন্যদিকে ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্ষমতার কিছুটা সংকোচন হতে থাকে। ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত মিশ্র অর্থনীতির বে-সরকারী দিকটিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যেমন বেপরোয়া, তেমনি সরকারী কাঠামোটিকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার জন্য দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিও উন্মুখ। ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির গাত্রদাহের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই দিকটিকেই চিহ্নিত করেছে তাদের বিগত দশম কংগ্রেসে। পার্টি বলছে, "Indo-Soviet cooperation has now become a major target of rightist attack in our country, as well as the attack from maoist china"... "Reaction in India

wants to make anti-Soveitism a rallying point not only for open political forces, but also of sections entrenched in our economic life, state organs and administrative apparatus" (Political Resolution—C. P. I p 26)।

তৃতীয়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিস্তার ক্ষেত্রে ভারত এত উন্নতি করে যে আজ সে পৃথিবীর ষষ্ঠ আনবিক শক্তি বিশিষ্ট দেশ। এর ফলে ব্যাপক শিল্পায়নের এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতার প্রশ্নটি ক্রমেই অপসারিত হচ্ছে।

এই তিনটি বিষয়ে অর্থাৎ বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ, সরকারী প্রকল্প-গুলিতে সোভিয়েতের সাহায্য এবং ব্যাপক শিল্পায়নের অগ্রগতি— এগুলি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। আর এ সমস্ত কিছুই ঘটে ১৯৭১-৭৩ সালের মধ্যে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী থেকে জয়প্রকাশের যে আন্দোলন শুরু হয়, সেটা সময় বাছাই এর দিক থেকে খুবই লক্ষ্যণীয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

জয়প্রকাশী আন্দোলনের সময়-নির্ধারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক থেকেও খুবই লক্ষ্যনীয়। বহিঃশক্তির কার্যকলাপ ভারতকে কেন্দ্র করে তিন-দিকে কেন্দ্রীভূত রাখা হয়েছে। প্রথমত, ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের দিয়াগো গারসিয়া দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পারমানবিক নৌঘাটি বসিয়েছে। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমে ইরান ও পাকিস্থানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত যুদ্ধাস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত করে চলেছে। তৃতীয়ত আরেকটি দিক রয়েছে—সেটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ভারত সরকারের শিল্প-নীতি বিষয়ক প্রস্তাব-গুলির মধ্যে যে সমস্ত প্রগতিশীল উপাদান রয়েছে, তাকে বানচাল করার আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিল।

তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে নষ্ট করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সর্বাত্মক সংকটের বোঝা তাদের ওপর স্থানান্তরিত করতে চায়। এই কাজ তারা করবে অস্থিতিশীলকরণের (Destabilisation) মধ্যে দিয়ে। এই কর্মসূচীর দ্বি-মুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রথমত, এই সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে সংযোগসূত্র স্থাপন করে তাঁদেকে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপ্রবেশের

এক হাতাবরণ সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত পর্যায়ে মার্কিন সরকারের এক পুতুল সরকার কায়েম করা।

ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলিকে বেছে নেওয়ার কারণ পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় বরণ, পশ্চিম এশিয়ায় আরব রাষ্ট্রগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার অক্ষমতা। এছাড়া সামগ্রিকভাবে এশিয়ার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের গতিমুখ শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দিকে। বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনের সাফল্য, মোজাম্বিকের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বিতাড়ন, প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলনের প্রতিনিধির রাষ্ট্রপুঞ্জে দর্শক-প্রতিনিধির অধিকার লাভ প্রভৃতি ঘটনা এশিয়ার ভূখণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পায়ের তলায় জমিকে দুর্বল করে তুলেছে। এই অবস্থায় নতুন করে এবং দ্বিগুণ উদ্যমে অস্থিতিশীলকরণের কর্মসূচী চালু করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে।

ভারতের অভ্যন্তরে জয়প্রকাশের অস্থিতিশীলকরণের অভিযান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পরিকল্পনারই অঙ্গ। সাম্রাজ্যবাদ ও সি. আই. এ র বিশ্ব-রণনীতি আছে। দেশে দেশে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-রণনীতিরই অঙ্গীভূত। এই উভয় শক্তির মধ্যে সান্নিধ্য, যোগসূত্র এবং যৌথ পরিকল্পনা বহু দেশের মত ভারতেরও সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রকে বিনাশ করতে চায়। চিলির গণ-ঐক্য ব্লকের উচ্ছেদ, ভারত-মহাসাগরের দিয়াগো গারসিয়া দ্বীপে মার্কিন পারমানবিক নৌঘাঁটি স্থাপন, কোরিয়াকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত, পাকিস্থান ও ইরানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রদান প্রভৃতি ঘটনাতে জয়প্রকাশের নীরবতা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতি পরোক্ষ সমর্থন দান এবং সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-রণনীতির স্বপক্ষে অনুরূপ কার্যক্রম ছাড়া অন্য কিছু নয়। কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির ১৯৬৯-এর মস্কো বৈঠক এই সঠিক সাবধান বাণী ঘোষণা করেছিল যে ফ্যাসিবাদ সংকটের শীর্ষে তার কার্যকলাপের গতিবৃদ্ধি করে এবং এই প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগসূত্র স্থাপন করে। সেই কারণে তাঁর আন্দোলন কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রতিবিপ্লবী আন্দোলন নয়, পরন্তু সেটি নয়-ঔপনিবেশিক চক্রান্তের সাথে যুক্ত। এই দিকটি যথার্থ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক অতীত, রাজনৈতিক আঁতাত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে।

রাজনৈতিক আঁতাতকে সুরক্ষিত করার প্রয়াস

জয়প্রকাশ এটা বুঝেছিলেন যে তাঁর রাজনৈতিক আঁতাতকে সুরক্ষিত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে নিম্নলিখিত দুটি কাজ করা দরকার :—

(ক) বাকসর্বস্বতার আড়ালে জনগণকে বিভ্রান্ত করে শাসকদলের প্রতি মোহমুক্তি ঘটানো ;

(খ) বিরোধী দলগুলিকে সুবিধাবাদী নীতির বাক্যজালে মোহমুগ্ধ করা।

এই কারণে দুর্নীতি দূরীকরণ, শিক্ষা সংস্কার ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করলেও, বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যখন দেখা যায় তাকে তিনি শেষ পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের নির্বাচন পর্যন্ত আন্দোলন চালাবার আহ্বান এবং নৈতিকতার প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবীতে পর্যবসিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর আন্দোলনকে ক্রমান্বয়িক ধারায় রাজনৈতিক চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন।

জয়প্রকাশ যখন প্রথম আন্দোলন শুরু করেন, তখন তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল সাধারণ মানুষকে পাশে পাওয়ার। নয়া ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থচক্রের কৌশল কখনই জয়যুক্ত হতে পারে না যদি না শাসকদলের অনুগামী জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ করা না যায়। সেই কারণে, আমরা দেখি, জয়প্রকাশের আশীর্বাদপুষ্ট বিহার ছাত্র সংঘর্ষ সমিতির যে আন্দোলন ১২ দফা দাবী নিয়ে শুরু হয়েছিল, তাতে "আটটি দাবী ছিল পুরোপুরি ছাত্রদের দাবী-দাওয়ার সঙ্গে যুক্ত, অপর চারটি সম্পর্কিত ছিল জনগণের ব্যাপক স্বার্থের সঙ্গে"। (হিন্দুস্থান টাইমস্ ২৬।৮।৭৪)। কিন্তু মজুতদার ও মুনাফা-শিকারীদের সম্মতি নিয়ে জয়প্রকাশ যে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিলেন, সেটা কখনই সম্ভবপর নয়। অন্যদিকে সদাচার সপ্তাহ পালন করে দুর্নীতি দূরীকরণের যে আশা তিনি করেছিলেন, সেটা দুরাশা মাত্র। এই সমস্যাগুলিকে নৈতিক সমস্যা হিসাবে না দেখে, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখা উচিত। এগুলি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রেণী-কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। ভারতে অনুসৃত ধনতান্ত্রিক পথ থেকে এগুলি উদ্ভূত এবং এই ধনতান্ত্রিক পথের অবলুপ্তির কথা ঘোষণা না করে, এগুলি দূর করার কথা বলার অর্থ প্রতারণা করার সামিল।

এর প্রায় ৭।৮ মাস পর জয়প্রকাশের ৭ দফা সম্বলিত এক দাবী সনদ পার্লামেন্টে পেশ করা হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য এই

সনদ পেশ করা হয়। এর মধ্যে ভূমি সংস্কার ও নূনতম মজুরীর কথাও উল্লেখিত থাকে, জয়প্রকাশ তাঁর দাবী সনদকে বামমুখীন রূপ দিয়েছিলেন দুটি কারণের জন্য :—(ক) জনগণকে বিভ্রান্ত করা (খ) সি. পি. এম প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলিকে টানা। কিন্তু তাই বলে তিনি তাঁর অবস্থানকে বিসর্জন দেন নি। পূর্বতন অবস্থানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ভূমি সংস্কার ও নূন্যতম মজুরীর মত মৌলিক দাবীর প্রতি আন্তরিকতা প্রমাণ করা যায় না। যেমন, ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতা চুক্তি সম্পর্কে তিনি মনে করেন, "I am conscious of the fact that Russia is not in a position to fulfil the needs of our economic development ..a non-aligned and territorially vast country like India should establish and strengthen its relations with the Western European Community, Japan and America and thereby, it should diversirfy its self-reliance in economic and other matters" (Hamari Samasyaen, Jayprakash Narayan, Patna Quoted from New Age-16. 3. 75)। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভারতকে আরো জড়িত করে তিনি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান করতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি সরকারী প্রকল্পকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "All economists agreed that production must be incresed and there should be capital formation. The public sector did not add to production. In fact the proposal was to give away some public sector undertakings to private hands. This was what Mrs. Gandhi had now realised. What should be primary was the interests of the people, good of the people and not ideological blinkers" (The Statesman 16. 6. 74)। নিজের মতাদর্শগত অবস্থান পরিহার না করে মৌলিক দাবীর কথা বলা এক চরম কপটতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর তিনি এই কপটতা গ্রহণ করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক আঁতাতকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বলেছেন, "সম্ভবত সি. পি. এম এবং সি. পি. এম. এল-এর নেতৃবৃন্দ আমার বক্তব্য ভেবে দেখবেন। এদের জাতীয় স্তরে নেতৃত্বে আসীন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব রয়েছে। মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দলগুলো সম্পর্কে আমি কিছুটা শ্রদ্ধাশীল এই কারণে যে, এরা কোন বিশেষ শক্তির ক্রীড়নক নয় এবং নিজে নিজে চিন্তা করতে অভ্যস্ত" (Everyman's 30. 3. 74)। জয়প্রকাশের কি নগ্ন কপটতা। জয়প্রকাশের

এই নির্দোষ নিরপেক্ষতার আকাঙ্ক্ষা যে ছদ্মবেশের আবরণ সেটা তাঁর অন্য এক উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়। তিনি বলছেন, "কমিউনিস্টরা কেবল রক্ষণশীলই নয়, তারা প্রতিক্রিয়াশীলও বটে। রুশী রাষ্ট্রটি অত্যন্ত রক্ষণশীল। তার তুলনায় চীন এখন পর্যন্ত একটি বিপ্লবী রাষ্ট্র" (The Statesmen 16. 7. 74) এই উক্তি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করাই নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভেদের শক্তি যার বর্তমান অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেই চীনকে তিনি প্রশংসা করতে ছাড়েন নি।

একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, জয়প্রকাশের মতাদর্শ বিশ্লেষণের তত্ত্ব এমনই করেই রাজনৈতিক আঁতাতকে তৈরী ও সুরক্ষিত করে এবং সি. পি. এম প্রভৃতি বামপন্থী দলগুলির সংকীর্ণ খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগবাদকে চরম মানদণ্ড ধরে শত্রুকে মিত্রের স্থানে বসায়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন নির্লজ্জ সুবিধাবাদী পূর্বে কখনও দৃষ্টি গোচর হয় নি।

জয়প্রকাশী আন্দোলনে এই সুবিধাবাদীতা, স্ববিরোধিতা ও বাকসর্বস্বতার মিলন ঘটার পিছনে কারণ হল তাঁর রাজনৈতিক আঁতাতকে সুরক্ষিত করার প্রয়াস। বুর্জোয়া শ্রেণীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল অংশের এটা একটা কৌশল।

অস্থিতিশীল করণের কার্যকলাপ :

একথা অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, যে কোন দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সাধারণত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে থাকে—সংকটজনক পরিস্থিতিকে ব্যবহার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থায়িত্বকে বাড়িয়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট গঠন। জয়প্রকাশের প্রচেষ্টা এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের গতিমুখকে পাল্টে দেওয়ার জন্য, একচেটিয়া পুঁজিপতি জমিদারদের অনুকূলে নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাইরের অস্থিতিশীলকরণের কার্যকলাপের সঙ্গে অভ্যন্তরের অস্থিরতা, অচলতা ও নৈরাজ্যের পরিবেশ তৈরী করার কার্যকলাপকে সমকাল-বর্তী (Synchronise) করার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর সেই অস্থিতিশীল করণের দৃষ্টান্ত আমরা ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে দেখতে শুরু করি এই কার্যকলাপগুলির চূড়ান্ত পর্ব ঘটার আশংকা ছিল গত ২৯শে জুন তারিখে।

কিন্তু সেটা আর শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ

জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে এদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার নেতৃস্থানীয়দের গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে বেআইনী করা হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসে একথা বলা হয়েছিল যে ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। বস্তুত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, এই রাজনৈতিক পার্থক্য এবং সংঘাত এক নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে। এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার একদিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক অংশের বুর্জোয়া প্রতিনিধি এবং অন্যদিকে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী সমর্থক এবং অতি প্রতিক্রিয়াশীল, একচেটিয়া পুঁজি-সমর্থক, জমিদার-সমর্থক, কমিউনিস্ট-বিরোধী অংশের প্রতিনিধি। বুর্জোয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্য এবং সংঘাত প্রবেশ করেছে এক নতুন স্তরে। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে এই ঘটনা কোন দিক থেকে কম উৎসাহের নয়।

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে বুর্জোয়াদের এক অংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নিপীড়ন যন্ত্রকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। এর ফলে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে দুটি ইতিবাচক দিক উন্মোচিত হয়েছে: (ক) দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করা এবং (খ) বুর্জোয়াদের এই অংশকে অধিকতর বামমুখীন অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। তবে এই ঘটনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেমন ঘটবে না, তেমনি বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশ এই দিকেই সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাবে একথাও মনে করার কোন কারণ নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিক্রিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে তবে নির্মূল হয় নি। কোনরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রতিক্রিয়ার মারাত্মক পরিকল্পনাকে, যা আগামী দিনেও ঘটতে পারে, পর্যুদস্ত করা যায় না। তা করতে হলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক বনিয়াদকে চূর্ণ করার দরকার আর এই সংগ্রামে জনগণকে পাশে পাওয়ার দরকার। আর এর জন্য প্রয়োজন জনগণ যাতে কিছুটা স্বস্তি পায়, সেই সব ব্যবস্থা কার্যকরী করা।

নারী জাতির প্রতি বৈষম্য অবসানের ঘোষণাপত্র

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালে যে মানবিক অধিকারের সনদ ঘোষণা করেছিলেন, তারই পরিপূরক হিসাবে ১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর নারী জাতির প্রতি বৈষম্য অবসানের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন। ১৯৭২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং সমগ্র ১৯৭৫ সাল ব্যাপী জাতিসংঘ ও সদস্য রাষ্ট্রগুলি নারী জাতির প্রতি এই বৈষম্যের অবসান ঘটান ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ববিধ উপায়ে সচেষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মানুষের মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি মানবের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের উপর জাতিপুঞ্জের সদস্যদের আস্থা তাদের সনদে পুনর্ঘোষণার কথা বিবেচনা করে ;

মানবিক অধিকারের এই নিখিল বিশ্বব্যাপী ঘোষণা যে, 'মানুষে মানুষে কোন বৈষম্য নেই' এই নীতিরই স্বীকৃতি এবং স্বাধীনতা সকল মানুষের জন্মগত অধিকার ও মর্যাদায় সকল মানুষই সমান এবং জাতি, বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষই স্বাধীনতা ও মানবিক অধিকারগুলির সমান অংশীদার এই সত্যেরই যে প্রকাশ্য ঘোষণা সে কথা বিবেচনা করে ;

বিভিন্ন সময়ে গৃহীত জাতিসংঘের নানা প্রস্তাব, ঘোষণা, সভা-সম্মেলনের সুপারিশ এবং সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিযুক্ত বিশেষ সংস্থা সমূহের সুপারিশগুলি বিশ্লেষণ করে ;

জাতিসংঘের সনদ, বিশ্বব্যাপী মানবিক অধিকার ঘোষণা, মানবিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা, জাতিসংঘের বিভিন্ন কমিটি ও এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিশেষ সংস্থাগুলির প্রচেষ্টা এবং সমান অধিকার অর্জনের ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগতি সত্ত্বেও নারী সমাজের প্রতি যে দারুণ বৈষম্য আজও চলে আসছে এই উদ্বেগজনক বিষয়টি মনে রেখে ;

নারীর প্রতি বৈষম্য, মানবিক অধিকার এবং পরিবার ও সমাজের কল্যাণের পরিপন্থী, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে নারীর অংশগ্রহণ এই বৈষম্য ব্যাহত করে এবং দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর কর্মক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা স্বরূপ একথা বিবেচনা করে ;

দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মেয়েদের বিরাট অবদান এবং পরিবারে বিশেষ করে সন্তান লালন পালনে তাদের ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে ;

দেশের সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ বিকাশ, জগতের কল্যাণ ও বিশ্বের শান্তির জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সর্বাধিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে ;

আইনে ও কার্যক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের নীতির সর্বজনীন স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ;

জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ অনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণাপত্র সাধারণ্যে প্রকাশ করছেন :—

১নং ধারা

নারীর প্রতি বৈষম্য, পুরুষের সাথে নারীর সমান অধিকার অস্বীকার অথবা সীমিত করা মূলগতভাবে অন্যায় ও মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে এক মহা অপরাধ।

২নং ধারা

মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক-বর্তমান আইন কানুন, প্রথা, বিধিনিয়ম ও অভ্যাসগুলির অবসানের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পুরুষের সাথে নারীর সমানাধিকারকে উপযুক্ত আইন দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে সুরক্ষিত করে তুলতে হবে এবং বিশেষ করে ;—

ক) সমানাধিকারের নীতিকে সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করে অথবা আইন দ্বারা সুনিশ্চিত করতে হবে।

খ) মেয়েদের প্রতি বৈষম্য অবসানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ও তার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা কর্তৃক সমগ্র বিশ্বের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে

অনুমোদন, গ্রহণ এবং যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করতে হবে।

৩নং ধারা

মেয়েরা নিকৃষ্টতর এই ধারণা থেকে উদ্ভূত প্রচলিত রীতি নীতি, অভ্যাস-আচরণগুলির অবসান ঘটান ও কুসংস্কারগুলিকে সমূলে উৎপাটন করার দিকে জাতীয় ভাবনা-বাসনাকে পরিচালিত করা এবং এবিষয়ে জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪নং ধারা

পুরুষের সঙ্গে সমান ও পক্ষপাতশূন্য শর্তে মেয়েদের জন্য নিম্নলিখিত অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করার মত যথাযথ সকল ব্যবস্থা নিতে হবে :—

ক) সমস্ত নির্বাচনে ভোটদান ও গণভোটে নির্বাচিত সকল সরকারী সংস্থায় নির্বাচিত হওয়ার অধিকার।

খ) সমস্ত গণভোটে ভোটদানের অধিকার।

গ) সরকারী দপ্তরের ভার গ্রহণ ও সকল সরকারী অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার অধিকার। প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত আইনের দ্বারা এই ধরনের অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করতে হবে।

৫নং ধারা

একজন বিদেশীকে বিবাহ করা মাত্র কোন নারীকে জাতিহীন ঘোষণা করে অথবা তার স্বামীর জাতিত্ব তার ওপর আরোপ করে সেই নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যাতিরেকেই তার জাতিত্বকে আঘাত করা যাবে না। নিজের জাতিত্ব বজায় রাখা, পরিবর্তন করা বা নতুন জাতিত্ব গ্রহণের ব্যাপারে নারীর পুরুষের মত অধিকার থাকবে।

৬নং ধারা

১। যে কোন সমাজের প্রাথমিক সংগঠন পরিবার। সেই পরিবারগুলির ঐক্য ও সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ না করে বিবাহিত, অবিবাহিত নির্বিশেষে সকল নারীর নাগরিক আইনের ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নিশ্চিত করার

জন্য সমস্ত রকমের উপযুক্ত ব্যবস্থা বিশেষ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই আইনের মধ্যে বিশেষভাবে থাকবে :—

ক) সম্পত্তি অর্জন, পরিচালনা, ভোগ, দান ও উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করার অধিকার ; বিবাহের সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিও এই আইনের আওতায় পড়বে।

খ) আইনের বলে সমানাধিকার অর্জন ও তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ।

গ) ব্যক্তিগত গতিবিধির ব্যাপারে পুরুষের সাথে সমান অধিকার।

২। স্বামী-স্ত্রীর সমান মর্যাদার নীতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :—

ক) পতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষের মতই স্বাধীন মতামতের অধিকার থাকবে এবং পাত্রী স্বেচ্ছায় ও সম্পূর্ণ সম্মতি দেওয়ার পরেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

খ) বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার থাকবে। সকল ক্ষেত্রেই শিশু সন্তানদের স্বার্থই সর্বাগ্রগণ্য হবে।

গ) শিশু সন্তানদের ব্যাপারে পিতামাতার সমান অধিকার ও সমান দায়িত্ব থাকবে এবং সর্বক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থই সর্বাগ্রগণ্য বিবেচিত হবে।

৩। বাল্য বিবাহ এবং বয়ঃসন্ধির পূর্বেই মেয়েদের বিবাহের বাগদান নিষিদ্ধ করতে হবে। বিবাহের একটি ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত করার জন্য আইন-প্রণয়নসহ সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারী রেজিস্ট্রীতে বিবাহ নথিভুক্ত করা আবশ্যিক গণ্য করা হবে।

৭নং ধারা

দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত মেয়েদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ধারাগুলি রদ করা হবে।

৮নং ধারা

আইন-প্রণয়নসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে নারীর পতিতা-

বৃত্তিকে স্বার্থ সিদ্ধির কাজে ব্যবহার ও নারীঘটিত সবরকম ব্যবসা প্রতিরোধ করতে হবে।

৯নং ধারা

বিবাহিতা অবিবাহিতা নির্বিশেষে বালিকা ও নারীর জন্য সকল স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে পুরুষের সাথে সমান অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে :—

ক) বিশ্ববিদ্যালয়, বৃত্তি-শিক্ষা, কারিগরী ও পেশাগত বিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ ও পাঠের সমান সুযোগ ;

খ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সহশিক্ষা কেন্দ্র হোক, চাই নাই হোক, মেয়েদের জন্য পুরুষের মত একই পাঠক্রম নির্বাচনের সুযোগ, একই রকম পরীক্ষা ব্যবস্থা, সমস্তরের গুণসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী, বিদ্যালয় গৃহ ও সম-মানের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) ছাত্রবৃত্তি ও পাঠের সহায়ক অন্যান্য অনুদান লাভের সমান সুযোগ ;

ঘ) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী সহ ধারাবাহিক শিক্ষার সমান সুযোগ ;

ঙ) পারিবারিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত শিক্ষাপ্রদ সংবাদ প্রাপ্তির অধিকার।

১০নং ধারা

১। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সকল নারীই যাতে সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতে পারে এবং বিশেষ করে নিম্নের বিষয়গুলির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :—

ক) বিবাহিতা অবিবাহিতা নির্বিশেষে সকল নারীর বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ, কর্ম সংগ্রহ, পছন্দমত বৃত্তি ও জীবিকা অবলম্বন এবং পেশাগত উন্নতি অর্জনের অধিকার ;

খ) একই রকম কাজে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক ও সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকার ;

গ) সবেতন ছুটি, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা এবং বেকারী,

অসুস্থতা, বার্ধক্য ও অন্যান্য কারণে কাজে অক্ষমতার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ;

খ) পুরুষের সঙ্গে একই নিয়মে পারিবারিক ভাতা লাভের অধিকার।

২। বিবাহ ও মাতৃত্বের কারণে বৈষম্যমূলক ব্যবহার বন্ধ করা ও সক্রিয়-ভাবে কাজের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য বিবাহ ও মাতৃত্বের কারণে ছাঁটাই বন্ধ, সবেতন প্রসূতিভাতার ব্যবস্থা ও পুরাতন কাজে ফিরে যাওয়ার সুযোগ এবং শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। মেয়েদের বিশেষ শারীরিক গঠনের দরুণ কয়েক ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখাকে বৈষম্যমূলক আচরণ হিসাবে গণ্য না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১নং ধারা

১। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের নীতি কার্যকর করার জন্য সমস্ত রাষ্ট্রে জাতিসংঘের সনদ ও মানবিক অধিকার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী ঘোষণাপত্রের নীতিগুলি কার্যে পরিণত করতে হবে।

২। অতএব এই ঘোষণাপত্রের নীতিগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করার কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সকল দেশের সরকার, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ্রন্থ পরিচয়

ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ান্‌স—অমর দত্ত। কলিকাতা ১৯৭৩। মূল্য ছয় টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কাল। বস্তুতঃপক্ষে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দকে বাংলার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই যুগের এক মহানায়ক নিঃসন্দেহে ডিরোজিও। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন তরুণ বাংলাকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-সম্ভারের সঙ্গে পরিচিত করেন ডিরোজিও তাঁদের অগ্রগণ্য। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভেই ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গ বাংলাকে স্পর্শ করেছে। তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ সর্বক্ষেত্রে বিশেষ চিন্তার ক্ষেত্রেও মানসিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠে। সেইজন্যই যুক্তি ও বুদ্ধির প্রখর আলোয় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের নব মূল্যায়নে তিনি ব্রতী হন। পরবর্তী কালে শিক্ষক হিসাবেও তিনি তাঁর ছাত্রদেরও বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করবার শিক্ষাই সর্বদা দিয়েছেন। তাই দেখি তিনি ও তাঁর তরুণ শিষ্যবৃন্দ সর্ববিধ কুসংস্কার, প্রাচীন প্রথা ও ধর্মীয় রীতি-নীতি যুক্তির শানিত কুঠারে ছিন্নভিন্ন করতে সর্বদা উদ্যত। তখনকার যুগটাই এই অস্থিরতার যুগ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজ তখন সবেমাত্র 'বণিকের মানদণ্ড' ছেড়ে স্থায়ী ভাবে এদেশে রাজত্ব স্থাপন করেছে। তখন তাদের সামনে শাসন নীতির কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। অথচ এই নবলব্ধ রাজ্যের শাসন-শিক্ষা প্রভৃতি মৌল সমস্যা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্য ইংরাজ মোটামুটি ভাবে প্রচলিত প্রাচীন প্রথার আনুগত্য স্বীকার করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের প্রবল ব্যক্তিত্ব এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূচনা করলো (১৮২৩ খৃষ্টাব্দে)। ইতিপূর্বেই রাজা রামমোহন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় দেশে নতুন চিন্তা ও ভাবধারা প্রচলিত করেছেন। তিনি আত্মীয় সভা স্থাপন করেছেন এবং বাংলায় বেদান্ত ও উপনিষদ অনুবাদ ও প্রচার করে তিনি এক ও

অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার কথা জনসমাজে প্রচার করতে ব্রতী হয়েছেন। অর্থাৎ সমাজজীবনে রাজা এক প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছেন। এই পটভূমিকায় তরুণ ডিরোজিও পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের পরিচিত করতে ব্যস্ত। এই পরিচিতির ফল, বলা চলে, বৈপ্লবিক হয়েছিল। তিনি তরুণ-সমাজের মনে সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি আপোষহীন ঘৃণার সার্থক শিক্ষা দিয়েছেন। ফলে সে যুগে সত্য ও ছাত্র সমার্থক শব্দে পর্যবসিত হয়েছিল। অবশ্য এ কথাও অনস্বীকার্য যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহগ্রস্থ এই নব্য সম্প্রদায় স্বদেশী সভ্যতা ও কৃষ্টিকে অবহেলা করতে দ্বিধা করে নি। সময়ে সময়ে এই সম্প্রদায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে গোঁড়া সমাজের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। তবু এই বাহ্য। ডিরোজিও যে বৈপ্লবিক ভাবধারার সূচনা করেছেন, এ উচ্ছৃঙ্খলতা তারই এক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিনি জ্বালিয়ে ছিলেন কোন গোঁড়া সমালোচকের সাধ্য ছিল না তাকে নির্বাপিত করবার। পরবর্তী যুগে সেই ভাবধারা তার সব ভালো সব মন্দ নিয়ে পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হয়েছিল।

শ্রীঅমর দত্ত তাঁর গ্রন্থে এই যুগনায়কের জীবন ও তাঁর কালের সার্থক রূপায়ন করেছেন। লেখক চারটি অধ্যায়ে ডিরোজিওর জীবন, তার ছাত্র-মণ্ডলীর কথা, ডিরোজিয়ানদের মুখপত্রের কথা ও জ্ঞানোপার্জিকা সভা এবং ত্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ ডিরোজিয়ানদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। এই অধ্যায়ে আমরা ডিরোজিও ও তাঁর কালের ধ্যানধারণার কথা সম্যক জানতে পারি। বেঙ্গল স্পেক্টেটর থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি তুলে লেখক আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। বেঙ্গল স্পেক্টেটরের উদ্ধৃতি থেকে আমরা ইয়ং বেঙ্গলদের পরিণত রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ দেখি। ডিরোজিয়ানদের মুখপত্রগুলির এত বিস্তারিত আলোচনা বোধহয় আগে হয় নি। এ ছাড়া তাঁর গ্রন্থের জ্ঞানোপার্জিকা সভা ও ত্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্পর্কিত অধ্যায়টিও বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূল দলিল ও প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রচুর উল্লেখ থাকায় ডিরোজিও ও তাঁর কাল সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকদের পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। হিউম ও পেইনের মতবাদের আলোচনা করে তিনি ডিরোজিয়ানদের মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি স্পষ্ট করে তুলেছেন। পরিশেষে ডিরোজিওর সাহিত্য প্রতিভার আলোচনা তাঁর গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছে।

তবে হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর পদত্যাগ প্রসঙ্গে ডাঃ এইচ. এইচ. উইলসনের সঙ্গে ডিরোজিওর যে পত্র বিনিময় হয়েছিল অনুবাদের সঙ্গে মূল পত্রগুলি (অন্তত ডিরোজিওর পত্রগুলি) প্রকাশ করা সম্ভব হলে তিনি পাঠকদের বিশেষ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হতেন।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" এতই হৃদয়গ্রাহী এবং এতই বলিষ্ঠ রচনা যে এখনও পর্যন্ত এই পুস্তকের প্রভাব এই বিষয়সংক্রান্ত সমস্ত রচনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তবুও ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের নিয়ে বিশদ, তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে—এটি আশার কথা।

সম্প্রতিকালে, গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টি প্রথম উত্থাপন করেন অধ্যাপক সুশোভন সরকার। কৌতূহলী পাঠক তাঁর রচিত গ্রন্থ Bengal Renaissance and other Essays পাঠ করলেই তাঁর বক্তব্য জানতে পারবেন। সুশোভনবাবুর রচনা তথ্যের দিক থেকে নয়, বিশ্লেষণধর্মিতার দিক থেকে একটি নতুন পথের নিশানা দিয়েছে। শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত বিদ্রোহী ডিরোজিও এই বিষয়ে একখানি সুখপাঠ্য ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক। ডিরোজিও-জীবনী এই পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

শ্রীঅমর দত্ত ডিরোজিওর পাশাপাশি ডিরোজিয়ানদের কার্যকলাপের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সেইদিক থেকে বইখানির একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে।

তদানীন্তন কালের সাময়িক পত্রগুলি—যেগুলি সেযুগের ইতিহাস জানার পক্ষে প্রামাণ্য সূত্র—সেইগুলির তিনি সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। এশিয়াটিক জার্নাল, ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল, বেঙ্গল হরকরা প্রভৃতি পত্রপত্রিকা থেকে তিনি উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। প্রামাণ্য-সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলেই এই বইয়ের মূল্য সমধিক।

তদানীন্তন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলির পাতায় ডিরোজিও ও ডিরোজিওপন্থীদের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে সেটি ধৈর্য সহকারে তিনি অনুসন্ধান করেছেন।

আজ পর্যন্ত ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানদের নিয়ে যেটুকু গবেষণা হয়েছে তাতে শ্রীঅমর দত্তের রচিত বইখানি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চিত্রলেখা ভট্টাচার্য

লেখার বিষয়*

সুশীল জানা

'ক্যালিগ্রাফী'র এক অধ্যাপক তাঁর ডায়রীতে সাহিত্য-শিল্প প্রসঙ্গে একটা বেশ মজার মন্তব্য করেছিলেন। মন্তব্যটি এই :

> So-called art feeds chiefly on the presentations of different kind of crimes, and I have noticed that the meaner the crime the more greedily is the book read and the more praised is the description of that crime. All things considered, the interest of art is an interest for criminality. The unwholesome effect of art on the young is obvious from this.

অধ্যাপক ভদ্রলোকের কাছে শিল্প-সাহিত্যের তাৎপর্যটা দাঁড়িয়েছে এই যে, "তথাকথিত আর্ট বা শিল্প প্রধানত পরিপুষ্ট হয় নানা ধরনের অপরাধের রূপায়ণে এবং বর্ণনায়। তাছাড়া এ-ও আমি লক্ষ্য করেছি যে, অপরাধ যত জঘন্য হবে—বই ততো বেশী লোকে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে এবং এই অপরাধের বর্ণনা ততো প্রশংসিত হবে। এই সব বিবেচনা করে এই দাঁড়ায়—শিল্পের প্রতি ঔৎসুক্য হলো অপরাধ-শ্রবণতার প্রতি ঔৎসুক্য। এ থেকে অল্পবয়সীদের ওপর শিল্পের অসুস্থ এক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ গোচর।"

উপরোক্ত অধ্যাপকের ব্যক্তিগত ডায়রী থেকে মন্তব্যটি উদ্ধার করেছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি। মন্তব্যের তারিখটা আজ থেকে প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বের। তবু বলতে দ্বিধা নেই, ওই মন্তব্যের প্রথম অংশটুকু হাল-ফিলের বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত সৃজনী-শিল্পে দিব্যি খেটে যায়। তারা সব Best seller —খুব কাটতি ; পাঠক মহলকে আকর্ষণ করবার জন্য অঢেল অর্থ ব্যয়ে ওদের

---

* সৌরী ঘটকের লেখা "কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প" প্রসঙ্গে। দাম বারো টাকা। প্রকাশক—মনীষা গ্রন্থালয়

বিজ্ঞাপনও চটকদার—সেখানে 'অভিনব' ও 'বিস্ময়কর' জাতের শব্দাবলীর ছড়াছড়ি। ওদের 'অভিনবত্ব' এতখানি যে, শতাব্দী-কাল পূর্বেও এক ভদ্রলোক ওই জাতের সৃষ্টি সম্পর্কে একটা খোলা-মেলা মন্তব্য রেখে গেছেন। এবং ওর 'বিস্ময়কর' অংশটা আমাদের কাছে এই যে—বহুবা উন্নত বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও ওই বস্তা-পচা মাল নূতন বলে চলে! তবে কিনা মাংস পচে উঠলে ধূর্ত রাঁধুনী পেঁয়াজ গরম মশলা দেয় ঠেসে! এ কথা স্বীকার করতেই হবে—ও জাতের শিল্পীরা সেই ধূর্ত রাঁধুনী। পরিবেশন-কৌশল ওদের স্বভাব-নৈপুণ্য, সেটা অবশ্যই 'প্রতিভা' নয়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রতিভা' নামক শব্দটা জীবন-দৃষ্টির নবীনত্বে—নূতনত্বে অর্থপূর্ণ, মানব-হৃদয় রহস্যের ব্যাপকতা ও গভীরত্বের দিকে তার অভিধান। অতি পরিচিত সংসার-সীমা, সমাজ-বেষ্টন ও চিরাচরিত মানবীয় মূল্যবোধগুলির সীমাকে তা বাড়িয়ে দেয়। জীবন-দৃষ্টির এই নবীনতার সঙ্গে যখন পরিবেশন-কৌশলের নৈপুণ্য এসে মেশে—তখন সোনায় সোহাগা। Content এবং form—বিষয় এবং রচনা-নৈপুণ্য, ভাব এবং ভাষা, অব্যক্ত এবং ব্যক্ত তখন অপরূপ এক সামঞ্জস্যে রস-মূর্তি গ্রহণ করে।—জগতের স্মরণীয় শিল্প-স্রষ্টারা সেই পথেই সিদ্ধিলাভ করেছেন—কিন্তু সিদ্ধির পূর্বেকার যে মানস-যন্ত্রণা, নিজের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কারের যে শ্রম, সাধনা ও শিক্ষা—সে এক অলিখিত ইতিহাস। হয়তো তা বর্ণনার অতীত! তবে তা সত্য। ইতিহাসের মতই সত্য। অনুভব করি এবং বিশ্বাস করি—বাংলা সাহিত্যে তেমন সৃষ্টি আবার সম্ভব হবে। এবং সম্ভব হবে হয়তো তথাকথিত সমালোচকদের অবহেলা এবং ভালো-মন্দ-বোধহীন নির্বিকার-চিত্ত পাঠক-কুলের অজ্ঞতা ও অনাদরের ভেতর দিয়েই।

এমন ঘটনার সম্ভাব্যতার লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্যেই। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা—এমন কি, সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার এত দ্রুত অবক্ষয় ও অবলুপ্তি মনে হয় আর কখনো ঘটে নি। ভালো কিছু নয় কিন্তু সমস্ত মন্দের একটা অন্ধকার পাহাড় নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভেঙে পড়েছে আমাদের মাথায়, একটা মানুষের সৃষ্টি করা দুর্ভিক্ষ শ্মশানকেও শ্মশান করে দিয়ে গেছে, দেশ ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে—গ্রাম-গড়া, ঘর-গড়া মানুষের জাঙাল চিরকালের জন্য নেমে এসেছে পথে। এরই মধ্যে মানুষ লড়েছে—মরেছে—আবার জন্মেছে। সে কি মরবার জন্য—না বাঁচবার জন্য? এর মধ্যে

থেকে নূতন জীবন-দৃষ্টি জন্মাবে না তো জন্মাবে কোথায় ? আমাদের জীবনের—সমাজের বাতাবরণে তা ঘুরে বেড়াচ্ছে অলক্ষ্যে—সেখানে আমাদের শিল্পীর সাধনা হবে হয়তো মহাতান্ত্রিকের মতো স্তূপীকৃত মৃত্যুর পাহাড়ের ওপর বসে। সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটিয়া লেখক ও প্রকাশককুল সেই শতাব্দীকাল পূর্বের পাপকে নূতন ক'রে যতই পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করুক—বাঙালী বুদ্ধি-জীবীরা একদিন বুঝবেই—আবর্জনার মত ওই সাহিত্য জীবনেও কিছু দেয়নি, জাতিকেও কিছু দেয় নি।—গোর্কির ভাষায় বলতে হয়: 'জীবনের কুৎসিত জিনিসগুলোকে ধরে রাখার এবং মেলে ধরার কাজ একটা নোংরা দায়িত্ব।'

সে নোংরা দায়িত্বকে ঝেড়ে ফেলে একটা নূতন জীবন-দৃষ্টির সন্ধান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকেই আমাদের সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের মধ্যে দিয়ে তা প্রবলতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে প্রবলতার মধ্যে কোথায় একটা ফাঁক ছিল—ফাকী ছিল। সমাজের নানা-মুখি ভাঙনকে কোনো কোনো শিল্পী কেবল মাত্র নূতন একটা বিষয় মাত্র হিসেবেই দেখেছে—এবং সাময়িক উত্তেজনায় তাকে রূপ দিয়েছে। প্রতিভার যে সাধনা, শ্রম, শিক্ষা ও বিশ্বাস প্রয়োজন—তার অভাব ছিল এবং অভাব ছিল বলেই অনেকে সে কন্টকময় পথ থেকে সরে গেছে।

আবার নূতনেরও আগমন ঘটেছে। তার হোক অবহেলা, হোক অনাদর—জাতীয় জীবনে তার দাবী আছে বলেই এমনটা হতে পেরেছে। এ পথের সাধনায় আজ অর্থ নেই, বহু প্রচারিত কাগজে কাগজে প্রচার নেই—শিরোপা নেই—কিন্তু নবীন সাহিত্য-কর্মীর দল তবু আসে। সৌরি ঘটক তেমনি একজন নবীন সাধক। তাঁর গল্প সংগ্রহ 'কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প' আমাদের আশাকে উত্তেজিত করে।

মোট তেরটি গল্প সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বিচিত্র বিষয়সমূহের মধ্যে লেখক রূপায়িত করতে চেয়েছেন শুধু জীবন নয়—জীবনের নব মূল্যায়ন। নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনার তরঙ্গাভিঘাতে জীবনের এবং অনাগত এক সমাজের নেতিবাচক নয়, কঠিন ইতিবাচক একটা উপলব্ধি যে ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে—সৌরিবাবু তাকে শিল্প-রূপ দিয়েছেন। এদিক থেকে বোধ করি সর্বাপেক্ষা সার্থক তাঁর 'অরণ্যের স্বপ্ন' গল্পটি।

তাঁর সন্ধানের ধারা সমাজের নানা স্তর ও জীবনের ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে। জীবনের নূতন মূল্যবোধের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে পার্টি-কর্মী, দম্পতি, গ্রামের তথাকথিত মুখ্যু গ্রাম্য মেয়েরা, কোয়াক ডাক্তার, হকার। বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে চিত্রিত একটি মায়ের ছবি নির্মম এক আলেখ্যে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। সব মিলে বিষয় তাঁর নূতন—দৃষ্টিভঙ্গী ভবিষ্যতের জীবনায়ণের—এবং আশা করব, প্রয়োগ-নৈপুণ্য তাঁর আরও ক্ষুরধার হবে।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আঘাত হানো

আমাদের দেশে সম্প্রতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা বর্তমান সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছিল। তাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য দেশে জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করা হয়েছে। তাদের চক্রান্ত যে সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে দেশবাসী আশ্বস্ত বোধ করবে।

এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির শ্রেণীভিত্তি কি তা দেখলেই তাদের এই চক্রান্তের স্বরূপ বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে। এরা দেশের মধ্যে সেই শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি যারা নানাভাবে দেশের মানুষের রক্তশোষণ করছে। এরা জমিদার, জোতদার, একচেটিয়া পুঁজিপতি, কালোবাজারী মুনাফাখোরদের প্রতিনিধি। এরা যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে দিয়ে কাজ করছে—যেমন জনসংঘ, স্বতন্ত্র, কংগ্রেস (ও) প্রভৃতি—তারা এই শ্রেণী স্বার্থের পৃষ্ঠাপোষকতা করছে।

এই রাজনৈতিক দলগুলি যেহেতু শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি, তাই দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের সন্দেহের চোখে দেখে। তাই তারা ভারতের রাজনীতিমঞ্চে সক্রিয় হলেও তাবৎ জনসাধারণের কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য হয় নি।

তাদের এই দুর্বলতা সম্পর্কে এই শক্তিগুলি সচেতন। তাই তারা সম্প্রতি জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে একটি "বামপন্থী ইমেজ" সৃষ্টির জন্যে বিশেষ ব্যগ্র। জয়প্রকাশ নারায়ণ এককালে বামপন্থী নেতা হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁকে নেতা হিসাবে পেয়ে এরা বিশেষ খুশী।

জয়প্রকাশ নারায়ণের 'বামপন্থী ইমেজ' কাজে লাগিয়ে তারা বামপন্থী কয়েকটি দলকে—যেমন সোশ্যালিস্ট পার্টিকে, নকশালপন্থীদের, এমনকি কিছু পরিমাণে সি. পি. এমকেও তাদের পক্ষ টেনে নামাতে সক্ষম হয়েছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের কর্মসূচী পর্যা-

লোচনা করলেই দেখা যাবে—দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার স্বার্থকে সুরক্ষিত করাই এর উদ্দেশ্য। যারা একান্ত দুর্নীতিপরায়ণ তারাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের আওয়াজ তুলেছে। যারা প্রতিবিপ্লবী তারাই "সর্বাত্মক বিপ্লবের" কথা বলে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল অভিসন্ধি ঢাকতে চায়। ভারত সরকার যে প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে—যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্র, ভোট-নিরপেক্ষতা, সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রভৃতি—এইগুলিই তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য।

তারা প্রকাশ্যে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহকে সংগ্রামের মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করলেও গোপনে আর. এস. এস, জামায়েত-ই উলেমা, আনন্দমার্গ প্রভৃতি যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করে চলেছে তাকে সমর্থন করে। ভারত সরকার আর. এস. এস, জামায়েত ই-উলেমা, আনন্দমার্গকে বে-আইনী ঘোষণা করে ঠিক কাজ করেছে।

শুধু তাই নয়, জয়প্রকাশের এই আন্দোলনের একটি শক্ত আন্তর্জাতিক ভিত্তি রয়েছে। সারা দুনিয়ায় একচেটিয়া পুঁজির যে জোট রয়েছে—যার মধ্যমণি হল আমেরিকার ধনিকগোষ্ঠী—জয়প্রকাশ আন্দোলন তাদের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য পাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের যে বিশ্ব ষ্ট্র্যাটেজি রয়েছে এদের কার্যকলাপকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ভুল হবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে বিশ্বের বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদ সি. আই. এ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ, যে-সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সরকার রয়েছে তাদের পতন ঘটাতে চায়। এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সরকারগুলির ভিৎ নাড়িয়ে দেওয়া, তাদের পতন ঘটানো অস্থিতিশীল করার (de-stabilasation) মার্কিন নীতির লক্ষ্য। এই অস্থিতিশীল করার নীতি সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে চায়। তারা চায় ভারতে ইন্দিরা সরকারের বদলে সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল একটি প্রতিক্রিয়াশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা ইন্দিরার বিকল্প হিসাবে জয়প্রকাশ নারায়ণকে দেখতে চায়।

এই কারণে আমরা জয়প্রকাশ নারায়ণ পরিচালিত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করি। এই আন্দোলন বিশ্বব্যাপী একচেটিয়া পুঁজির আশীর্বাদ পুষ্ট, এই আন্দোলন ভারতে একান্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির ক্ষমতাদখলের মহড়া ছাড়া কিছু নয়।

ভারত সরকার এই আন্দোলন দমনে, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-

গুলিকে দমিত করার জন্যে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করছে আমরা তাকে পূর্ণ সমর্থন করি।

ভারত সরকার যে কুড়ি দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ঘোষণা করেছে, যাতে সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা লাঘবের একটি প্রচেষ্টা রয়েছে, আমরা তাকেও স্বাগত জানাই। আমরা দাবি করি এই কর্মসূচীটি যাতে ঘোষণায় পর্যবসিত না হয়ে কাজে প্রযুক্ত হয় অবিলম্বে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ভারত সরকারের উপরোক্ত পদক্ষেপগুলিকে অভিনন্দন জানাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কথা বলতে চাই যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকে যদি সমূলে উৎপাটিত করতে হয় তাহলে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিতের আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। দেশের ভিতরে সামন্তপ্রথা ও একচেটিয়া পুঁজির মূল উৎপাটিত করতে না পারলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেও এই কাজে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্র—এই ত্রিবিধ শোষণব্যবস্থার মূলে আঘাত করে আমূল সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধনই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার মূলোৎপাটনের একমাত্র উপায়—এই কথা আমাদের আজ বিশেষ করে মনে রাখার সময় এসেছে।

অরুণাচল বসু

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের আবাল্যসুহৃদ কবি অরুণাচল বসুর অকাল প্রয়াণ অত্যন্ত মর্মবিদারক ঘটনা। কিশোর বয়সেই তিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন চল্লিশ দশকের গোড়ায়। গণসংস্কৃতি ছিল তাঁর কবিতায় ও আলোচনায় এই গণমুখিনতার স্পষ্ট ছাপ ছিল, যা তাঁকে প্রতিষ্ঠা-প্রবণতার কলুষ থেকে মুক্ত রেখেছিল।

জীবনের শেষ দশকে তিনি লোক সংস্কৃতির আন্দোলন সংগঠিত করছিলেন। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের উল্লেখ্য কবিতাগুলি সংগীতায়িত করার কাজেও তিনি পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। নানা দিক থেকে তাঁর জীবনাবসান অপূরণীয় ক্ষতি। মূল্যায়ন-এ তাঁর কবিতা, তাঁর অনূদিত কবিতা অনেকবারই বেরিয়েছে। 'মূল্যায়নের'-এর কাছে এ ক্ষতি সমভাবে মর্মান্তিক।

07 AUG 1975

এই প্রতীক কী এবং কেন?

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স্‌— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌-এর কায়মনোবাক্যে নিজেকে ঢেলে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ঈ-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্‌ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে সুলভে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌
আপনার সেবায়

ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ লিমিটেড, কলিকাতা-১৬

27 AUG 1975

EIPC-PR-10 BEN

চলায়ন

- চেখভ ও গোর্কির শিল্পদৃষ্টি
- বাংলার নবজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন

- পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের "নতুন পর্যায়"
- ভারতে অ-একচেটিয়া পুঁজির সাম্প্রতিক বিকাশ

- আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সম্মেলন—পাটনা
- প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ

আলোচনা

- আগস্ট আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৮২ মূল্য ঃ দেড় টাকা

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কর্তৃক প্রকাশিত

দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর

মূল্য : পাঁচ টাকা

চিন্তা-ভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও অন্যান্য যাঁদের বিশিষ্ট অবদান আছে, তাঁদের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধাদি এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক এবং সামাজিক পুনরুজ্জীবনে গভীরভাবে আগ্রহান্বিত তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি মূল্যবান বলে বিবেচিত।

●

পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি

মূল্য : সাড়ে পাঁচ টাকা

লোক-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রী, গবেষক ও অনুরাগীদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক সংকলন গ্রন্থ

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড, কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ৩১১২।৭৫

MADAM CAMA : MOTHER OF INDIAN REVOLUTION 5·00

by Dr. Panchanan Saha

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ বছর 7·50

তুষার চট্টোপাধ্যায়

কমিউনিস্ট : সম্পাদক গোপাল হালদার 6·00

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ। কয়েকটি পর্বে নিবদ্ধ কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস। পার্টি-প্রতিষ্ঠার আগের ও পরের কমিউনিস্ট পরিচালিত পত্র-পত্রিকার তালিকা। প্রবন্ধ ও রিপোর্টাজের ফটোস্ট্যাট সহ পুনর্মুদ্রণ।

লিখেছেন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ, আব্দুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী ও আরও অনেকে।

মনীষা গ্রন্থালয় : কলিকাতা-১২

মূল্যায়ন

১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
কার্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ-মাঘ
১৩৮২

সূচী

চেখভ ও গোর্কির শিল্পদৃষ্টি / দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১
বাংলার নবজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন / চিত্রলেখা ভট্টাচার্য ১৭
পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের "নতুন পর্যায়" / পর্যবেক্ষক ৩০
প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ / সুনীল মিত্র ৪৭
ভারতে অ-একচেটিয়া পুঁজির সাম্প্রতিক বিকাশের একটি চিত্র / চারুব্রত রায় ৫৫
আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন—পাটনা / নৃপেন ভট্টাচার্য ৬৪

আলোচনা

আগস্ট আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি / তুষার চট্টোপাধ্যায় ৭২

পল রোবসন ৮১

প্রচ্ছদ : অমূল্য দাস

সম্পাদক
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
হরহরি কবিরাজ

পবিত্র রায় কর্তৃক ১০ বঙ্কেল রোড, কলিকাতা-১৯ থেকে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০।৬ কাউতলা রোড, কলিকাতা-১৭ থেকে মুদ্রিত।

Problems Of National Liberation

Vol. 1 No. 2

Contents :

- Revolt of Titu Mir
- Multinational Corporations
- National Question in Darjeeling
- Sunderban : An Observation
- Features of Capitalism in India after 1969
- Russian Revolution (1905-07) : Lessons for India
- China on Lenin's Work
- Discussion : Non-Capitalist Path in India

Price : Rs. 3/-

Available at :

Manisha Granthalaya

4/3B, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

For all your transport needs to Assam & Tripura

Contact :

M/S. AIR LIFT

91, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-14

Phone : 24-9174

চেখভ ও গোর্কির শিল্পদৃষ্টি

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের অক্টোবর বিপ্লব পর্যন্ত যে দুজন নাট্যকারের নাটক রুশ থিয়েটারের রূপান্তর ঘটায় তাঁরা হলেন আন্তন পাবলোভিচ চেখভ ও ম্যাক্সিম গোর্কি। দুজনই তাঁদের সমকালীন রুশ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাটক রচনা করেছেন এবং উভয়েই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। তবু দুজনের শিল্পরীতিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য বিদ্যমান। চেখভ তৎকালীন রুশ দেশের সামাজিক কাঠামোতে ও জীবনের পৌনঃপুনিকতায় বিতৃষ্ণ হয়ে আগামী দিনের এক সুন্দর স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু সেই আগামী দিন কাদের হাতে বা কারাই বা সেই ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে সে সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট চেতনা, দৃঢ় প্রত্যয় বা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নেই। গোর্কি জানতেন কারা সেই ভাবীকালের অগ্রদূত। আর আগামী দিনে দেশের ভাগ্য গড়ে তুলবার মূল দায়িত্বই বা নেবে কারা। এক কথায় বলা যায়, চেখভ বলেছেন—"হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা।" আর গোর্কি "হেথা নয়" বলেও "অন্য কোথা" তাও দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্রমিক, শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে চেখভের অপরিসীম দরদ ছিল। তাদের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত জীবনের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতিরও অভাব ছিল না। বুর্জোয়া মতাদর্শ ও প্রথার প্রতি ছিল তাঁর তীব্র ঘৃণা। কিন্তু তার পরিবর্তে কি হওয়া উচিত বা কি আসছে সে সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল বলেই সে সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীও দেখা যায় না চেখভের সাহিত্যকর্মে। চেখভের মধ্যে critical realism বা সমালোচনাত্মক বাস্তবতারই প্রাধান্য দেখা যায়। বুর্জোয়া সমাজের অসঙ্গতি ও অসারতা এবং সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের শূন্যগর্ভতা তিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী যে একটা অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে; ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার এক দুর্জয় সংকল্প যে তাদের রয়েছে, তা তিনি দেখতে পান নি। আগামী দিনের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছেন; কিন্তু যাদের সেই পদধ্বনি তাদের তিনি দেখতে পান নি। গোর্কি তাদের দেখেছিলেন ও চিনেছিলেন। Proletarian

humanism বা সর্বহারার মানবতাবাদে দৃঢ়প্রত্যয় থেকেই গোর্কির সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি এসেছিল। Critical realism-এর বৃত্তে থেকেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি তিনি।

মূলত critical realist হলেও চেখভের শিল্পকর্মে তাঁর সৃজনশীল মনটি যে অনুপস্থিত এমন নয়। পরিবর্তনে ও ভবিষ্যতে তাঁর প্রত্যয় থাকায়ই তা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সময়ে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, চেখভের বহু ছোট গল্পে ও তাঁর নাটকগুলিতে তার প্রতিফলন দেখা যায়। বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে সেসব বুদ্ধিজীবী খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলেন না। তাঁরা উপলব্ধি করতেন, বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাটা সংস্কৃতির প্রতিকূল আর বুর্জোয়াদের হয়ে যাঁরা সংস্কৃতির জগতে প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরাও অচল। কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসার বৈপ্লবিক পথটাও সেসব দ্বন্দ্বক্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীর জানা ছিল না। তাই তাঁরা ছিলেন লক্ষ্যহীন, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। চেখভ তাঁর সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের এই ভাবসংকট অতি সুন্দরভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরা সৎ ছিলেন, তাঁদের মনে প্রশ্ন ছিল—কি করা উচিত? কিন্তু তাঁরা জানতেন না—কি করতে হবে। চেখভ মনে করতেন—এ প্রশ্নের উত্তর একজন বুদ্ধিজীবীকে দিতেই হবে।

গোটা রুশ দেশের দিকে তাকিয়ে তিনি হৃদয়ে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করতেন। তাঁর মনে হতো, দেশের জীবন যেন চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ, যেন একটা জেলখানা, চারদিকে যেন লোহার গরাদ, পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো জীবন তার মধ্যে ছটফট করছে—নেই সুস্থ রাজনীতি, সেই সামাজিক কাজকর্ম। সিলাইদহে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের যেমন দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে একটা নতুন চেতনা ও বোধ এসেছিল, সাখালিনে গিয়ে চেখভেরও তেমনি এক নতুন উপলব্ধি এলো। সেখানে আশপাশের জীবন দেখে তিনি বড়ই বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। চারদিকে শুধু ক্লান্তি অবসাদ আর একঘেয়েমির চিত্র। শিল্পীর দায়িত্ব তিনি নতুন করে উপলব্ধি করলেন। তাই যন্ত্রণাকাতর হয়ে সাখালিন থেকে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে (১৮৯১) চিঠিতে লিখলেন :

> "If I'm a doctor, then what I need is a hospital and patients ; if I'm a writer, then I must live amongst the people..."

এই সময়েই তিনি লেখেন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত গল্প "Ward No, 6", যে গল্প পড়ে লেনিন তাঁর বোন আন্না ইলিইনচকে বলেছিলেন :

> "When I read that story yesterday I simply had the creeps, I could not stay in my room, I had to get up and go out. I felt exactly as if I were locked up in Ward No. 6 myself."

জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার আকুলতা থাকা সত্ত্বে চেখভ কিন্তু এটা দেখতে পান নি যে তারই মধ্যে এমন এক বিপ্লবী শক্তি জন্ম নিচ্ছে যা জনসাধারণকে জীবনের সমস্ত গ্লানি এবং সর্বপ্রকার শোষণ ও পীড়ন থেকে মুক্ত করার জন্যে সচেতনভাবে সংগ্রাম করছে ও এগিয়ে চলেছে ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে। জনতার এই বিপ্লবী অংশের সঙ্গে চেখভের সংযোগ ছিল না। গোর্কির তা ছিল আর তা ছিল বলেই তাঁর কাহিনীগুলিতে সেসব বিপ্লবী চরিত্রকেই নায়ক করে আনতে পেরেছিলেন তিনি। চেখভ ভবিষ্যতের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন, নতুন সাহিত্য ও নতুন চরিত্র সৃষ্টির পথ খুলে দিয়েছিলেন; কিন্তু বিশ্লেষণে যেন একটা নিরপেক্ষ তৃতীয় অবস্থান নেবার চেষ্টা ছিল তাঁর। তখনকার দিনে যাঁরা প্রগতিশীল ও মুক্তমন বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত ছিলেন তাঁদের তিনি কাহিনীর চরিত্র করে এনেছেন, তাঁদের বিচিত্র সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, কিন্তু কারো মধ্যেই যেন তিনি তাঁর মনের মতো এমন কাউকে খুঁজে পান নি যে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে কোনো প্রত্যয়িত নায়ক দেখতে পাওয়া যায় না। তারা তর্ক করে, এ জীবন দুর্বহ তাও বলে, কিন্তু কোন জীবন তাদের কাম্য তারও স্পষ্ট নিশানা নেই তাদের। এই কারণে গোড়ার দিকে চেখভের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত নায়ক না পাওয়ায় একটা বেদনানুভূতি রয়েছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। কিন্তু তিনি নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না বলেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, বর্তমানে না থাকলেও ভবিষ্যতে তেমন নায়করা আসবে যারা বর্তমানটাকে পাল্টে দেবে। তারা কারা তা তিনি দেখতে পান নি বা তাদের কথা বলতেও পারেন নি। তিনি শুধু তাদেরই চিত্র এঁকেছেন যারা যথার্থ নায়ক হবার যোগ্য নয়। গোর্কি কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে এমন সব চরিত্র এনেছেন যারা ইতিহাসের নায়ক ও নিয়ামক; যাদের অনুসরণ করেই সামনের দিকে এগুতে হবে।

চেখভ একদা এক চিঠিতে লিখেছিলেন: "The artist must not set

himself up as a jndge of his characters, but must remain an impartial observer." পরবর্তীকালে কিন্তু তিনি স্রষ্টা হিসাবে এই নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারেন নি। তার কারণও ছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দশকে ও বিংশ শতকের গোড়ায় রুশ দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন সারা দেশের আবহাওয়া মথিত করে তুলেছিল। প্রত্যক্ষ-ভাবে না হলেও গৌণভাবে তার প্রভাব চেখভের মন ও লেখার ওপর পড়াই স্বাভাবিক। মার্কসীয় সাহিত্য ও দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় না থাকলেও যুগের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকা চেখভের মতো একজন সংবেদনশীল লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই শেষের দিকে দেখা যায় তিনি তাঁর চরিত্রগুলির বিচারক এবং স্থানে স্থানে কঠোর বিচারক। তখনকার রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে প্রত্যেকেই চাইতো নিজের মতটাকে খুব জোরের সঙ্গে বলতে আর তার নিজের মতটা যে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করতে। এই দোচ্ছার ভাবটা চেখভের শিল্পীমনটাকে পীড়িত করতো বলেই একদা তিনি বলেছিলেন, কোনো শিল্পীরই তাঁর নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিচারক হওয়া উচিত নয়।

চেখভ যেমন উগ্র মতবাদে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন তেমনি ছিলেন বিবর্তনবাদেরও বিরোধী। অতিহিংসেবীদের তিনি উপহাসই করতেন। যাঁরা বলতেন—ধীরে চলো, তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, যখন সময় আসবে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে, অপেক্ষা করো—তাঁদের তিনি বলতেন, কিসের জন্যে অপেক্ষা করবে সেটা খুলে বলো। যেমন চলছে তেমনই চলতে থাকবে আর একদিন সুখের স্বর্গ হঠাৎ হাতের মুঠোয় এসে যাবে? তাই তিনি তাঁর "গুজবেরিজ" গল্পে ইভান ইভানোভিচ চরিত্রটিকে দিয়ে বলিয়েছেন:

> "You refer to the natural order of things, to the logic of facts, but according to what order, what logic so I, a living thinking individual, stand on the edge of a ditch and wait for it to be gradually filled up, or choked with sand, when I might leap over it or build a bridge over it? And again, in the name of what must we wait? Wait, when we have not the strength to live, though live we must and to live we desire!"

নালাটি ডিঙ্গিয়ে যাবার কথা বলে চেখভ এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, পরিবর্তন আনতে হবে বিপ্লবের পথে, বিবর্তনের পথে নয়। ১৮৯৮ সালে অর্থাৎ ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের মাত্র সাত বছর আগে চেখভের মধ্যে এই প্রত্যয় দেখতে পাওয়া যায়।

শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পর্কে চেখভের ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে জীবনদৃষ্টি থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো শিল্পী প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীন হতে পারে। সে ধরনের স্বাধীনতাকে তিনি মনে করতেন নিকৃষ্টতম পরাধীনতা। তাঁর মতে স্বাধীনতার পথে প্রকৃত অন্তরায় হচ্ছে গোঁড়ামি, রক্ষণ-শীলতা, কুসংস্কার, জীবন ও জীবনসত্য সম্পর্কে ভীতি, নতুনকে গ্রহণ করতে ভয়, ধর্মবিশ্বাস, মধ্যবিত্তসুলভ স্থূলত্ব, অতীতের প্রতি অন্ধ মোহ, কর্তাভজন, শিল্পীর মূল লক্ষ্যের মধ্যে তুচ্ছ ধ্যানধারণার অনুপ্রবেশ অর্থাৎ শিল্পসত্য ও জীবনসত্য থেকে সরে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলো থেকে মুক্ত হওয়াকেই তিনি বলতেন শিল্পীর স্বাধীনতা। চেখভের আজীবন সাধনা ছিল এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া। বাস্তব বহির্ভূত জল্পনাকল্পনা ও প্রতিক্রিয়াশীল উদ্ভট চিন্তাকে তিনি সর্বদা পরিহার করে চলতেন। তিনি মনে করতেন স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পথে এগুলো বাধা। তাঁর দৃষ্টি ছিল ভবিষ্যতের দিকে।

ঊনবিংশ শতকটা হচ্ছে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারের যুগ। বুর্জোয়া জগতের কোনো বড়ো লেখকই বিজ্ঞানের এই বিজয় অভিযানকে তাঁদের সাহিত্যে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁদের কেউ বা সুস্পষ্টভাবে, কেউ বা খানিকটা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে কোটি কোটি মানুষের পাঁজর ভেঙেই গড়ে উঠেছে বুর্জোয়া সভ্যতার ইমারত ; যারা দুনিয়ার প্রভু হয়ে বসেছে, বিজ্ঞানের সাফল্যগুলো তাদেরই আরো সৌভাগ্য বাড়াবার কাজে লাগছে ; মানুষকে আরো শোষণের সুযোগ পাচ্ছে তারা এগুলোর সাহায্যে। এ থেকে বুর্জোয়া জগতের শিল্পী-সাহিত্যিকরা এক নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন যে বিজ্ঞান শয়তানের হাতের কাঠি।—বুর্জোয়া সভ্যতার চরম বিকাশ হলে তার চিত্রটা কি দাঁড়াবে কার্ল মার্কস তাঁরই রূপরেখা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> "The bourgeois period of history is called upon to create a material basis for the new world. Only when the great social revolution has mastered the achievements of the

bourgeois epoch...will human progress cease to resemble the atrocious heathen idol which would only drink nectar from the skull of a murdered man."

পুঁজিবাদের বলি লক্ষ লক্ষ মানুষের মাথার খুলির ওপর যে বুর্জোয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছে তা থেকে মানবদরদী শিল্পীরা কখনো অমৃত পান করতে পারেন না। তাই বুর্জোয়া জগতের শিল্পী-সাহিত্যিকদের চোখের সামনে বিজ্ঞানের বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে দেখেও তা থেকে তাঁরা কোনো শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা পান নি। তাঁদের কাছে বসন্তটা শুধু রোদনভরা, বৃক্ষের শাখায় শাখায় নবীন পত্রপুষ্পের উন্মেষ ও সঞ্জীবতা তাঁদের চিত্তে কোনো শিহরণ জাগায় নি। বুর্জোয়া সভ্যতার সাফল্যগুলোকে তুলে ধরার চেষ্টা যদি কোনো লেখক করেও থাকেন, তবে তাঁকে শুধু বুর্জোয়া কাঠামোটার পক্ষে ওকালতিই করতে হয়েছে। একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর লেখকরাই তা করতে পারেন। কোনো সৎ ও বিবেকবান বড়ো লেখকই শয়তানের হয়ে ওকালতি করতে ঘৃণা বোধ করেন। বুর্জোয়া সমাজে সৎ শিল্পীদের এটাই সংকট। এই সংকট থেকে মুক্ত না হতে পারলে কোনো বড়ো শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যেসব শিল্পী ও চিন্তাবিদ বিপ্লবী আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কেবল তাঁরাই বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজ্ঞানের সাফল্যগুলি থেকে ধনিকগোষ্ঠী আপাত ফসল তুললেও শেষ পর্যন্ত জনসাধারণই তার দ্বারা লাভবান হবে। উনবিংশ শতকে রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলোর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে সেখানকার বিপ্লবী গণতন্ত্রী চিন্তাবিদ বেলিনস্কি, চেরনিশেভস্কি, নেক্রাসফ ও শেদ্রিন তাঁদের লেখার দ্বারা বিজ্ঞানের এই ধনাত্মক দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছিলেন।

যদিও শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা চেখভের উপলব্ধিতে ছিল না বা তাঁর যুগের ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি কোনভাবেই সংযোগ রাখেন নি, তথাপি বিজ্ঞানের সাফল্যসমূহ ও সভ্যতার অগ্রগতির প্রতি তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল বলেই শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও সশ্রদ্ধ। তখনকার দিনের প্রগতিসম্পন্ন গণতান্ত্রিক সৃজনশীল বুদ্ধিজীবীদের তিনি ছিলেন একজন যথার্থ প্রতিনিধি। গোড়ার দিকে লিও তলস্তয়ের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তলস্তয় যখন সভ্যতাকেই বর্জন করলেন তখন চেখভ তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। ১৮৯৪ সালে চেখভ লিখলেন :

"Tolstoi s moralizing does not move me any more, in the depth of my heart I am hostile to it. ...I have peasant blood in my veins, and nobody can tell me anything about peasant virtues. I have believed in progress since my childhood...Common sense and justice tell me that there is more love for humanity in electric and steam power than in celebacy and abstaining from eating meat..." (প্রসঙ্গত বলা দরকার লিও তলস্তয় সর্বপ্রকার বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করেছিলেন ও নিরামিষ আহার ধরেছিলেন।)

বৈজ্ঞানিক চিন্তাগুলির অগ্রগতির প্রতি লক্ষ্য রেখে সেগুলো মানবজাতিকে কিভাবে এগিয়ে দিচ্ছে, চেখভের ছিল সেদিকে সতত দৃষ্টি। ডারউইন ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় লেখক। প্রায়ই তিনি বলতেন—এমন লেখক আর হয় না। বিজ্ঞান ও প্রগতির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে চেখভ অত্যন্ত বিরক্ত হতেন। সামাজিক চেতনা ও অনুভূতি ছিল তাঁর অত্যন্ত তীব্র। তাঁর কালের সভ্যতার অবদানগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও বুর্জোয়া ব্যবস্থার সঙ্গে কোনো আপস করার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। বুর্জোয়া প্রগতিশীলতার থিওরিগুলির প্রতি ছিল তাঁর অবজ্ঞা। বুর্জোয়া প্রগতিশীলরা বলে থাকেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বুর্জোয়া কাঠামোর ওপরেই এমন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে যেখানে মানুষের মধ্যে সংঘাতের পরিবর্তে আসবে সহিষ্ণুতার ভাব আর সবাই পাবে আরাম। চেখভ এতে মোটেই বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর "মাই লভ" (my love) গল্পের নায়কের মুখ দিয়ে তাই তিনি বলিয়েছেন: "ক্রমোন্নতির দুটো দিকই দেখতে হবে। মানবীয় ধারণাগুলির ক্রমোন্নতির সঙ্গে একেকটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে বিচার করতে হবে। ভূমিদাস প্রথার অবসান হয়ে পুঁজিবাদ বাড়ছে। যখন সোচ্চার কণ্ঠে মুক্তির কথা বলা হচ্ছে তখনো দেখা যাচ্ছে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনাহারক্লিষ্ট, উলঙ্গ ও অসহায় অবস্থায় থেকে সংখ্যালঘু অংশকে অন্নবস্ত্র যোগাচ্ছে ও তাদের রক্ষা করছে। যে কোনো রকম ভাবাদর্শের পাশাপাশি এরকম অবস্থাও তো থাকতে পারে। তার কারণ পীড়নের কৌশলটাও ক্রমশ বেশ আয়ত্ত হতে থাকে।"

বুর্জোয়া সভ্যতায় চেখভের মোটেই আস্থা ছিল না। তিনি বুঝেছিলেন, বুর্জোয়া সভ্যতা এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে মানবীয় ন্যায়নীতি বা প্রগতির কোনো স্থান নেই। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সহনশীল অবস্থানের

কথা যাঁরা বলেন তাঁরা মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে রাখতে চান বলেই তিনি মনে করতেন। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা চেখভের না থাকলেও পুঁজিবাদে যে মানুষের মুক্তি নেই তা তিনি বুঝেছিলেন আর একটা radical change বা আমূল পরিবর্তন যে দরকার সে সম্বন্ধেও তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না।

এই কারণেই নাট্যরচনার চিরাচরিত পথ পরিহার করে তিনি এক নবরীতি আনলেন। আপাতদৃষ্টিতে যা নাটক বলে মনে হয় না অথচ তারই মধ্যে গভীর নাটকত্ব। জীবনে যা স্বাভাবিক, সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায়, চলা ফেরা-বলায় যা মনে হয় অতি সহজ ও সামান্য, তারই মধ্যে নাটকীয় উপাদান খুঁজে পেলেন তিনি, দিলেন সৌন্দর্যের সন্ধান। কোন্‌টা সত্যিকার সৌন্দর্য আর কোন্‌টা মেকী সৌন্দর্য তাও বললেন তিনি। যারা শ্রম করে তারাই চেখভের কাছে প্রকৃত সুন্দর। অলস শ্রমবিমুখ মানুষ দেখতে সুন্দর হলেও তাঁর কাছে অসুন্দর। তাই Uncle Vania (আংকল ভানিয়া) নাটকে সেরেব্রিয়াকফের স্ত্রী ইয়েলেনা আন্দ্রেয়েভনা সম্পর্কে ভানিয়ার বন্ধু ডক্টর আস্ত্রোফ বলছে :

> "Everything about a human being should be beautiful : his face, his clothes, his soul, his mind. She is beautiful, there is no gainsaying that, but—she does nothing but eat, sleep, walk about, charm us all with her beauty. She has no duties, others work for her --you know this is true. And a life of idleness cannot be a pure life."

গোর্কির আগে শ্রমের মধ্যে এমন সৌন্দর্যের আবিষ্কার ও কাব্য চেখভ ছাড়া আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যেই দেখা যায় শ্রমের মর্যাদা তুলে ধরার একান্ত প্রয়াস। আনন্দ ও বেদনা পাশাপাশি রেখে চেখভ যেন শ্রমের সঙ্গীত রচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, সমস্ত মানবীয় গুণ, সমস্ত নীতি ও সমস্ত সৌন্দর্যের মূলই শ্রম। তাই মানুষকে শ্রমের স্বাধীনতা দিতে হবে আর তা পেলেই মানুষ হবে সুন্দর। চেখভের Three Sisters (থ্রি সিস্টার্স) নাটকে ছোট বোন ইরিনার মধ্যে এই মুক্ত শ্রমের তীব্র আকুতি দেখা যায়, কিন্তু জীবন তার সেই স্বপ্ন ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই জীবনের এক-ঘেয়েমির বিরুদ্ধে তার নালিশ : "Work without poetry, work without thoughts..."

আপাতদৃষ্টিতে চেখভের নাটকগুলি সাধারণ মনে হলেও তিনি যে সেগুলোকে এক গভীর জীবনবোধের দ্বারা অনন্যসাধারণ করে তুলেছেন এবং নাটকের

প্রচলিত ধারাটা একেবারে বদলে দিয়েছেন, ম্যাক্সিম গোর্কি তা অনুধাবন করেছিলেন। তাই ১৮৯৯ সালের অক্টোবরে মস্কোর আর্ট থিয়েটারে Uncle Vanica প্রযোজিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে সেই নাটক নিয়ে সাফল্যমণ্ডিত সফরের পর গোর্কি আন্তন চেখভকে লিখেছিলেন :

> "Since you say you do not want to write for the theatre I feel I ought to let you know what people of discernment think of your plays. They say, among other things, that Uncle Vania and The Sea-gull represent a new kind of dramatic art in which realism is raised to the level of inspired, deeply thought-out symbolism. And in my opinion this is quite true. As I watched your play I thought of life being sacrificed to an idol, of the invasion of the wretched life of man by beauty, and of many other fundamental things. Other plays do not lead one away from everyday reality to the sphere of philosophy, as yours do···"

চেখভ মনে করতেন মিথ্যা ও মেকী সৌন্দর্য কখনো গভীর মানবীয় উপলব্ধি জাগাতে পারে না। তাঁর স্বপ্ন ছিল মানুষের সব কিছুই একদিন সুন্দর হয়ে উঠবে। সেই সৌন্দর্যবোধে দেখা যায় সত্য ও সৃজনশীলতার সমন্বয় যাকে বলা যায় সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে নীতিবোধের সঙ্গম। তিনি মনে করতেন সত্য ও শ্রমই সৌন্দর্যের উৎস—এ দুটিকে বাদ দিয়ে মানুষ প্রকৃত সুন্দর হতে পারে না। ভুয়া আদর্শের জন্যে যত আত্মত্যাগ বা যত নিঃস্বার্থ শ্রমই করা হোক তার কোনো মূল্য নেই, তার জন্যে গর্ব করাটা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

চেখভ বলতেন, জীবন যেমন, মানুষ যেমন, তাকে তেমনভাবেই মঞ্চে দেখাতে হবে। তাঁর মতে "In real life people do not shoot or hang themselves, do not make declarations of love every munite. Nor are they forever uttering words of wisdom. They spend much more time eating, drinking, making love and talking nonsense. All this must be shown on the stage. A play ought to be written where people would come and go, dine, talk about weather, play cards···Let things be just as complex and at the same time as simple on the stage as they are in life. People sit down to their dinner, do nothing but eat their dinner, and in

the meantime their happiness may be in the process of making, or their lives are being wrecked…"

চেখভের The Three Sisters নাটকে প্রথম অঙ্কে ঠিক এই দৃশ্যই দেখতে পাওয়া যায়। সবাই বসে প্রাতরাশ করছে, এর মধ্যে দুঃস্বপ্নের মতো এক নারী এসে তাদের সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ালো। নাতাশা চরিত্রটি সংসারকে লণ্ডভণ্ড করে দিল।

শুধু বাহ্যিক দিকটা দেখেই চেখভের নাটকের চরিত্রগুলির বিচার করা যায় না। চরিত্রগুলি যাই বলে তার মধ্যে যেমন একটা বাহ্যিক অর্থ আছে তেমনি তার নিহিতার্থও রয়েছে। বাহ্যত মনে হয় চরিত্রগুলি নিতানৈমিত্তিক বিষয় নিয়ে আলাপ করছে; কিন্তু তাদের প্রতিটি কথার মধ্যেই রয়েছে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো এমন এক সঙ্গীত প্রবাহ যা একটির সঙ্গে অন্যটিকে ঘনিষ্ঠবদ্ধ করে দেয়। চরিত্রগুলির অজ্ঞাতসারেও সেসব কথা বেরিয়ে আসে। চেখভের নাটক যেন জীবনের অর্কেস্ট্রা—বিভিন্ন কর্ডের ঐকতান। তাই মঞ্চে তাঁর নাটক প্রযোজনার সময় এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ধরতে না পারলে, প্রতিটি চরিত্রের ও তার সংলাপগুলোর অন্তর্নিহিত ভাব পরিস্ফুট করার দিকে নজর না দিলে আর কেবল বাহ্যিক দিকটারই ওপর নির্ভর করলে প্রযোজনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পিতার্সবুর্গে আলেক্সান্দ্রিন্স্কি থিয়েটারে চেখভের The Sea-gull নাটকের প্রযোজনা যে ব্যর্থ হয়েছিল তার মূলে ছিল নাটক ও চরিত্রগুলির আন্তর সত্তা উপলব্ধি না করে বহিরঙ্গের ওপর জোর দেয়া। সেই ব্যর্থতা চেখভকে এতই বিষণ্ণ করেছিল যে তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেমিরোভিচ—দানচেংকো-কে অভিমানে লিখেছিলেন: "Even if I were to live another seven hundred years, I would not write a single other play for the theatre! Enough is enough. In this branch I have failed."

স্তানিস্লাভস্কি ও দানচেংকো কিন্তু চেখভের এই বেদনাভরা চিঠি পেয়েই দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। চেখভের নাটকে যে সামান্যের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্যের খনি রয়েছে, তা থেকে হীরে-রত্ন খুঁজে আনতে পারলেই দর্শকরা এক অনুপম জীবনের স্বাদ পাবে, তাঁরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নাছোড়বান্দা হয়ে চেখভের কাছ থেকে The Sea-gull মস্কো আর্ট থিয়েটারে প্রযোজনার অনুমতি আদায় করে নিলেন আর এই নাটকেরই প্রযোজনা যেমন মস্কো আর্ট

থিয়েটারের গৌরব বাড়িয়ে দিল তেমনি নাট্যকার হিসেবে চেখভকেও দিল প্রতিষ্ঠা। তাঁর নাটক সম্পর্কে নিজের ধারণা জানাতে গিয়ে চেখভ গোর্কিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : "in each character must be felt the mass of humanity, the background from which he springs." মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রাণপুরুষ স্তানিস্লাভস্কি ও দানচেংকো চেখভের এই শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য ধরতে পেরেছিলেন। কোনো ভূমিকায় যদি মাত্র কয়েকটি কথাও থাকে তবে তারও সাহায্যে অন্তর্নিহিত ভাবের দ্বারা শিল্পমূর্তিটিকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলতে হবে। কোনো একটি চরিত্রের বলার তিন চারটি শব্দ থাকলেও সে ক'টি শব্দকেই এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যে-প্রকাশের দ্বারা দর্শক কল্পনায় অনুভব করতে পারবে চরিত্রের গোটা জীবন, তার প্রকৃতি ও অভ্যাস আর মঞ্চের ওপর যা কিছুই ঘটছে তার প্রতি তার মনোভাব। চেখভের নাটকের চরিত্রগুলির এই পরস্পরনির্ভরতা ও ঘনসন্নিবদ্ধতার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিল বলেই মস্কো আর্ট থিয়েটার চেখভ-নাটকে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিল। তুচ্ছের সমষ্টির দ্বারা এক মহত্তর সত্তায় উপনীত হওয়াতেই গোর্কি বলেছিলেন "from everyday reality to the sphere of philosophy."

জীবনের সংস্পর্শে এসেই চেখভের এই শিল্পবোধ জেগেছিল। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অপরিমেয় ভালোবাসা। ইয়াল্টা থেকে গোর্কিকে তিনি লিখেছিলেন : "আমার প্রচুর অর্থ থাকলে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত গ্রামের শিক্ষকদের জন্যে আমি একটা স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করে দিতাম। আমি এমন একটা বাড়ি নির্মাণ করতাম যার ছাদ হতো খুব উঁচু। আর থাকতো বড়ো বড়ো জানলা যা দিয়ে আসতো প্রচুর আলো ও বাতাস। আর সেখানে থাকত চমৎকার লাইব্রেরি, সমস্ত রকম বাদ্যযন্ত্র, সবজি খেত, ফুলের বাগান, কৃষি ও আবহাওয়া সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা। শিক্ষকদের সবই জানা দরকার, বুঝলে বুড়ো খোকা, শিক্ষকদের সবই জানা দরকার।" ইয়াল্টায় একদিকে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আরেক দিকে চরম দারিদ্র্য তাঁকে পীড়া দিত। যেসব সৎ শ্রমজীবী তাঁর কাছে চিকিৎসার আশায় আসত তাদের তিনি সাহায্য করতেন। আমাদের শরৎচন্দ্রের মধ্যেও ছিল এই গুণ। তিনিও গ্রামে গিয়ে মানুষের সেবা করতেন। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি রক্তমাংসে গড়া সজীব মানুষ।

রুশ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্জগতেও যখন চেখভের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে তখনো কিন্তু নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর স্ত্রীর নালিশ

ছিল যে তিনি তাঁর নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁকে কিছুই বলেন না। তার উত্তরে তিনি বলতেন, "এমন কিছু নতুন তো আমার লেখায় দেখতে পাইনে যে তোমাকে তা বলবো। কিছু লিখে আমি যখন তা পড়ি তখন মনে হয় সবই তো পুরনো কথা, আগেই তা বলা হয়ে গেছে। আমি চাই নতুন এমন কিছু বলতে যার ধার থাকবে খুব বেশি।" লেখক হিসেবে তাঁর নিজের প্রতি অসন্তোষের কারণ ছিলো। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর দেশে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে আর তারই জন্যে চলেছে প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতিপর্বও যে প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে তাও তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন। তাই সেই আগামী দিনের কথা বলার জন্যে তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। গোর্কিকে তিনি লিখেছিলেন, "তাতারদের মধ্যে বাস করে একজন রুশের যা জানা উচিত আমি প্রায় তার কিছুই জানিনে ; তবে আমি দেশের প্রাণস্পন্দন অনুভব করছি।"

চেখভ সম্পর্কে গোর্কির ছিল অতি উচ্চ ধারণা। গোর্কি মনে করতেন চেখভ একজন পরিশীলিত, পরিমার্জিত, রুচিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গোর্কিকে মুগ্ধ করতো। গোর্কিও চেখভের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। গোর্কির লেখা প্রথম যাঁদের প্রসংশা অর্জন করেছিল, চেখভ ছিলেন তাঁদের একজন। চেখভ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, গোর্কি একজন অসাধারণ লেখক হবে। দুজনের মধ্যে চিন্তা ও ভাবগত মিলও অনেকখানি ছিল। শ্রম, বুদ্ধি ও সংস্কৃতির প্রতি দুজনের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। লিও তলস্তয়ও চেখভকে অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখতেন। ১৯০১ সালে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে লিও তলস্তয় গিয়েছিলেন গাসপ্রায়। চেখভ সেখানে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। গোর্কিও তখন সেখানে কিছুদিন ছিলেন। চেখভকে লিও তলস্তয় কি দৃষ্টিতে দেখতেন সে সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে গোর্কি বলেছেন—প্রায় পঙ্গু অবস্থায় লিও তলস্তয় একদিন বারান্দায় একটি আরাম-কেদারায় বসে আছেন। সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন চেখভ। তাঁকে দেখে লিও তলস্তয় আপন মনে বলে উঠলেন : "কি চমৎকার মাধুর্যভরা লোকটি! নারীর মতো নম্র ও ভদ্র। হাঁটছেও যেন নারীর মতো। সত্যি অপূর্ব!"

১৯০১ সালেই লিখলেন তিনি The Three Sisters (তিন বোন) নাটক। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের জন্যে গোটা রুশ দেশ তখন টগবগ করে ফুটছে। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকলেও সেই উত্তাপ যেন তিনি মর্মে মর্মে

উপলব্ধি করতে পারছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন ঝড় উঠতে দেরি নেই। তাই The Three Sisters নাটকের একটি চরিত্রকে দিয়ে তিনি বলালেন :

> "The time has come, something great is approaching us, and will soon blow away all laziness, indifferences, prejudice against work, putrid boredom, from our society···Twenty-five or thirty years hence everyone will be working. Everyone !"

সারা দেশ জুড়ে বিপ্লববহ্নি ধূমায়িত বুঝতে পেরেই চেখভের মানসিকতা ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। যে রাজনীতি থেকে তিনি নিজেকে সযত্নে দূরে রাখতে চাইতেন সেই রাজনীতি সম্পর্কেই তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কেউ যেন অকস্মাৎ তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরিয়ে নিল। যা ছিল তাঁর দু শ' বছর দূরের স্বপ্ন তা যেন তার দরজায় এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়ালো। যে নবা রাশিয়ার অভ্যুদয়ের কথা তিনি ভাবতেন, যে সুখী ও হাস্যোজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন তিনি দেখতেন, তা যেন যে কোনো মুহূর্তেই ঘটে যেতে পারে। তাঁর হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তার ধরণ সবই গেল বদলে। প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় তিনি যেন এক আলাদা মানুষ হয়ে উঠলেন। খবরের কাগজের যেসব সংবাদ তিনি উপেক্ষা করতেন সেগুলোই মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। সংশয়বাদী চেখভ হয়ে উঠলেন প্রত্যয়ের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর লেখক বন্ধু ইয়েলপাতিয়েভস্কি পিতার্সবুর্গ থেকে ফিরে এলে তিনি সাগ্রহে তাঁর কাছে জানতে চাইলেন মস্কো ও পিতার্সবুর্গে কী হচ্ছে। বন্ধু ইচ্ছে করেই একটু সংশয় ও উপেক্ষার সুরে অবস্থার বিবরণ দিলেন। শুনে চেখভ যেন একটু ক্রুদ্ধই হলেন। উত্তেজিত হয়ে বললেন তিনি : "কী বলছ তুমি! দেখতে পাচ্ছ না তলা থেকে ওপর পর্যন্ত সব কিছু কেমন নড়তে শুরু করেছে! সমাজ, শ্রমিক, সব কিছুই!" এই বলে তিনি তাঁর সদ্য সমাপ্ত The Bride-এর পাণ্ডুলিপি বন্ধুর হাতে দিয়ে বললেন : "ছাখো, কী লিখেছি।" তাতে দেখা গেল চেখভের সেই সংশয়, হতাশা, অবজ্ঞার সুর আর নেই। তাঁর এক বিরাট পরিবর্তন হয়েছে ; তাঁর শিল্পধারণা একেবারে বদলে গেছে। চেখভের জীবনে শুরু হয়েছে এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু অধ্যায় আর শেষ হতে পারল না—তার আগেই ১৯০৪ সালে অর্থাৎ ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালেই তাঁকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো।

কার্ল মার্কস একদা বলেছিলেন, হাসির আরেক নাম পুরাতনকে বিদায়

দেয়, জীর্ণ জীবনকে পরিহার করা। চেখভের শেষ নাটক The Cherry Orchard-এ যেন সেই সত্যটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ যেন জীর্ণ বস্ত্র পরিহার করে নব বস্ত্র পরিধানের কাব্য। জরাজীর্ণ, মুমূর্ষু রাশিয়া, যার আয়ু ফুরিয়ে গেছে, কালের বুকে যার টিকে থাকার আর অধিকার নেই, 'চেরি অর্চার্ড' নাটকে তাকেই বিদায় জানাচ্ছে নব্য রাশিয়া—যৌবনের কাছে বিদায় নিতে হচ্ছে বার্ধক্যকে। পুরনো জীবনের ইতি এতই ঘনিয়ে এসেছে যে তার অস্তিত্বের জন্যে কান্না হাস্যকর মনে হয়। 'চেরি অর্চার্ড' নাটকের মর্মকথাই এই। অতীতে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় যেন কায়াহীন ভৌতিক ছায়া। নাটকের প্রধান চরিত্র রানেভস্কায়া ও তার ভাই গায়েব যেন সেই অশরীরী মূর্তি। তাই নিজেদের সম্বন্ধে তারা বলে: "We do not exist, we only think we do."

রানেভস্কায়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চেরিকুঞ্জের মালিক। কিন্তু অবিমৃষ্যকারিতার দ্বারা সে জীবনের এমন অপচয় ঘটিয়েছে, চেরিকুঞ্জের এমন দশা করে ছেড়েছে যে তা নীলামে বিক্রি করা ছাড়া তার আর উপায় নেই। এই চেরিকুঞ্জ যেন গোটা রুশ দেশের প্রতীক। তাই রানেভস্কায়ার মেয়ে আনিয়াকে ত্রোফিমফ বলে: "Just think, Anya, your grandfather, your great grandfather and all your ancestors were serf-owners, the owners of living souls—do not human faces look out at you from every cherry, from every leaf and every tree in the orchard, can't you hear their voices? Proprietorship in human beings has transformed you all, both your ancestors and yourselves, so that neither you, nor your mother, nor your uncle can never realize that you are living on credit, at the expense of those whom you never allow into your house. It is so obvious that, if we are to live in the present, we must first put an end to the past, and have done with it."

'চেরি অর্চার্ড' সম্পর্কে গোর্কি বলেছেন: "There is the tearful Ranevskaya and other former owners of the Cherry Orchard, as selfish as children, and as weak as old persons. They have outlived their day, and go about moaning, seeing and understanding nothing of what is going on round them, parasites lacking even the strength to fasten upon life once again." তার অর্থ গায়েব ও রানেভস্কায়ার মতো লোকেরা ভাবী সৌন্দর্যজগতে

অনুপযুক্ত ; এমন কি যে অতীত বিদায় নিতে চলেছে তারও প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্যতা তাদের নেই। এক কথায় তারা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা অতীতের সংস্কৃতির অধঃপতিত সন্তান। প্রেতাত্মা ছাড়া তাদের আর কিছু বলা যায় না। এমন কি যে ত্রোফিমফকে দিয়ে চেখভ আগামী দিনের স্বপ্ন তুলে ধরেছেন, ইচ্ছাশক্তির অভাবে সেই স্বপ্নকে সফল করে তোলার সামর্থ্য তারও নেই। আবার লোপাখিনের মতো চরিত্রের হাতেও যে ভবিষ্যৎ নয় তাও চেখভ দেখিয়েছেন। তাই তার কথাবার্তা ও চালচলনে বর্বরতা। বুর্জোয়ারা সৌন্দর্য রক্ষা না করে ধ্বংসই যে করে তা দেখাবার জন্যে লোপাখিনের মতো চরিত্র অঙ্কন। তার একমাত্র লক্ষ্য চেরিকুঞ্জটি বিনাশ করে ভাড়াটে বসাবার জন্যে সেখানে ছোট ছোট ঘর তৈরী করে দেয়া। চেরিকুঞ্জের সৌন্দর্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। তাই চেখভ সৌন্দর্যের ভার ছেড়ে দিয়েছেন আগামী দিনের নতুন মানুষের হাতে। ত্রোফিমফের মুখ দিয়ে চেখভ যেন তাঁর নিজের মনের কথাগুলিই বলিয়েছেন :

> "I feel the approach of happiness, Anya, I almost see it coming. ···There it is, happiness, here it comes, nearer and nearer, I can hear its steps. Even if we do not live to see it, if we never know it, what does it matter ? Others will see it."

ভবিষ্যতে কি দৃঢ় প্রত্যয়! যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চেখভ যেন অনিবার্য পরিবর্তনকে দেখতে পাচ্ছিলেন। যা ছিল এতদিন তাঁর কাছে অনাগত ভবিষ্যৎ তাই যেন এসে তাঁর দ্বারে করাঘাত করছে। চেরিকুঞ্জের মতো এক সুন্দর রাশিয়া যেন তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। যে মহান অক্টোবর বিপ্লব রুশ জাতির সামনে অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার খুলে দিয়েছে, এ যেন তারই ভবিষ্যদ্বাণী। তাই দ্বিতীয় অঙ্কে ত্রোফিমফ বলছে : "The whole of Russia is our orchard," আর সেই চিরকুঞ্জ গড়ে তোলার শপথ নিচ্ছে আনিয়া শেষ দৃশ্যে এই বলে : "We'll plant a new orchard, still more beautiful than this."

প্রচলিত তরল হাসির নাটক ও ফরাসী প্রহসনে আকৃষ্ট হয়ে The Bear, The Proposal প্রভৃতি একাঙ্ক নাট্য দিয়ে নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন আর On The Road নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং Ivanov ও The Wood Goblin

নাটক দুটির মঞ্চব্যর্থতায়, অবশেষে The Sea-gull পর্যন্ত পেত্রগ্রাদের প্রথম অভিনয়ে অসাফল্য ডেকে আনায় আর নাটক লিখবেন না বলে স্থির করেছিলেন যিনি, তিনিই জীবনদীপ নিভে যাবার আগে দিয়ে গেলেন The Cherry Orchard-এর মতো এমন এক নাটক যা বিশ্ব নাট্যসাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ।*

* লেখকের আসন্নপ্রকাশ—"নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা" গ্রন্থের একটি অধ্যায়।

বাংলার নবজাগরণ ও নারীমুক্তি আন্দোলন

চিত্রলেখা ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের (১৯৭৫) পরিপ্রেক্ষিতে বাঙ্গালী নারীমুক্তি আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা নানা কারণেই অভিপ্রেয়। আমাদের বাংলা দেশে নারীমুক্তি আন্দোলন খুব বেশী দিনের নয়। বিগত শতাব্দীর মধ্যপাদ থেকেই মোটামুটি সমাজে নারীর স্থান ও প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে সচেতন আলোচনার প্রয়াস দেখা যায়।

নারীমুক্তি আন্দোলন কাকে বলে

নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজে নারীর পৃথক সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত। মনু-পরাশর প্রভৃতি সমাজশাস্ত্রীর দল নারীর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন আপন গৃহকোণের নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। যুগে যুগে সামাজিক অনুশাসনের নিগড় যত কঠোর হয়েছে, দর্শনে সাহিত্যে নারীর মহিমা ততই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যপাদ অবধি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ভোগ্যপণ্যদ্রব্যের অধিক মূল্য দেয় নি নারীকে। সামান্য পণ্যদ্রব্যের মতোই তার মালিকানা প্রথমে বর্তেছে পিতায়, পরে স্বামী এবং পুত্রে। স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সুযোগ দেয় নি সমাজ নারীকে। পিতা, পতি বা পুত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক সমপর্যায়ে বিবেচিত হওয়া সেদিন কল্পনাতীত। সম্পর্কটা অনেকটাই প্রভু ও দাসীর—শাসক ও শাসিতের। "সাংসারিক বাঁদী"ত্বের দায়টা মেয়েদের উপর থেকেই যাচ্ছে। অপর দিকে, পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষ নিজের স্থান নির্ধারিত করে নিয়েছে বাইরে—লেনিন যাকে বলেছেন "তুচ্ছ খিটখিটে ভোঁতা একঘেয়ে অস্বাভাবিকভাবে অনুৎপাদক", "ক্ষুদে সাংসারিক গৃহস্থালি" তার থেকে অনেক দূরে—বিপুল কলরবময় কর্মচক্রের আবর্তে।

নারী যেদিন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নূতন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থা গড়ার কাজে সচেষ্ট হল সেদিন থেকেই নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা—ধরা যেতে পারে। এই আধুনিক নারী বাইরের জগতে পুরুষের পাশে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এগিয়ে এল। তারা প্রমাণ করতে চাইলে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার ভেদ নেই। "ঘোমটার আধ্যাত্মিকতা ও পর্দার নীতিবাদে"* তার বিশ্বাস টলে গেছে।

দ্বিতীয়ত, এই নূতন নারী-বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সেই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে যা পুরুষের জন্য এক রকমের আধ্যাত্মিকতা, এক রকমের সংযম ও এক রকমের আদর্শ প্রচার করে এবং নারীর বিষয়ে আর এক রকমের। নারী-মুক্তি আন্দোলন এই সামাজিক অনাচার ভেঙ্গে নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রকাশের লড়াই।

এই নূতন নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রধান কথাই হল—নারী সবার আগে মানুষ। তাই মানুষ হিসাবে আপন আত্মস্বাতন্ত্র্য নিয়ে, নিজের সৃজনী ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে বাঁচবার দাবী তার প্রধান দাবী। এই হল নারীর আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভের সবচেয়ে জরুরী বক্তব্য।

নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রকৃতি

নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের সংগ্রাম বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশ দশক থেকেই বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে বলে মোটামুটি ধরা চলে। এমনকি পশ্চিমী দেশগুলিতেও দেখা যায় নারীর আত্মস্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) সমসাময়িক কাল থেকে। নারী স্বাতন্ত্র্যের এই আন্দোলন পশ্চিম দেশগুলিতে প্রায়শই ফেমিনিজম আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। কালের হিসাবে ফেমিনিজম খুবই আধুনিক ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদেও ইংলণ্ডে নারীর পরাধীনতা কত সত্য ছিল তার প্রমাণ জন স্টুয়ার্ট মিলের "সাবজেকশান অফ উইমেন" গ্রন্থের প্রকাশ (১৮৬৭)। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর ইংলণ্ডে নারী-স্বাধীনতার প্রেরণা তীব্র হয়ে উঠলো।

আমাদের দেশেও যে নারীমুক্তির আন্দোলন এসেছে তাকে সম্পূর্ণ বিদেশ থেকে আমদানী বলে আখ্যা দেওয়া অসঙ্গত। বিশেষ আর্থিক, সামাজিক ও

* বিদ্রোহের পথে বাঙালী নারী—হরিদাস মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৯৪০

অন্যান্য অবস্থার উদ্ভব হলে এ আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অব্যবস্থত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তারই ফলস্বরূপ নারীমুক্তি আন্দোলন ঐ সব দেশে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে আমাদের দেশেও অনেকাংশে অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় বলে নারীমুক্তি আন্দোলনও আরম্ভ হয়ে যায় দ্রুতগতিতে। দেশের মধ্যে অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ব্যতীত কোন আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে বিদেশী প্রেরণা আন্দোলনকে পুষ্ট করে—আন্দোলনকে মদত জোগায়। আমাদের দেশের নারীমুক্তি আন্দোলন সেই হিসেবে আমাদেরই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ। বিদেশের কর্মকাণ্ড, চিন্তাধারা, দৃষ্টান্ত আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলনকে প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের আন্দোলন কোনক্রমেই বিদেশের ধার করা আন্দোলন নয়। প্রতি দেশের ইতিহাসকে বিভিন্ন বিবর্তনের স্তর অতিক্রম করতেই হয়। ইতিহাসের এ অমোঘ বিধান। আমরাও করে চলেছি। তা না হলে প্রগতির যে কোন অর্থই থাকে না। আমাদের দেশে নারী-জাগরণ এসেছে বলেই মুক্তি আন্দোলন শিকড় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অগ্রজের অনুপ্রেরণা অনুকরণ বলে চিহ্নিত করা তাই অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায়।

নারীমুক্তি আন্দোলনের বিবর্তন : উনবিংশ শতাব্দী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণের সেই স্বর্ণযুগে রাজা রামমোহন রায় ও সশিষ্য ডিরোজিও সমাজে নারীর স্থানের নবমূল্যায়নে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের কর্মকাণ্ডের বৃহৎ প্রবাহ বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। নবযুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ই বোধহয় প্রথম নারীর নিজস্ব স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি দেন। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের এক মূল অংশই নিয়োজিত হয়েছে পুরুষের অত্যাচারের শিকার নারীর মুক্তি সাধনায়। তিনিই বোধহয় প্রথম প্রচলিত প্রথার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ, বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞান-শিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ

স্ত্রীলোককে প্রাধ্য দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন ? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্নাটের রাজার পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন তাহারা সর্বশাস্ত্রে পারগরূপে বিখ্যাতা আছেন ; বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণপূর্বক কৃতার্থ হয়েন।"*

নারীমুক্তি আন্দোলনে রামমোহনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান বোধহয় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদসাধন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের অনুশাসন সংকলিত করে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। সহমরণ প্রথা দুষ্টক্ষতের মত সমাজজীবনে বহুদিন থেকে অধিষ্ঠান করছিল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ এই প্রথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল সন্দেহ নেই। যেহেতু এই প্রথার বিরুদ্ধাচারণ তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপন্থী তাই এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য কোন চেষ্টা হয় নি। কিন্তু রামমোহন যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উপস্থাপিত করে সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ (১৮১৮), সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ (১৮১৯) ও সহমরণ বিষয়ে (১৮২৯) তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন তখনই বেটিঙ্ক আইন করে এই প্রথা বন্ধ করলেন। বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করলো। কেবলমাত্র সতীদাহ প্রথা নয় রাজা রামমোহন বহুবিবাহ রোধ এবং আইনগতভাবে হিন্দু মহিলার সম্পত্তিতে অধিকার সম্বন্ধেও উদ্যোগী হন। হিন্দু নারী পিতৃধন ও স্বামীধন থেকে বঞ্চিত বলে যে কত অসহায় সে বিষয়ে রামমোহন সম্যক অবগত ছিলেন। ১৮২২ সালে এ বিষয়ে Brief Remark regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Interitance নামে একটি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৮২২ সালে রামমোহনের উদ্যোগ সত্ত্বেও হিন্দু নারীকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৫৬ অবধি সম্পত্তিতে তার আইনানুগ যোগ্যস্থান অধিকারের জন্য।

রামমোহনের অকাল বিয়োগের পর তাঁর আরব্ধ কর্মভার তুলে নিলেন

---

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত : নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ১৯৭, কলিকাতা ১৩৭৯

ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ—ইতিহাস যাঁদের 'ইয়ং বেঙ্গল' বলে চিহ্নিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর সেই উজ্জ্বল মানবিকতার যুগে তাঁরাও প্রবৃত্ত হলেন বাঙ্গালী নারীর নবমূল্যায়নে। তীব্র বাদানুবাদ ও আন্দোলনের পথে তারা এগিয়ে দিলেন নারীমুক্তি আন্দোলনকে আরও এক স্তর। তাঁরা রামমোহনের মতো শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়ে নয় সহজ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ যুক্তির আলোকে নারীকে মানবিক মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠিত করবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের স্বচ্ছ জীবনবোধ বুঝিয়েছিল যে নারীকে উপেক্ষা করে সমাজের অগ্রগতির চিন্তা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। সেইজন্যই তাঁদের চারটি মুখপত্র—পার্থেনন, জ্ঞানান্বেষণ, হিন্দু পাইওনীয়ার ও বেঙ্গল স্পেকটেটরের পাতায় পাতায় তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ও স্ত্রীস্বাধীনতার সম্পর্কে এত সোচ্চার*। হিন্দুধর্মের বৈপরীত্য দেখাতে গিয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রমাণ করেছে হিন্দুসমাজে নারীর স্থান নির্ধারিত হয়েছে স্বার্থান্বেষী পুরুষেরই সুবিধার্থে। ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত 'হিন্দু পাইওনীয়ারে' প্রকাশিত প্রবন্ধ On Women-ও আলোচনা করেছে নারীর শিক্ষার কথা, মানবিক অধিকারের কথা ও নারীর পূর্ণ বিকাশের জন্য পুরুষের দায়িত্বের কথা। ইয়ং বেঙ্গলদের বিভিন্ন মুখপত্রে বারবার এই মতবাদেরই প্রতিফলন দেখি যে শিক্ষিতা নারী সর্বাংশে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে। তাঁরা বারবার বলেছেন বৃথা শাস্ত্রের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে হবে নারীকে। ইয়ং বেঙ্গলদের সামাজিক বোধ ও শাস্ত্রীয় বন্ধন থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করবার বুদ্ধিবাদী ও যুক্তিবাদী ভূমিকা নারীমুক্তি আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। রাজা রামমোহন যেখানে শাস্ত্রীয় বচনাদির সাহায্য নিয়েছেন নারীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানে 'ইয়ং বেঙ্গল' শাস্ত্রকে এনেছে তার বৈপরীত্য প্রমাণের জন্য—তার অসঙ্গতি প্রকাশের জন্য। এই বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি তাঁরা ব্যবহার করেছেন নারীমুক্তি আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে। নারী আন্দোলন তথা সামাজিক সংস্কারকের ভূমিকায় রাজা রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলদের দৃষ্টিভঙ্গির এই হল মৌল পার্থক্য।

রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলদের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁর ব্যক্তিত্বে ও পাণ্ডিত্যে

* ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস্—অমর দত্ত। কলিকাতা ১৯৭৩। বিশেষত গ্রন্থের ডিরোজিয়ানস বা ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র শীর্ষক পরিচ্ছেদটি পঠিতব্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। মানবদরদী বিদ্যাসাগর নারীর নব মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে প্রথমেই নারীশিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন।

বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন খুবই আধুনিক। রামমোহনের মতো মনীষা নারীমুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রজের ভূমিকা গ্রহণ করেছে সত্য কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার প্রসারে তিনি একান্তই নীরব। অনুমান করতে বাধা নেই যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে (১৮১৭) রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের ব্যবহারই তাঁকে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা নিতে বাধা দেয়। তবে রামমোহনের অনুবর্তী গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থটির যুক্তিতর্ক ও বিচারপদ্ধতি আমাদের রামমোহনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ইয়ং বেঙ্গল স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু ১৮১৮-১৮১৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় প্রথম স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা সুরু হয়। The Female Juvenile society for the Establishment and support of Bengalee Female School-এর তত্ত্বাবধানায় মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা গ্রহণ করবার মতো মানসিক প্রস্তুতি তখনও বাঙ্গালীসমাজে জাগে নি। বিশেষ মিশনারীদের প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজ অনেকটাই অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছে। তবু ১৮২২ থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হতে আরম্ভ করেছিল। ১৮২৩ সালে ২২টি স্কুলে প্রায় ৪০০টি ছাত্রী বিদ্যাশিক্ষা করছিল। তবে একথাও স্মরণীয় যে এই স্কুলগুলির ছাত্রী বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আসতো সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণী থেকে। উচ্চবর্ণের হিন্দুও স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারছে না। অপর দিকে, মিশনারী শিক্ষার প্রভাবে ধর্মান্তরের আশঙ্কাও উপেক্ষা করতে পারছে না।

আশ্চর্য এই যে হিন্দুসমাজ যখন স্ত্রীশিক্ষার ভূমিকা নিয়ে অব্যবস্থিতচিত্ত তখন ১৮২৫ সালে মুসলমান প্রধান এন্টালী, শ্যামবাজার অঞ্চলে "লেডীজ এ্যাসোসিয়েশান" নামক মহিলা সমিতির উদ্যোগে কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসলমান মহিলারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বালিকা বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে শ্যামবাজার অঞ্চলের সেই অজ্ঞাতনামা মুসলমান মহিলার উল্লেখ করতে হয় যিনি নিজে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিদ্যালয়ের জন্য বালিকা সংগ্রহ করেছিলেন। নিজের পাড়ায় তিনি একটি বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে স্কুলটির উন্নতিও হয়। ১৮২২ সালে খৃষ্টান প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে একজন মুসলমান মহিলার উদ্বুদ্ধ হওয়া এক বিস্ময়কর ঘটনা সন্দেহ নেই।*

১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্রের প্রচেষ্টায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দু বছর পরে, ১৮৪৯ সালের ৭ই মে বেথুন সাহেব Calcutta Female School স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৫১ সালে স্কুলটির নাম হয় Bethune School। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ইয়ং বেঙ্গলের রামগোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই স্কুলটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় থেকেই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন আরম্ভ হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রসার নারীমুক্তি আন্দোলনকে আরও একটি স্তরে উন্নীত করলো।

তবে একথা ভাবলে ভুল হবে যে বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিনা বাধায় আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে ইয়ং বেঙ্গল ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার ইংরাজী শিক্ষিতরা যেমন স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন করছেন অপর-দিকে তেমনি সনাতন হিন্দুসমাজের প্রবক্তারা তাঁদের পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন রচনা প্রকাশ ও সমাজচ্যুতির আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই সময়ে (১৮৫০ সালে) পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার সর্বশুভকরী পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্ধে এমন কথাও লেখেন যে বিদ্যাশিক্ষা করে মেয়েরা অর্থ উপার্জন করতে পারে এবং পারিবারিক জীবনে পুরুষদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতে পারবে। মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষ সাম্যের প্রবক্তা হিসেবে তিনি নিশ্চয় স্মরণীয়। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে তথা নারী-মুক্তি আন্দোলনে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ১৮৫৪ সালে স্ত্রীশিক্ষা-প্রসার ইংরাজ কোম্পানীর সমর্থন পেল (Wood's Despatch)। ফলে ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল অবধি বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হল।

১৮৭৫ সাল থেকে কতিপয় উৎসাহী ব্রাহ্ম কর্মীর (দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল) আনুকূল্যে স্ত্রীশিক্ষা

* বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ : বিনয় ঘোষ। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—বিশেষ ৩য় খণ্ডের স্ত্রী শিক্ষা পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বিস্তারের আন্দোলন জোরালো হল। ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পরীক্ষা দেবার অধিকার স্বীকৃত হল। স্ত্রী-পুরুষের সমান শিক্ষার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে স্ত্রীশিক্ষা স্থিরগতিতে বিস্তার পেতে লাগলো। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদেও স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতা সম্পূর্ণ দূর হয় নি।

নারী আন্দোলনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের অপর অবদান বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন। অনেকে মনে করেন যে রাজা রামমোহনও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের কথা চিন্তা করতেন। তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থনে গ্রন্থাদিও রচনা করেছিলেন বলে শোনা যায়। রাজার জীবনচরিতকার শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে কথা প্রসঙ্গে বহুবার রাজা বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্তও করেছিলেন।* অনেকে মনে করেন যে বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে রামমোহন বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করতেন। তাঁর অকাল-বিয়োগের পর বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিদ্যাসাগর। সহমরণ প্রথা রোধের পরিপূরক হিসাবেই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়ে। সে যুগে বিধবাদের সামাজিক অনুশাসন ছিল নানাবিধ ও অতিদৃঢ়। সেইজন্যই সতীদাহ প্রথা রহিত করার পরবর্তী আন্দোলনের প্রথম ধাপই এই বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন। বিশেষত যে যুগে যখন বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল তখন স্বভাবতই বাল্যবিধবা বহু সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো। ফলে বিচ্ছিন্ন-ভাবে বিদ্যাসাগরের পূর্ব থেকেই বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রামমোহনের আত্মীয় সভায় ও ইয়ং বেঙ্গলদের নানা সভায় এ নিয়ে আলোচনাও চলছিল। ১৮৪২ সালে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় যুক্তি বিরুদ্ধতার উল্লেখ করে। তবে মোটামুটি ইয়ং বেঙ্গলরাই এই সামাজিক সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়। কাজেই বিষয়টি নিয়ে বাদানুবাদ ও আলোচনা চলছিলই। এই সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিৎ কি না" (জানুয়ারী, ১৮৫৫) মর্মে বিদ্যাসাগরের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। প্রায় এই সঙ্গে বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক আন্দোলনেরও সূচনা হল। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে আবেদন করলেন বিধবা-বিবাহ

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত: নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৩৭৯, পৃঃ ২০৫।

আইনসিদ্ধ করবার জন্য। বিরোধী পক্ষের মহেশচন্দ্র চূড়ামণি, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তীব্র বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। ঐ ১৮৫৫ সালের অক্টোবরে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হল। সারা দেশে তীব্র আলোড়ন আরম্ভ হয়ে যায়। বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা গান ছড়া রচনা হতে থাকে। তৎকালে বহুল প্রচলিত এই ছড়া গানগুলি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে বিধবা-বিবাহ সূচক প্রস্তাবটি কি তুমুল সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তবে সে যুগেও দেখি সাধারণ মানুষ বিদ্যাসাগর ও তাঁর বিধবা বিবাহের প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। শাস্ত্রীয় তর্ক-বিচার সাধারণ মানুষের বোধের অগম্য, তারা সমস্যার মানবিক দিকটিই বুঝেছিল। তাই তাদের সমর্থন বিদ্যাসাগরের পক্ষে। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল আন্দোলনের বিশিষ্ট পদ্ধতি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে বিধবা-বিবাহ বিষয়টিকে সুসংবদ্ধ আন্দোলনের রূপ দিলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই আন্দোলন চালাতে গিয়ে তিনি যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। বিধবা-বিবাহ আইন পাশের জন্য তিনি সরকারের কাছে যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে নানা শ্রেণীর ও নানা স্তরের এক হাজার লোকের সাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন। আমরা সকলেই আজ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রথম স্তরে সাক্ষর সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে আন্দোলনের প্রয়োজনে সাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চালিয়ে বিদ্যাসাগর যে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ দেখিয়েছিলেন সে যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো রাজনৈতিক চেতনার স্তরে নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজ তখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির কল্যাণময় রূপ সম্বন্ধেই সচেতন এবং আন্দোলন পর্যায়ে আবেদন-নিবেদনের নীতিই গ্রাহ্য পন্থা। কাজেই বিদ্যাসাগরের পূর্বেও সময়ে সময়ে ইংরাজরাজের কাছে আবেদন-নিবেদন চলেছেই। আবেদন সাক্ষরও সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সে সাক্ষর এসেছে সমাজের বিশেষ শ্রেণী থেকে। আপামর জনসাধারণের সাক্ষর সংগ্রহ করে আন্দোলন চালানোর নজির বিদ্যাসাগরই প্রথম রেখেছেন।

এই আবেদনপত্র ইংরাজরাজের হস্তগত হওয়ার দেড় মাসের মধ্যে বিধবা-বিবাহ আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের তীব্র বিরোধিতা

এবং প্রচণ্ড বাদানুবাদ উপেক্ষা করে ১৮৫৫ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন পাশ হয়। এই আইন পাশ হবারও প্রায় দেড় বছর পরে ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রী দশ বছরের মেয়ে কালীমতী দেবী। পিতা ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়। পাত্র রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন বিদ্যাসাগর নিজে মনে করতেন তাঁর জীবনের "সর্বপ্রধান সৎ কর্ম।" বিদ্যাসাগর রামমোহনের অনুবর্তী হয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দাখিল করে রাজদ্বারে আইন প্রণয়ন করে বিধবাবিবাহকে স্বীকৃত সত্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নারীমুক্তি আন্দোলন তত্ত্বগত দিক থেকে একসঙ্গে অনেকখানি এগিয়ে গেল।

নারীমুক্তি আন্দোলন—বর্তমান শতাব্দীতে

বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভে দেখা গেল সহমরণ প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হয়েছে। বিধবা-বিবাহ আইনের অনুমোদন পেলেও সামাজিক অনুমোদন পায় নি। সেইজন্যই বিধবা-বিবাহ বহুল প্রচলিত হয় নি। স্ত্রীশিক্ষা ক্রমেই বহু-বিস্তৃতি পাচ্ছে। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন (১৮৮৩ সাল)।* ১৮৮৮ সালে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং অধ্যক্ষা হয়েছেন চন্দ্রমুখী বসু যিনি বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে প্রথম এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সম্মান অর্জন করেছেন। ১৯০৩ সালে বেথুন কলেজ থেকে মেয়েরা এম. এ. পড়তেও পারছেন। ১৮৯৭ সালে অমিয়া রায় ও চারুলতা রায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছেন। অবশ্য সহশিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আর কোন নজির নেই। অনুমান করতে দোষ নেই সহশিক্ষা প্রচলিত হবার মানসিকতার অনুকূল আবহাওয়া এখনও গড়ে ওঠে নি। তবে কতকগুলি মেয়েদের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যার দিকে মেয়েরা উৎসাহী হচ্ছেন। আর্থিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে। ১৮৮২ সালে বাংলাদেশে জনমতের চাপে ইংরাজ সরকার কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মেয়েদের পড়বার ব্যবস্থা করলেন। কাদম্বিনী বসু সেই বছরই ডাক্তারী পড়তে আরম্ভ করলেন এবং ১৮৮৮ সালে ডাক্তারী পাশ করে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন।

* Condition of Bengali Women around the second half of the 19th century—Dr. (Mrs) Usha Chakroborty (Cal. 1963) Chapter III and Chapter V

অবশ্য মেয়েদের উপার্জনের প্রয়াস সে যুগ মেনে নিতে পারে নি। ফলে নিন্দার উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল। কিন্তু প্রথম মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (বসু) হতাশ হন নি। তিনি বিলাতেও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান ও সসম্মানে এডিনবরা, গ্লাসগো ও ডাবলিনে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৯৩)। নারী আন্দোলন কাজেই নূতন বিবর্তনের পথ অতিক্রম করে। নারীর আর্থিক স্বাধীনতার স্বপ্ন সম্ভাব্য বাস্তবে রূপায়িত হবার ইঙ্গিত দেখা দেয়।

বাস্তবিক বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে একের পর এক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেশকে এমনভাবে নাড়া দিল যে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরাও আর্থিক চাপে ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য হল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা বহু আগে থেকেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে অভ্যস্থ ছিল। শিল্প-বিপ্লব এ দেশে আরম্ভ হবারও আগে, যখন অর্থনৈতিক কাঠামো গ্রামকেন্দ্রিক কুটিরশিল্প প্রধান তখনও আমরা দেখেছি যে চাষী, জোলা, তাঁতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গরীব মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমভাবে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছে। তারপর শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ প্রথমেই আঘাত হানলো দেশজ শিল্পগুলির উপর। ফলে কুটিরশিল্প বাংলাদেশে ধ্বংস হতে চললো। তখন অসংখ্য কর্মচ্যুত, দরিদ্র নিপীড়িত গ্রামের মানুষ ইংরাজ বণিকের মূলধনপুষ্ট কলকাতা শহরে কলকারখানায় কাজের আশায় ভিড় করতে লাগলো। এদের মধ্যে গ্রামের মেয়েরাও ছিল প্রচুর। তারা পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন কলকারখানায়, চায়ের বাগিচায় কুলির কাজ করতে বাধ্য হল। কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজে মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন হলেও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ তখনও অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র।

বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগের দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাই মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মানসিকতায় প্রচণ্ড বিপ্লব আনলো। ফলে, চিকিৎসা বিভাগে, আইন বিভাগে, শিক্ষা বিভাগে এবং সাধারণ অফিসগুলিতে ক্রমবর্ধমান হারে মেয়েরা এগিয়ে এল। নারীমুক্তি আন্দোলন আর একটি স্তর অতিক্রম করলো। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তবে পরিণত হল।

স্বাধীন ভারতে নারী আন্দোলন আরও এগিয়ে চললো। স্বাধীন ভারত নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ সজাগ। ১৯৫৫ সালের হিন্দু-বিবাহ

আইন ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন নারীসমাজকে নূতন দিক-দর্শনে উদ্বুদ্ধ করলো। হিন্দু বিবাহ আইন বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারে স্বীকৃতি দিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনকে অনেকখানি এগিয়ে দিল তেমনি প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার কাঠামোও অনেকাংশে গড়ে তুললো। হিন্দু বিবাহ আইন অত্যাচারী রোগাক্রান্ত স্বামীর কবল থেকে নারীসমাজকে মুক্তির পথ দেখালো। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বহুদিনের সামাজিক একটি বৈষম্যের অবসান ঘটালো।

বিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশকে বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন সাফল্যের পথ বেয়ে সমাজজীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই। আজকের বাঙ্গালী নারী নারী-পুরুষের চিরন্তন বৈষম্যের বেড়া অনেকটাই ভেঙ্গে ফেলেছে। আইনের দৃষ্টিতে, আমাদের সংবিধানের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর বৈষম্য বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু বাস্তবে সাফল্যের মূল্যায়ন অত সহজ নয়। মানসিকতার পরিবর্তন যে আসে নি। তাই নারী মুক্তি আন্দোলনকে এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। এখনও অনেক সংগ্রাম বাকী রয়ে গেছে। সে সংগ্রাম মানসিকতার বিরুদ্ধে, সে সংগ্রাম সমাজজীবনের প্রগতি আনবার জন্য, সে সংগ্রাম নারীসমাজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।

আশার কথা এই যে নারীমুক্তি আন্দোলনের সেই অগ্রগতির পথে বাঙ্গালী নারীর অনেক শরিক আছে। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ আমাদের দেখিয়েছে যে পৃথিবীর সকল দেশগুলিতেই নারীমুক্তি আন্দোলনে অনেক ফাঁক, অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। আশার কথা এইটিই যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালে যে মানবিক অধিকারের সনদ ঘোষণা করেছিলেন তারই পরিপূরক হিসাবে ১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর নারী জাতির প্রতি বৈষম্য অবসানের ঘোষণা পত্র প্রকাশ করেন। তারই ফলে ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রূপে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।* এই সুযোগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে আমরাও দেখতে পারি আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলনে কোথায় ফাঁক থেকে গেল এবং নারীসমাজের অগ্রগতির জন্য কি আমাদের করনীয়। সুখের কথা এই যে কলকারখানায় মজুরীর ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর যে বৈষম্য ছিল আমাদের সরকার তার সম্বন্ধে অবহিত এবং আইন করে ঐ বৈষম্য অবসানের চেষ্টাও চলছে।

---

* মূল্যায়ন : ১১ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৮২ : নারীজাতির প্রতি বৈষম্য অবসানের ঘোষণাপত্র।

প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তুলবার জন্য আমাদের ভাবতে হবে আবহমান-কাল থেকে গড়ে ওঠা কিছু সংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কথা। এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও আমরা অনেকেই ভাবতে অভ্যস্থ যে পুরুষদের তুলনায় মেয়েরা নিকৃষ্ট। এই অমূলক চিন্তার অবসান না ঘটাতে পারলে মানসিকতার পরিবর্তন আসবে না। ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনও সর্বাংশে সার্থক হয়ে উঠবে না।

আমাদের ভাবতে হবে দাম্পত্য গ্রহণের ব্যাপারে নারীর পুরুষের মত অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবী আজ অনেক ছোট হয়ে এসেছে। জাতীয়তা পথ করে দিচ্ছে আন্তর্জাতিকতাকে। ক্রমেই আন্তর্দেশীয় বিবাহ বর্ধমান। প্রসঙ্গত পরিবর্তনের প্রশ্ন এসেই যাচ্ছে। নিজের জাতিত্ব বজায় রাখা, পরিবর্তন করা বা নূতন জাতিত্ব গ্রহণের ব্যাপারে নারীরও পুরুষের মতই অধিকার থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে পরিবারগুলি ক্রমেই স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ উপার্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কাজেই পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর সমান মর্যাদার নীতি গৃহীত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাও স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এখন মেয়েরাও অনেকটাই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের স্বীকৃতি পেয়েছে তবুও বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত শিক্ষিত শ্রেণীতে বিরল প্রায় হয়ে এসেছে সত্য তবুও অনুন্নত গ্রাম্যসমাজের কথা ভেবে আমাদেরও বিবাহের একটি ন্যূনতম বয়স নির্ধারিত করে আইন প্রণয়ন ও সেই আইন বলবৎ করার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলন অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। আবার এই সার্থকতার কথা ভেবে বৃথা আত্মতুষ্টির মনোভাব পোষণ করাও অনুচিত। করণীয় অনেক যে থেকে গেল। শোষণভিত্তিক সমাজে নারীমুক্তির সম্পূর্ণতা সম্ভব নয়—তাই নারীমুক্তিকে সম্পূর্ণতা দিতে হলে চাই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন—সমাজে সবরকম শোষণের অবসান।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের "নতুন পর্যায়" —একটি আলোচনা

—পর্যবেক্ষক

[ভিকটর জোরজা প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদের উকীল মোক্তাররা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তীব্র মতভেদের খবর খুব ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করেছেন। এঁদের টিকা টিপ্পনীসহ দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি অনুধাবন করলে একটি জিনিস বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটা হল এই যে, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিভেদ সৃষ্টি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা। আর এরই সঙ্গে থাকছে লিওনিদ ব্রেজনেভের অপসারণ বা অবসরগ্রহণ সংক্রান্ত জল্পনা-কল্পনা এবং দাঁতাত বা সমঝওতার দিন ফুরিয়ে আসছে অর্থাৎ আবার ঠাণ্ডাযুদ্ধের পালা আসছে এই কথাটা লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। অনেকদিন থেকেই পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা ও সংকট নিয়ে কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী মহলে জোর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছে। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ, কমিউনিস্টরা আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমেই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে চায়। কমিউনিস্ট মহলের এই আলোচনাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সমর্থক বুদ্ধিজীবীর দল এমন হৈ-চৈ সৃষ্টি করেছেন যেন মনে হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া শুধু নয়, সারা জগতেই কমিউনিস্টদের মধ্যে প্রবল বিরোধ বেধে গেছে। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক মহলগুলি এই ধরনের অপপ্রচার সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তথা বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে ও থাকবে।]

—সম্পাদক

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট এখন কোন্ স্তরে উপনীত হয়েছে এবং তা' কি ধরনের অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে এই সব প্রশ্ন নিয়ে এখন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী অর্থনীতিবিদরা বিশদভাবে গবেষণা ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইসব গবেষণা ও আলোচনায় মতপার্থক্যও চোখে পড়ে।

সম্প্রতি ফ্রান্সের মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা আজকের দিনের পুঁজিবাদের মূল সমস্যাগুলি অনুধাবন করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এঁদের প্রবন্ধ সমূহের সংকলন "রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজিবাদ—তত্ত্ব ও কর্মের বর্তমান সমস্যাগুলি" এই নামে প্রকাশিত হয়েছে ফরাসী ভাষায়। এই গ্রন্থের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হলেও এখনও পর্যন্ত ইংরাজী অনুবাদ হয় নি। তবু ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত সোভিয়েত পত্রিকা সমূহের সমালোচনা থেকে এই গ্রন্থের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না।

সাধারণত: মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা বিশেষ করে সোভিয়েত অর্থনীতি-বিদরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট দু'টি স্তর অতিক্রম করে এখন তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়েছে। এই তৃতীয় স্তরে পুঁজিবাদ এক অভূতপূর্ব সংকটের সম্মুখীন হয়েছে যার সমাধান করার ক্ষমতা আর তার নেই।

ফরাসী মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, এখন **রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির সংকট, পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের একটা নতুন পর্যায় শুরু হয়েছে**। এই পর্যায়ের দ্বৈত ও পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তাঁরা বলেছেন: "কাজেই রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদের আরও বিকাশলাভের পর্যায় ('ক্রমানুসরণতা') এবং নতুন (ব্যাপার সংঘটনের পূর্ববর্তী পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকছে না) একটি পর্যায়ও বটে।" "ক্রমানুসরণতা'র অর্থ হল রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একচেটিয়া পুঁজির ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু একই পর্যায়ে 'ক্রমানুসরনতা'র বিরতি ঘটছে এবং সম্পূর্ণ নতুন এক ব্যবস্থা গড়ে উঠছে।

ফরাসী অর্থনীতিবিদদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোন তফাৎ নেই। লেনিন বলেছেন .."রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের জন্য একটি সম্পূর্ণ বৈষয়িক প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের দ্বারদেশ, ইতিহাসের মই-এর একটি ধাপ যে ধাপ ও সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত ধাপের মধ্যে আর কোন মধ্যবর্তী ধাপ নেই।" ফরাসী অর্থনীতিবিদের লেখায় যে পরিভাষাই ব্যবহার করা

হোক না কেন তাঁরা যা বলেছেন তাতে এ কথাই স্বীকার করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজিবাদ গুণগতভাবে একটি স্বতন্ত্র জিনিস। লক্ষ্য করার বিষয় ফরাসী মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা কোন "স্তরের" উল্লেখ করেন নি যা থেকে ধরে নেওয়া যায় তাঁরা যে "নতুন পর্যায়ে"র কথা বলেছেন তা' পূর্বে উল্লিখিত তৃতীয় স্তরের "নতুন পর্যায়।"

রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সংকট যা পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের নতুন পর্যায় তা কবে থেকে শুরু হল? এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, ১৯৬৭ সালের শেষভাগে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু থাকার পক্ষে গুণগতভাবে নতুন ও আরও কঠিন অবস্থা শুরু হয় এবং সারা ১৯৬৮ সাল ধরে এই অবস্থা চলে। ১৯৬৮ সাল থেকে সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়ায় একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী শ্রেণীসংগ্রাম অভূতপূর্বভাবে তীব্র হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে ১৯৬৮ সালের মে ও জুন মাসে, ১৯৬৯ সালের শরৎকালে ইতালী ও সুইডেনে এবং জাপান, লাতিন আমেরিকা, গ্রীস, পর্তুগালে ও আরব দেশগুলিতে মেহনতি জনগণের সংগ্রামের উল্লেখ করা যেতে পারে। পুঁজিবাদের তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা সর্বব্যাপী সংকটের পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদের নতুন পর্যায়ে উত্তরণ ঘটছে। ধনিকসমাজ যেসব বিপত্তির সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলি দেখা দিচ্ছে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ায়। এই কারণেই পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের নতুন পর্যায়ে উপনীত হওয়ার কথা বলা সম্ভব হচ্ছে, আর একথাও বলা সম্ভব হচ্ছে যে, এই সংকট সকল ক্ষেত্রেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে।

ফরাসী-মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা "নতুন পর্যায়ে"র ধারণার সমর্থনে বহু তথ্য ও যুক্তির সমাবেশ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন: প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তির সংকট চক্রাবর্তিত সামগ্রিক মন্দার (রিসেশন) কাঠামো অতিক্রম করেছে। এই সব মন্দা, এখন, ক্রমেই আরো অনিয়মিতভাবে দেখা দিচ্ছে এবং অবিরত বেড়ে ওঠা মুদ্রাস্ফীতিকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা এই সব মন্দার ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, "নতুন পর্যায়ে"র বৈশিষ্ট্য হল বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে বাজার সংক্রান্ত বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠা এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ক্রম-বর্ধমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অ-স্থিতিশীলতা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা, জ্বালানী ও কাঁচামালের সংকট কোনক্রমেই সাময়িক নয়। রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজি

পরিবেশ রক্ষা করতেও অসমর্থ এবং তার ফলে পরিবেশগত ভারসাম্যের পক্ষে বিপদ গুরুতর আকার ধারণ করছে।

তৃতীয়ত, আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ, বিশেষ করে, আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রধান তিনটি কেন্দ্রের—পশ্চিম ইয়োরোপ, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—মধ্যে বিরোধ আরও প্রবল হয়ে উঠছে। বিশ্ব পুঁজিবাদকে স্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে অনুসৃত সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি এবং তার বহু সামরিক-রাজনৈতিক মতবাদ এখন সংকটের আবর্তে পাক খাচ্ছে।

সর্বশেষে বলা যায় যে, সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদানগুলির অবিরত বর্ধমান প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। এইসব উপাদান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে ক্ষয় করে দিচ্ছে। যেমন, ক্রমেই আরও স্বল্পস্থায়ী হয়ে ওঠা অর্থনৈতিক জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান ধর্মঘট-আন্দোলন, ছোট ও মাঝারি শিল্প-সংস্থাগুলির ক্রমতর ক্ষয় এবং একচেটিয়া ধনপতিচক্রের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার অধিক থেকে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে-ওঠা প্রবণতা।

পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে ফরাসী অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন কেমন করে পশ্চিমের শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫৪ সালের তুলনায় ফ্রান্সে মজুরী পান এমন সব শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৬৮ সালে ২৭ লক্ষ বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৫২ লক্ষ (সুস্থ সবল ও সক্রিয় ২ কোটি ৫ লক্ষ মানুষের মধ্যে) অর্থাৎ ৬২ শতাংশ থেকে ৭৬ শতাংশ বাড়ে। শ্রমিকশ্রেণীর মানুষের সংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ হল ছোট ও মাঝারি চাষীর ক্রমেই অধিক সংখ্যায় জোতজমি হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হওয়া। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে উপার্জনকারী মোট মানুষের মধ্যে এদের অংশ হ্রাস পেয়ে ৩৪·০ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশ দাঁড়ায়।

অবশ্য 'মধ্যবর্তী' স্তরের মানুষদের সর্বহারা হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকলেও মজুরী পায় সমাজের এমন সব নানা ধরনের মানুষ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে গেছে বা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়েছে এমন কথা মনে করা ভুল—এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ফরাসী অর্থনীতিবিদরা। তবে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর "বিলীয়মান হওয়ার" তত্ত্ব মোটেই ঠিক নয়। পুঁজি ও উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণ ও কেন্দ্রীভবন প্রবলভাবে চলতে থাকার ফলে শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সমাজের বাছাই করা গোষ্ঠীর (এলিট) মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন পরিমাণগত (উপার্জনরত মানুষদের মধ্যে

ধনিকশ্রেণীর মানুষের সংখ্যা হ্রাস) এবং গুণগত (ধনিকশ্রেণী এক-চেটিয়া পুঁজিপতি ও অ-পুঁজিপতি এই দুই অংশে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং শেষোক্তরা ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত হচ্ছে)—দুই-ই।

সব মিলে শেষ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামের নতুন নতুন সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। আসল কথা হল একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যতই শক্তিশালী হয়ে উঠছে, ততই তারা আরও বেশী কোণঠাসা বা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কারণ সমাজের উপর তাদের "লৌহমুষ্টির" চাপ বাস্তবক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য অংশের প্রবলতর প্রতিরোধের জন্য সম্মিলিত হতে সাহায্য করছে।

ফরাসী অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের আমলে ধনপতিচক্র (ফিনানসিয়াল আলগারকি) ধনিক রাষ্ট্রের প্রবল সমর্থন-লাভ করে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে বিরাট সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছে, গড়ে তুলছে মহাকায় প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো যাচ্ছে না, বরং বিদেশে বাজার দখলের জন্য বিভিন্ন উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠছে।

আজকের দিনে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনে ধনিক রাষ্ট্রের ভূমিকা ও স্থান সম্পর্কে ফরাসী অর্থনীতিবিদদের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে আজকের দিনের উন্নত পুঁজিবাদের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের লগ্নী (স্টেট ফিনানসিং)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রের লগ্নীর পরিমাণ দ্রুত বেড়ে চলেছে। এটা প্রতিফলিত হচ্ছে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বাজেটের বিরাট বৃদ্ধির মধ্যে। বৃহত্তম একচেটিয়া পুঁজি-পতিদের স্বার্থে জাতীয় পুনর্বণ্টনের জন্য বাজেট যন্ত্রকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

লগ্নী-পুঁজির (ফিনান্স ক্যাপিটাল) ধারণার প্রকৃত বিষয়বস্তুকে ফরাসী অর্থনীতিবিদরা ব্যাপকতর রূপ দিয়েছেন। তাঁদের মতে লগ্নী-পুঁজি এখন শুধু শিল্প-পুঁজি ও ব্যাঙ্ক-পুঁজির স্বতস্ফূর্ত মিলনের ফল নয়, ধনিক-রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মনীতি ও তৎপরতার ফলও বটে।

ফরাসী মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদরা তাঁদের গ্রন্থে পুঁজির "অতি-সঞ্চয়" তত্ত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এঁদের বক্তব্য ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থনৈতিক দপ্তর মেনে নিয়েছেন। ফরাসী মার্কস-বাদী অর্থনীতিবিদদের অন্যতম এবং ফ্রান্সের একোনমি এত পোলিতিক

(পারি) পত্রিকার প্রধান সম্পাদক পল বোকারা "অতি-সঞ্চয়" তত্ত্ব প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত **ইণ্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স** পত্রিকায় (৩য় সংখ্যা- ১৯৭৫) লিখেছেন যে, রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির প্রকৃতি এবং তার বর্তমান সংকটকে অনুধাবন করতে হলে মার্কস যে ব্যাপারটিকে পুঁজির "অতি-সঞ্চয়" (সুপার-এ্যাকুমুলেশন) বলে অভিহিত করেছেন সর্বোপরি সেই ব্যাপারটির প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। **পুঁজির "অতি সঞ্চয়" বলতে বোঝায় পুঁজির প্রভূত পরিমাণ আধিক্য যার ফলে পুঁজির লাভজনক লগ্নী কঠিন হয়ে ওঠে।**

এর ফলে মুনাফার হার বাড়ানোর জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতা যে পদ্ধতিতে চলে তার ফলে আরও অতি-উৎপাদন ঘটতে থাকে। নতুন করে শ্রমের উৎপাদন-শীলতা বৃদ্ধি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকায় ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী বেকারি দেখা দেয়।

এর নিট ফল দাঁড়ায় এই যে, দীর্ঘ ঐতিহাসিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যে সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে সেই কাঠামোর মধ্যে এক নতুন ও ব্যাপকতর ভিত্তিতে দেখা দেয় পুঁজিবাদের আত তীব্র বিরোধিতা। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠার প্রবণতাও দেখা দেয়। রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সংঘর্ষের মূল লক্ষণগুলি হল নিম্নরূপ :

১) রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী অতি-সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া চলে। এই কারণেই ধনিক রাষ্ট্রের চিরাচরিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পরিমানের পথ খুঁজে বের করা আর সম্ভব হয় না—যেমন, ১৯১৪ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সম্ভব হয়েছিল।

২) বর্তমান অবস্থায় শুধু পুঁজির জৈব গঠন খুব লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায় না অর্থাৎ শুধু পরিবর্তনীয় পুঁজি তুলনায় স্থায়ী পুঁজি অনুপাত খুব বেড়ে যায় না। উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে গবেষণা ও শিক্ষাবাবদও বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর থেকে এই ধরনের উৎপাদন বাহির্ভূত শ্রমের বিকাশ সাধনের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

৩) অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিক সংগঠন এবং গণতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিক চিন্তাধারা দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের তুলনায় দৃঢ়তর ও প্রবলতর

হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন অংশে থেকে আরও বেশী সংখ্যায় মানুষ শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় (যেমন, ইনজিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ, বিজ্ঞানী প্রভৃতি) একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী-সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

৪) বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল : প্রথমত, একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমস্ত অনুন্নত বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎ-পদ দেশে প্রবল হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "নেতৃত্ব" থেকে মুক্তিলাভের জন্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে। তৃতীয়ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল : সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অপ্রতিহত অগ্রগতি। এখন গড়ে উঠেছে এই সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া যা উন্নত সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে প্রবেশ করছে বা প্রবেশ করতে চলেছে।

লক্ষণগুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে ৭০-এর দশকের যে মহামন্দা আবার পুঁজিবাদী দুনিয়ার ভিত টলিয়ে দিচ্ছে তা' নিছক অর্থনৈতিক মন্দা নয়, পুঁজিবাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত কাঠামোর সংকটও বটে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের মধ্যে নিহিত সমস্ত স্ববিরোধের বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই বিস্ফোরণের মধ্যে চক্রাবর্তিত অতি উৎপাদনের সঙ্গে আজ জড়িয়ে গেছে মুদ্রা, অর্থ, শক্তি ও কাঁচামালের সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক লেনদেনে বিশৃংখলা এবং তীব্র সামাজিক বিরোধ।

সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়া আজ বিপন্ন হওয়ায় কোন পুঁজিবাদী দেশই পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে কাঁচামাল ও তেলের দর দ্রুত বাড়তে থাকলে বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের টনক নড়ে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়েছে বলে এঁরা আর্তনাদ করে ওঠেন এবং মধ্যপ্রাচ্যে তেলের দর বৃদ্ধি সংকটের কারণ সাব্যস্ত করে এঁরা মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির ঘাড়ে দোষ চাপান। আসলে সংকটের সূচনা হয় ১৯৬৮ সালে এবং সংকট তীব্র আকার ধারণ করে ১৯৭৩ সালে। ১৯৬৮ সালেই পশ্চিমী দুনিয়ায় মুদ্রা ও অর্থসংকট, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পাওনার চেয়ে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

কাঁচামাল ও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি অকারণে দাম বাড়ায় নি। মুনাফার হার ও ঋণ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ক্রমাগত

তাদের শিল্পজাত পণ্যসমূহের দাম বাড়িয়ে যেতে থাকার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং এর ফলে কার্যত ডলারের মূল্য হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতি ও ডলারের মূল্য হ্রাসের ধাক্কা সামলানোর জন্যই কাঁচামাল ও তেল সরবরাহকারী দেশগুলি তাদের পণ্যের দাম বাড়াতে বাধ্য হয়। একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী, বিশেষ করে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী, নানাভাবে ভয় দেখিয়ে এমন কি বলপ্রয়োগের হুমকি দিয়েও কাঁচামাল ও তেল সরবরাহকারী দেশগুলিকে বাগে আনার চেষ্টা করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সফলকামও হচ্ছে। এর ফলে সারা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক ভারসাম্য ক্ষুণ্ন হচ্ছে। একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীর আধিপত্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টার বিরুদ্ধে এখন রুখে দাঁড়াচ্ছে আরব দেশগুলি সহ তৃতীয় দুনিয়ার বেশ কিছুসংখ্যক দেশ। অতি-সঞ্চয়ের দীর্ঘ প্রক্রিয়া এই সময় থেকেই শুরু হয়। দীর্ঘমেয়াদী তীব্রতর অতি-সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যবিরোধও তীব্র হয়ে উঠেছে। পুঁজির দীর্ঘমেয়াদী রপ্তানী ও ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্যে পুঁজি স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠছে। সমস্ত ঝামেলার বোঝা একে অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

এরই মধ্যে চলেছে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে জোট বাঁধার প্রচেষ্টা (যেমন, ইয়োরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা কমন মার্কেট, অতলান্তিক যুদ্ধ জোট ইত্যাদি)। আবার এইসব গোষ্ঠী ও জোটের মধ্যে বাধছে প্রচণ্ড বিরোধ থেকে থেকে। এইভাবে সংহতি ও বিরোধ রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বাস্তব বিরোধগুলিকে প্রকট ও তীব্র করে তুলছে।

একচেটিয়া পুঁজিবাদ বর্তমান অবস্থায় নানা উপায়ে শ্রমিকশ্রেণীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে মুনাফা বজায় রাখার চেষ্টা করছে। মুদ্রাস্ফীতি এমন একটি উপায়। এর প্রচণ্ড আঘাতে সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী জর্জরিত। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একচেটিয়া পুঁজিবিরোধী সংগ্রাম ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। সমগ্র সমাজের উপর এই সংগ্রামের প্রভাব পড়ছে।

সংক্ষেপে এই হল অতি-সঞ্চয় সম্পর্কে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য।

সোভিয়েত অর্থনীতিবিদের ভিন্ন মত

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট অর্থনীতিবিদদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নে স্বীকৃত হলেও সোভিয়েত অর্থনীতিবিদরা "অতি-সঞ্চয়" সংক্রান্ত বক্তব্য মেনে নিতে পারেন নি। অধ্যাপক ডাঃ আই. কুজমিনোভ গত জুন মাসের **ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স** পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা থেকে ('পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের কয়েকটি দিক') এটা বুঝতে পারা যায়।

অধ্যাপক কুজমিনোভ পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্য এবং তার ভিত্তিতে রচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্ম-সূচীর সিদ্ধান্তের (১৯৬১ সালে গৃহীত) উল্লেখ করে বলেছেন :

"বর্তমান স্তরে পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট গভীর থেকে গভীরতর হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই গভীর হওয়ার প্রক্রিয়া জটিল ও বহুরূপী। এই কারণেই এই প্রক্রিয়ার একপেশে ব্যাখ্যার চেষ্টাতে, যেমন, এই প্রক্রিয়াতে রাষ্ট্রবিধৃত একচেটিয়া পুঁজিবাদের সংকট, অথবা অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সংকট, সাম্রাজ্যবাদের অর্থব্যবস্থার সংকট ইত্যাদিতে পরিণত করার চেষ্টাকে মেনে নেওয়া যায় না। পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটকে সঠিকভাবেই সর্বব্যাপী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কারণ এটা সমগ্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, তার ভিত্তি থেকে উপরের সৌধ পর্যন্ত সর্বব্যাপী সংকট; এটা **সর্বরূপে ও সর্বস্তরে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার একেবারে ভিত্তির সংকট, কারণ অনেকদিন আগেই আধুনিক উৎপাদিকা শক্তিগুলি তার কাঠামো ছাড়িয়ে গেছে।** কিন্তু এ থেকে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তগুলির ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে, যেমন, "সরল একচেটিয়া পুঁজিবাদে" অথবা অবাধ প্রতি-যোগিতার পুঁজিবাদে ফিরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আজকের দিনে পুঁজিবাদ থেকে একটি পথই বেরিয়ে এসেছে এবং সে পথ গেছে সমাজতন্ত্রের দিকে। "রাষ্ট্রবিধৃত পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের জন্য একটা সম্পূর্ণ বৈষয়িক প্রস্তুতি, সমাজতন্ত্রের দ্বারদেশ, ইতিহাসের মই-এর একটি ধাপ, যে ধাপ ও সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত ধাপের মধ্যে মধ্যবর্তী কোন ধাপ নেই" (লেনিন সংগৃহীত রচনাবলী, ২৫ খণ্ড)।

অধ্যাপক কুজমিনোভ উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোচনার পর। আলোচনাকালে অধ্যাপক কুণ্ডমিনোভ বলেছেন যে, পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট গভীরতর হওয়ার পিছনে যে প্রধান কারণ রয়েছে তা হল উৎপাদিকা শক্তিসমূহ ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যে বিরোধিতার তীব্রতা বৃদ্ধি। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের পক্ষে উৎপাদনগুলি একেবারে সংকীর্ণ হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন স্থানু হয়ে যায় নি। ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে শিল্প ৩·৫৫ গুণ (উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির ৩·৩৪ গুণ বৃদ্ধি ধরে) বেড়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধি পুঁজিবাদী সম্পর্ক সমূহের সংকীর্ণ কাঠামোর মধ্যে ক্রমেই বেশী করে ব্যাহত হচ্ছে। লেনিন যেমন বলেছিলেন ঠিক সেইভাবেই এই বৃদ্ধি ক্রমেই বেশী করে অ-সমান হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেশের অ-সমান বিকাশ ঘটবার ফলে দুনিয়ায় উৎপাদনে তাদের অংশের পরিবর্তন ঘটছে। যেমন, ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে পুঁজিবাদী দুনিয়ার উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ৫৪·৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩৯·৮ শতাংশ। ব্রিটেনের অংশ ১০·২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫·৫ শতাংশ। আবার জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর অংশ বেড়ে যথাক্রমে ১·২ শতাংশ থেকে ৯·২ শতাংশ এবং ৩·৬ শতাংশ থেকে ৮·১ শতাংশ দাঁড়ায়। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বাজারে রপ্তানীকারী দেশগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, আবার অভ্যন্তরীণ বাজারেও প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মহাযুদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিপ্লব বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলা ক্রমেই একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের পরিণতি দেখা যায় বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ মহাযুদ্ধের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট শিল্প-সামর্থ নিয়ে। মহাযুদ্ধের পর এই সব দেশে সংকট দেখা দেয় ঘন ঘন। মনে রাখতে হবে যে, দীর্ঘমেয়াদী সংকটের (১০-১২ বছর স্থায়ী) মত মূল চক্রাবর্তিত সংকট ছাড়াও আছে মধ্যবর্তী সংকট।

অন্যদিকে মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় বিপর্যস্ত যে সব দেশের শিল্প-সামর্থ হ্রাস পেয়েছিল সে সব দেশ প্রথম দিকে চক্রাবর্তিত ওঠা-নামা বা তেজী-মন্দার উপর তেমন নির্ভরশীল ছিল না।

সমগ্রভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যে পরিস্থিতি দেখা দিল তাকে বলা যায় পুঁজিবাদী দুনিয়ার চক্রাবর্তনের বি-সমকালীনতা (ডিসিংক্রোনাইজেশন)। এই অবস্থায় কোন কোন দেশে সংকটের ধাক্কায় উৎপাদন স্থানু হয়ে এল বা হ্রাস পেল, আবার কোন কোন দেশে উৎপাদন বাড়তে থাকল। ফল দাঁড়াল এই যে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে সাময়িক মন্দা কিছুটা হ্রাস পেল, আবার অন্যদিকে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠার এবং জাপান ও পশ্চিম জার্মানীর মত দেশে তথাকথিত "অর্থনৈতিক অলৌকিক" ব্যাপারের গালগল্প চালু হতে লাগল।

অবশ্য এই বিভ্রান্তি পুঁজিবাদী বাস্তবতার প্রচণ্ড আঘাতে অচিরকালের মধ্যেই কেটে গেল। বর্তমান স্তর উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, বিশ্ব পুঁজিবাদী চক্রাবর্তনের ধারার সমকালীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সমস্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশ একটি অখণ্ড চক্রাবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়েছে। এই স্তরে মধ্যবর্তী সংকট আর শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিচ্ছে না। এ সব বহু পশ্চিমী দেশের অর্থনীতিতে প্রভাবিত করছে। এর ফলে অধিকাংশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদন হ্রাস এবং সংকট দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার স্পষ্ট প্রবল হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৬৯-১৯৭১ সালে চক্রাবর্তিত সংকট শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন নয়, ইতালী, সুইডেন প্রভৃতি বহু দেশের উপর আঘাত হানে। ১৯৭৪ সালের সংকটে আরও দেশ জেরবার হয়ে গেছে। ১৯৭৪ সালের সংকটকে মধ্যবর্তী সংকট বলে গণ্য করার যথেষ্ট হেতু আছে। বিশ্ব চক্রাবর্তনের সমকালীনতার অর্থ অর্থনৈতিক সংকট সমূহের গভীরতর হয়ে ওঠা। এই সব সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মুদ্রাস্ফীতির মাঝে মাঝে ঘটা প্রক্রিয়া থেকে স্থায়ী প্রক্রিয়ায় পরিণত হওয়া। মুদ্রাস্ফীতি এখন চক্রাবর্তনের প্রত্যেক পর্যায়ে দেখা দিচ্ছে এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আজকের দিনের পুঁজিবাদ এক বিস্ময়কর কুটাভাস সৃষ্টি করেছে: শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন সামর্থ বাড়ছে যার অর্থ ইউনিট প্রতি উৎপাদনের খরচা কম পড়ছে। কিন্তু দাম কমা দূরের কথা দাম বেড়েই চলেছে।

এর ফলে সংকট থেকে পরিত্রাণ-লাভ কঠিন হয়ে উঠছে। অতীতের অর্থনৈতিক সংকট আপনা থেকেই পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করত। সংকট কালে দাম পড়ে যেত, ফলে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যেত। ধীরে ধীরে

পূর্বাবস্থা ফিরে আসত। তাই চক্রাবর্তিত সংকট স্থায়ী আতঙ্কের সৃষ্টি করত না।

এখন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা চড়া দর বজায় রেখে সুযোগ লুটতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে উৎপাদন-যন্ত্রগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগান না। বর্তমান স্তরে উৎপাদন-ক্ষমতা কম কাজে লাগানোর প্রকৃত কারণ পুঁজির অতি-সঞ্চয় অথবা মুনাফার হার পড়ে যাওয়া নয়। প্রকৃত কারণ হল একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আধিপত্য ও তাদের একচেটিয়া মুনাফা বাড়ানোর লালসা। এই কম কাজে-লাগানো (আনডারইউটিলিজেশন) এখন যে বেশ স্থায়ী হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের সারণিতে :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য প্রস্তুত করার ব্যাপারে উৎপাদনের সুযোগ সুবিধার ব্যবহার

বছর	সুযোগ সুবিধার শতকরা ব্যবহার	বছর	সুযোগ সুবিধা শতকরা ব্যবহার	বছর	
১৯৫০	৯১·৯	১৯৫৮	৭৫·১	১৯৬৬	৯১·৯
১৯৫১	৯৫·১	১৯৫৯	৮১·৪	১৯৬৭	৮৭·৯
১৯৫২	৯২·৮	১৯৬০	৮০·১	১৯৬৮	৮৭·৭
১৯৫৩	৯৫·৬	১৯৬১	৭৭·৮	১৯৬৯	৮৬·৫
১৯৫৪	৮৪·১	১৯৬২	৮১·৪	১৯৭০	৭৮·১
১৯৫৫	৯০·০	১৯৬৩	৮৩·০	১৯৭১	৭৫·১
১৯৫৬	৮৮·২	১৯৬৪	৮৫·৫	১৯৭২	৭৮·৬
১৯৫৭	৮৪·৫	১৯৬৫	৮৯·০	১৯৭৩	৮৩·০
				১৯৭৪	৮০·০

এই পরিসংখ্যানে প্রকৃত অবস্থার ছবি হয়তো পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মুনাফা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উৎপাদন-ক্ষমতার কম ব্যবহারকে কি রকম স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করেছে তার স্পষ্ট প্রমাণ এতে পাওয়া যাচ্ছে।

উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে না লাগিয়ে বা সীমিত রেখে চড়া হারে মুনাফা লোটার প্রবৃত্তি ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতি মহলেও বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। যেমন, বনস্পতি ও বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন কমেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দুটি শিল্পের উল্লেখ করা হল। অন্যান্য শিল্পেই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি ইকনমিক টাইমস্-এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৯৭০ সালে

বস্ত্রশিল্পে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও মোটা মুনাফা হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ শতাংশ কম ব্যবহার করে উৎপাদন ২·১ শতাংশ কমানো হয়, অথচ মুনাফা বাড়ে ৫০·১ শতাংশ।

উৎপাদন ক্ষমতা কম কাজে লাগানোর মারাত্মক ফল হল স্থায়ী ও ব্যাপক বেকারী।

১৯৭৩-৭৪ সালে ৩৫৫টি বড় বড় কোম্পানী (প্রত্যেক কোম্পানীর আদায়ীকৃত পুঁজি এক কোটি টাকার উপর) কাজ কারবার অনুধাবন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে দেখানো হয় যে, নীট বিক্রয়ের বৃদ্ধির হার ১০·৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৭·৫ শতাংশ দাঁড়ালেও মোট মুনাফা ২৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬২০ কোটি টাকা অর্থাৎ মুনাফা ১৫·৭ শতাংশ বেড়েছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল কর দেওয়ার পরেও যে মুনাফা থাকে তা ৫৬ কোটি টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ কোটি টাকা অর্থাৎ মুনাফা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় দুনিয়ায় কিছুটা উন্নত দেশগুলিসহ পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়ে একই খেলা চলেছে যার পরিণতি হবে ভয়াবহ। কিন্তু অর্থনৈতিক ধনপতিগোষ্ঠী অনিবার্য ভাবেই সেই পরিণতির দিকে তাঁদের দেশগুলিকে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকদের জীবন, মেহনতি জনগণের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। এর উপর আছে করের বোঝা যা প্রত্যক্ষভাবে সামরিক বাজেটের স্ফীতির সঙ্গে যুক্ত।

সামরিক বাজেট বেড়ে চলা এবং অর্থনীতির সামরিকীকরণ অনেক দিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সংকট-নিরোধের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, কারণ উৎপাদিকা শক্তিগুলি ধ্বংস করার পক্ষে এইগুলিই হল সবচেয়ে সর্বজনীন ও কার্যকর হাতিয়ার। জনগণের শ্রম অপচয় ও সঞ্চিত ঐশ্বর্য ধ্বংস ব্যাপারটি এখন এক অভূতপূর্ব পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদনের উপায় সমূহের বিপুল সঞ্চয়, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য অভিযান এবং জনগণের সীমিত ক্রয়শক্তি সব মিলে **পুঁজিবাদী উৎপাদনকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে উৎপাদনে পরিণত করতে চলেছে।**

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, যুদ্ধ সাধারণত অর্থনৈতিক

সংকটকে সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রাখার বেশী আর কিছু করতে পারে না। ভিয়েতনাম যুদ্ধই এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। হাজার হাজার কোটি ডলার ঢেলে এবং হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বলি দিয়েও সংকটকে রোধ করা যায় নি। ১৯৬৯ সালের সংকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও বিধ্বংসী অর্থনৈতিক সংকটগুলির অন্যতম। সাম্রাজ্যবাদের আমলে অর্থনীতির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যে কার্যকর হতে পারে না এই সংকট তারই প্রমাণ।

সমরদপ্তর ও শিল্পপতি জোটের নির্দেশে "সংকট নিরোধ ব্যবস্থার কাহিনী"র এটা হল একটিমাত্র অংশ। এই কাহিনীর আরও অংশ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আড়াই লক্ষ কোটি ডলার যার অনুসঙ্গ রূপে মুদ্রা ও অর্থ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং এই সব সংকটের স্থায়ী হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

কর, বেকারি ও দর বৃদ্ধির প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে মেহনতি জনগণকে। আজকের দিনে এসব মেনে নিতে তারা রাজী নয়। ফলে পুঁজিবাদী দুনিয়া জুড়ে ধর্মঘটের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে সংঘর্ষ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

একচেটিয়া পুঁজি পরিত্রাণের পথ খুঁজছে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। চিলিতে ফ্যাসিস্টরাজ কায়েম করা এবং অন্যান্য দেশে ঐ ধরনের রাজ কায়েম করার চেষ্টা এর প্রমাণ। কিন্তু জনগণ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেমন গ্রীস ও পর্তুগালে,—এর জবাব দিচ্ছে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার উন্নত দেশগুলি কয়েক বছর ধরে তথাকথিত শক্তি সংকটের ধাক্কা সামলাচ্ছে। শক্তি-সংকট বলতে প্রধানত তৈল সংকটকেই বোঝায়। সংকট এসেছে দুই আকারে—তেলের অভাব ও তেলের দরবৃদ্ধি।

পেট্রল প্রভৃতির অভাব বড় বড় শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত করছে। কিন্তু শক্তি-সংকট বা জ্বালানী সংকটের কারণ স্রেফ জ্বালানীর অভাব বা জ্বালানী সম্পদের দুর্লভতা বলে মনে করলে ভুল হবে। এই সংকটের পিছনে আছে গভীরতর দুই ধরনের ব্যাপার। বর্তমান স্তরে পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট আরও গভীর হয়ে ওঠার সঙ্গে এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। প্রথম ধরনের ব্যাপারটি হল আবেষ্টনী বা পরিবেশের প্রতি পুঁজিবাদের মনোভাব। শক্তি-সংকট মুনাফা ও ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিপতিদের এখনই কিছু কামিয়ে

নেওয়ার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা উৎপাদন-পদ্ধতির গভীর সংকটের প্রতিফলন। এঙ্গেলস লিখেছেন : "সমাজের মত প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উৎপাদনের বর্তমান পদ্ধতির মাথা-ব্যথা হল প্রধানত শুধু প্রথম, সবচেয়ে ফল নিয়ে।" এর একটি পরিণতি হল আবহাওয়া দূষিত হওয়া, কলকারখানার নোংরা আবর্জনায় জল দূষিত হওয়া এবং খনিজ সম্পদ আহরণে অপচয়।

পুঁজিবাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজকের দিনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলগুলির ব্যাপক ব্যবহার এবং সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য ধনপতিদের অভিযান পরিবেশকে এমন সাংঘাতিকভাবে নষ্ট করছে যে, এর ফলে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে পারে। **এ ব্যাপারটিও উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও উৎপাদন-শক্তি-সমূহের মধ্যে বিরোধের আর একটি অভিব্যক্তি।**

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সদ্যস্বাধীন দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন। শেষোক্ত দেশগুলি এখনও বিশ্ব-বাজারে প্রধানত কাঁচামাল সরবরাহকারী রূপেই বর্তমান। বহুদিন থেকেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশ ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলির (যখন উপনিবেশ বা পরাধীন দেশ ছিল তখন থেকে) মধ্যে বাণিজ্য অ-সমানভাবে চলে আসছে এবং বাণিজ্যে এই অসাম্যই বাঘা বাঘা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মোটা মুনাফার মূল উৎস।

সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে আগের উপনিবেশগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করায় তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সদ্যস্বাধীন দেশগুলি তাদের নিজ নিজ কাঁচামালের সম্পদ দখলে রাখার ও তাদের সুবিধামত বিক্রয় করার এবং বিশ্ব-বাজারে সত্যিকারের সমবিনিময়ের ভিত্তিতে কারবার চালানোর অধিকার দাবি করছে।

কিন্তু উন্নতিকামী দেশগুলির এই সঙ্গত ও বৈধ দাবি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটানোর পক্ষে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তথাকথিত "তৈল ষড়যন্ত্র" নিয়ে হৈ-চৈ করছে, "বেয়াড়া দেশগুলোকে" পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার জন্য হল্লা বাধাচ্ছে। কিন্তু আজকের দিনে পুরাতন কায়দায় কিছু করা সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান পরাক্রম

আজ সমাজ-ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদ ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের শক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের অবিরাম অগ্রগতি আজ অপ্রতিরোধ্য। সারা পৃথিবীর বিকাশের ধারা নির্ধারণে সমাজতন্ত্রই আজ চূড়ান্ত শক্তিরূপে পরিগণিত হতে চলেছে। সমাজ-তন্ত্রে নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের সুযোগ-সুবিধাগুলি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর দেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহ-যোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শোষণহীন সমাজের বিস্ময়কর রূপ আজ বিশ্বমানবের সামনে উদ্ঘাটিত।

বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদন বেড়ে চলেছে বিনা বাধায়, এই ব্যবস্থায় সংকট ও মন্দার কোন স্থান নেই। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে উৎপাদন ৯·১৪ গুণ বেড়েছে (উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ৩·৩৪ গুণ)। এর ফলে সারা দুনিয়ায় শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির হিসাব ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশ।

সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজম গড়ে তোলার স্তরে প্রবেশ এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর কয়েকটি দেশের পুরোদস্তুর সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার স্তরে উত্তরণ।

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট "জনগণের পুঁজিবাদ", "কল্যাণ রাষ্ট্র" প্রভৃতি তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। বিশ্বের প্রায় সমস্ত মানুষ আজ বুঝতে পারছেন যে, পুঁজিবাদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। যখন পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকট গভীরতর হয়ে উঠছে তখন যে সব অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে সেগুলি তুলে ধরে অধ্যাপক কুজমিনোভ বলেছেন যে, এই সব ব্যাপার পুঁজিবাদের সর্ব-ব্যাপী সংকটের তৃতীয় স্তরের কাঠামোর মধ্যে ঘটতে পারে না, কাজেই **এ কথা মনে করার হেতু আছে যে, পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের একটা নতুন স্তর, চতুর্থ স্তর শুরু হয়েছে।**

পুঁজিবাদের সর্বব্যাপী সংকটের তৃতীয় স্তর কোন মহাযুদ্ধের সময় শুরু হয় নি,* চতুর্থ স্তর সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এর

* সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে (১৯৬১ সালে ২২তম কংগ্রেসে গৃহীত) বলা হয়েছে: "বিশ্ব পুঁজিবাদ এখন সেই সংকটের (সর্বব্যাপী সংকট যা প্রথম

সঙ্গে যোগ করার আছে এবং তা হল বর্তমান স্তর আত্মপ্রকাশ করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪-তম কংগ্রেসে গৃহীত শান্তির কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের পটভূমিতে, যখন আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে এবং জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করছে।

মহাযুদ্ধের সময় শুরু হয়—(সঃ.) এক নতুন তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে যার মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর বিকাশ কোন মহাযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত নয়।"

প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ

সুনীল মিত্র

নিজের সত্তার আবিষ্কারে যন্ত্রণাবিদ্ধ হ্যামলেট এই উক্তিটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন—

To be or not to be : that is the question :
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune
Or to take arms against a sea of troubles.
And by opposing end them ? To die : to sleep :

এ এমন একটা উপলব্ধি, যার সবটাই সামন্ত আর অভিজাতদের নৈতিক মান অনুযায়ী বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে যায়। যার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল 'what a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculties, in form and in moving'—সেই হ্যামলেটের জীবনে মৃত্যু-চিন্তা এক যন্ত্রণাময় আর্তি। এ যেন "রক্তের অক্ষরে জানিলাম আপনারে।' হ্যামলেটের কাছে সমস্যা ছিল অভিজাতদের নীতিবোধ নিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? সেখানে মানুষের মহত্ত্ব কোথায়? হ্যামলেট এক রূপান্তরকালীন যুগের অভিমন্যু—সপ্তরথী সমস্যা দিয়ে ঘেরা, শুধু উত্তরার প্রেমে যার তৃপ্তি নেই। 'to be or not to be : that is the question'

একান্ত ব্যক্তি-চেতনায় মানব-সত্তার আবিষ্কার কি যথার্থ? শেক্সপীয়র থেকে বুঝতে পারি ইউরোপের নবজাগৃতির দীপ্তি তখনও মিলিয়ে যায় নি। নবজাগৃতির ভাবধারা ইউরোপের মনোজগতে যে ঝড় তুলেছিল, শেক্সপীয়রের পাত্রপাত্রীরা তখনও তাতে আন্দোলিত হচ্ছেন। কিন্তু তখনও কোনো স্থিতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে নি। যুগটা সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে রূপান্তরের যুগ। এযুগে ব্যক্তি-মানুষরা তাদের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ভাবী সমাজ গড়ে তুলছে। একটা দ্বৈত চেতনা হ্যামলেটের মধ্যে কাজ করছে। একদিকে মানুষের অসীম সম্ভাবনা, অন্যদিকে তা রূপায়িত হবার পথে দুর্লংঘ্য প্রতিবন্ধক।

নবজাগৃতি বয়ে এনেছিল মানবিকতার মহৎ স্বপ্ন। যে মানুষ মধ্যযুগীয় শাস্ত্র বাক্যের শিকলে বাঁধা ছিল, নবজাগৃতি মানুষকে সেই সনাতনের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। মানুষের তখন কোনো সার্বভৌম জগৎ ছিল না—সে ছিল শয়তান বা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিবাসী। এসব থেকে মানুষকে মুক্ত করে মানুষকে দাঁড় করানো হলো মুক্তি ও মানবিকতার ধারণার উপর। ইতিহাসে এল বুর্জোয়া যুগ—নবজাগৃতি নিয়ে এল বুর্জোয়া মানবিকতা। নবজাগৃতি চিন্তার জগতে যখন মানুষকে পৌঁছে দিল অসীম সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে, ঠিক তখনই আবার সে বাঁধা পড়ল আর একটা শ্রেণীসমাজের জালে, বুর্জোয়া পণ্যোৎপাদন, মুনাফার নিগড়, নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামকে দমন করার প্রতিক্রিয়াশীল অভিযানের মধ্যে।

এইখানেই দেখা দিল বুর্জোয়া নবজাগ্রত মানবিকতার সংকট। এ যুগের প্রমত্ত ব্যক্তিত্ব তার স্বাধিকার ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাস্তব সামাজিক পরিমণ্ডলের সংগে যে-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল তাতে তার অনিবার্য পরিণতি হয় হ্যামলেট বা কিং লিয়রের মতো। মহাদেশের বিশাল সামাজিক প্রান্তরে মানবিকতার হাহাকার শুনতে পাওয়া যায়। মানুষের সার্থকতা কোথায়? জীবনের তাৎপর্য কী? নবজাগৃতি এর যা উত্তর দিয়েছিল তার মধ্যে অবিরোধ দেখা দিল। এই বিরোধের রূপ আমরা শেক্সপীয়রে পাই। যে-বুর্জোয়া যুগে অতলান্তিক সমুদ্র অতিক্রম করে আমেরিকা আবিষ্কার সম্ভব হয় এবং আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে মানুষের সামনে এক বিশাল পৃথিবীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে ওঠে—ঠিক তখনই বুর্জোয়াশ্রেণীর নগ্ন শোষণ ও লালসার অত্যাচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে যন্ত্রণাদায়ক, সামাজিক পরিবেশ হয়ে ওঠে বসবাসের অযোগ্য।

তাই বুর্জোয়া বিপ্লবের স্বর্ণযুগেই বুর্জোয়া মানবিকতার মৌল বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। এটা আমরা কখনও ভুলতে পারি না।

এই সময়ের ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখব মানুষের মুক্তিকে শৃংখলিত করার একটা প্রতিক্রিয়াশীল ধারা সেখানে ঘটে চলেছে।

১৫৩৫ সালের জার্মানীতে আনাব্যাপটিস্টদের (রিফর্মেশনের সবচাইতে বিপ্লবী সম্প্রদায়) দমন করা হয়েছে। অবশ্য রিফর্মেশনের নায়ক মার্টিন লুথার ইতিপূর্বেই রাজন্যদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। এর মধ্যে দিয়েই ঘটে

গেছে কৃষক বিদ্রোহের আতংকে ভীত অভিজাত ও বুর্জোয়াদের ঐক্য। ফ্রান্সেও ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে সহনশীলতা শেষ হয়ে যায়। প্রটেস্টাণ্ট ও স্বাধীন চিন্তানায়কদের বিরুদ্ধে শাস্তিবিধান সুরু হয়। ইতালীতেও তিরিশের দশকে দক্ষিণপন্থী পরিবর্তন আসে। উত্তর ইতালীর বণিক প্রজাতন্ত্রগুলো অপসারিত হয় এবং নতুন সামন্তবাদী অভিজাতদের উৎপত্তি হতে থাকে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের বিশাল অংশ জুড়ে প্রতিক্রিয়ার অভিযান চলে। ক্যাথলিক গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার প্রতিভূ হিসাবে পোপ নাগরিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকেন। কিছুটা পরে হলেও ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে নানারকম প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনা ঘটে।

এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছিল, বুর্জোয়াশ্রেণী নবজাগৃতির উদার মানবিকতার পতাকা আর বইতে রাজী নয়। এর পরবর্তীকালে আদিম পুঁজি সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী যে বীভৎস নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে মানবিকতার শেষ স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

নবজাগৃতির মানবতাবাদে একটা গুরুতর অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা ছিল। মানুষের সামগ্রিক সত্তাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। মানুষের সত্তার অনুসন্ধানের জন্যে তার সামাজিক সত্তার গভীরে যে-খনকার্য চালানো দরকার ছিল উদ্দীপন পর্বের মনীষিরা তা করেন নি। ব্যক্তি মানুষের পুরুষকারের দিকটা সেখানে এত প্রাধান্য পায়, যার ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যা চাপা পড়ে যায়। সে যুগের কালজয়ী শিল্প-সাহিত্যের মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটে। যেমন দা ভিঞ্চি তার মোনালিসায় যে অপূর্ব মুখশ্রী ফুটিয়ে তুললেন এবং সৃষ্টি হলো মার্লোর অতুলনীয় পংক্তি—'was this the face that launched a thousand ships ?'—সেটাও নারী-মানবিকতার একটা রহস্যময় বহিরঙ্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মাত্র।

মানুষের স্বরূপলক্ষণের বিচার একটা নতুন পরিণতি পেল জার্মান দার্শনিক ফয়েরবাখের নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদে। তিনি মানুষের সামাজিক প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দিলেন কিন্তু মানুষের সামাজিক ঐক্যের দিক তাঁর কাছে ধরা পড়ল না। অর্থাৎ বস্তুবাদী ফয়েরবাখ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দ্বারপ্রান্তে এসে থমকে গেলেন। তিনি মানুষের ঐক্য দেখলেন তার প্রজাতিগত সত্তার মধ্যে, আসঙ্গলিপ্সার মধ্যে, নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে, পিতামাতা ও সন্তানসন্ততির

সম্পর্কের মধ্যে। ক্রমেরবাদের মধ্যে আমরা পর পর সেই ডারউইনকে দেখি যিনি বিবর্তনের রূপপরম্পরার মধ্যে প্রজাতির জন্ম ও তার বিবর্তনের বৈচিত্র্য উন্মোচিত করেছেন।

সুতরাং মানুষ কী? কী তার পরিচয়? শুধু প্রকৃতি ও মানুষের জীব-বৈজ্ঞানিক বিবর্তনের মধ্যে এর উত্তর নেই।

প্লেটো বলেছিলেন, মানুষ পালকহীন দ্বিপদ প্রাণী। আবার প্লেটোর দু'হাজার বছর পরে পাস্কাল বললেন, পা না থাকলেও মানুষ মানুষই; কিন্তু পাখীর পালক চলে গেলে সে আর পাখী থাকে না।

মানুষ প্রকৃতিরই অঙ্গ। কিন্তু সে প্রকৃতি থেকে পৃথক এক ভুবনের স্রষ্টা। এই ভুবন হলো মানুষের সমাজ। মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বাস করে না, তার নিজের রাজ্যে বাস করে। এই রাজ্য তার কর্মের সৃষ্টি, তার চেতনায় চুনি-পান্নায় সুন্দর করে গড়া। প্রকৃতির সৃষ্টির পেছনে একটা অন্ধ তাড়না আছে। মানুষ, সমগ্র প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ জগৎ তার ফল। প্রকৃতি তাই চিরপ্রসূতি। মানুষ প্রকৃতি থেকে এক স্বতন্ত্র বিবর্তন ধারার স্রষ্টা—তা হল সামাজিক বিবর্তনের ধারা।

মার্কসের চিন্তায় মানুষের এক সম্পূর্ণ নতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলো। প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ তাদের স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের ধারায় হাত ধরাধরি করে এসে দাঁড়াল। বিমূর্ত মানুষের বদলে সামাজিক মানুষের বাস্তবতা প্রকটিত হলো।

মানবিক সত্তার এই নতুন পরিচয় ঘোষিত হলো মার্কসের ১৮৪৪ সালের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি গ্রন্থে, "প্রকৃতির মানবিক নির্যাসের প্রাথমিক অস্তিত্ব রয়েছে সামাজিক মানুষের মধ্যে। অপরের জন্যে তার অস্তিত্ব এবং তার জন্যে অপরের অস্তিত্ব হিসেবে, মানবিক জগতের জৈব উপাদান হিসেবে একমাত্র এখানেই প্রকৃতি তার সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্রে বাঁধা। একমাত্র এখানেই মানুষ তার স্বকীয় মানবিক সত্তার ভিত্তি হিসেবে প্রকৃতিকে পায়।" (৯৭ পৃঃ) এরপর মার্কস দার্শনিক কবির মতন একটি অপূর্ব উক্তিতে বলেছেন এইভাবে "প্রকৃতির সত্যিকারের নবজন্ম হয়—মানুষের প্রকৃতিবাদ ও প্রকৃতির মানবতাবাদ পূর্ণতা লাভ করে।" (ঐ গ্রন্থ)

প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ—এ তিনটিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের থেকে আলাদা বলে মনে হয়। কিন্তু জগতের এই তিনটি বৃহত্তম শক্তিকে পরস্পরের

থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে কোনো বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হতে পারে না। পারস্পরিক যোগসূত্রের মধ্যে বিশ্বের ঐক্যকে দেখতে পাওয়াটাই বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক।

কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্কের মর্মকথা কী? মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ কিন্তু সে আবার প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী। এইখানেই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্ক। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামে মানুষ কোন বিচ্ছিন্ন শক্তি নয়। প্রকৃতিজাত মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে পালটিয়ে নেয়। সে নদী বাঁধে, প্রকৃতির উপাদানে ঘরবাড়ি তৈরী করে, মরু বিজয় করে ফসল ফলায়, মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জয় করে মহাকাশে পাঠায় তার বিজয় রথ। শুধু প্রকৃতির দেওয়া হাত-পায়ের জোরে এটা মানুষ করতে পারত না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিক থেকে দেখলে মানুষ খুবই দুর্বল প্রাণী। কিন্তু দুর্বল হয়েও সে যে প্রগতি রথের সারথী হল, তার কারণ মানুষের সামাজিক সত্তা। এইখানেই কর্মী মানুষ, সামাজিক মানুষের পরিচয়। এটা তার সামাজিক অর্থনীতির জগৎ। এইখানেই সে বিশিষ্ট।

মার্কস কোন্ বিশেষ দৃষ্টিতে মানুষকে দেখলেন? ফয়েরবাখ সংক্রান্ত সূত্রাবলীর একটিতে (৬ষ্ঠ সূত্র) তিনি লিখছেন, "ফয়েরবাখ ধর্মীয় সত্তাকে মানবিক সত্তায় রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু মানুষের সত্তা এমন কোনো বিমূর্ত বস্তু নয় যা একজন ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। আসলে এটা হলো সামাজিক সম্পর্কের যোগফল।" (৬০ পৃঃ) এইভাবে মার্কস ঐতিহাসিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করলেন, বিচার করলেন প্রকৃতি ও সমাজ-পরিবেশের সম্পর্কের মধ্যে এবং ঘোষণা করলেন এগুলোর পরিবর্তন করাই মানুষের লক্ষ্য। আদিম গুহাবাসী মানুষ থেকে বর্তমানের স্ট্রাটস্ক্যাপার অট্টালিকার অধিবাসী পর্যন্ত সকল মানুষের মধ্যেই এই লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুতরাং মানুষের সত্তার মৌল পরিচয় রয়েছে তার সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে, ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে নয় এবং এই সামাজিক সত্তা অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত কিছু নয়—ইতিহাসের ধারায় তা নিত্য পরিবর্তনশীল। এইখানে আমরা একটা বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হই। মানুষের মর্ম মানুষের জৈবিক সত্তার মধ্যে নেই—সেটা রয়েছে তার সামাজিক সত্তার মধ্যে। একটু বিস্ময়কর নয় কি!

বেনজামিন ফ্রাংকলিন বলেছিলেন মানুষ হাতিয়ার নির্মাণকারী প্রাণী। কথাটা খুব ঠিক। যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার নির্মাণের মধ্যেই তো মানুষের পরিচয়। বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত মরিস কনফোর্থ একটা চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন, "মানুষ এখন উড়তে পারে। তার কারণ এই নয় যে, তারা তাদের পাখা গজাতে পেরেছে, এর কারণ হলো তারা বিমান তৈরি করতে পেরেছে। তারা চমৎকার দৃষ্টিশক্তি অর্জন করেছে, এর কারণ এই নয় যে, তাদের চক্ষুর গঠনে কোনো আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে, এর কারণ হলো মানুষ অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করতে পেরেছে।" তাই মানবিক বিবর্তনের অর্থ হলো যন্ত্রপাতির বিবর্তন। আর এটা কখনও একক ব্যক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। এটা সম্পূর্ণ সামাজিক উৎপাদনের ফল।

এইবার আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ এক ঐক্যসূত্রে বিধৃত। প্রকৃতির কতকগুলো সাধারণ নিয়ম মানুষের মধ্যেও বর্তমান। সেদিক থেকে মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে তার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তার চৈতন্য, উদ্দেশ্যমুখীন চালচলন ও স্বাধীন ক্রিয়াকলাপকে শুধু তার প্রাকৃতিক সত্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই জন্যেই মার্কস ফয়েরবখের নৃতাত্ত্বিক বস্তুবাদকে গ্রহণ করেন নি।

মানুষের চৈতন্য কি মনুষ্য-বহির্ভূত কোন শক্তি? যেমন অধ্যাত্মবাদীরা মনে করে থাকেন? তাঁরা বলেন ব্রহ্মাণ্ডের চিৎসত্তার প্রকাশ ঘটেছে মানুষের মধ্যে। অর্থাৎ এই চিৎ মনুষ্য বহির্ভূত কোন শক্তি। অধ্যাত্মবাদের এই একটা ব্যাধি যে তা কোনো প্রয়োগের মধ্যে প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে ছাড়া এই চৈতন্য নেই এবং চৈতন্যের প্রকাশ মানুষের সমাজে ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ চৈতন্যের পরিচয় মানুষের অহাস্বিত ধ্যানের মধ্যে ততটা নয়, যতটা বাস্তব পৃথিবীর কাজকর্মের মধ্যে। মানুষের চৈতন্যের প্রকাশ তার শ্রমে, সৃষ্টিতে, সামাজিক রূপান্তরের মধ্যে।

ভারতের একজন আধুনিক দার্শনিক, শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্ম থেকে মানুষের স্বরূপ-সন্ধান করেছেন। তাঁর মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই জগৎ ও জীবের স্বরূপ। জগৎ ও জীবের মধ্যে তিনি একটা ফাটল আবিষ্কার করেছেন। ব্রহ্মের একটা অন্তর্নিহিত সন্ধানী শক্তির সংযোগে তিনি জগৎ ও জীবকে জুড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এর কোনোটাই প্রয়োগে পরীক্ষা করার উপায় নেই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রমাণ করে জগৎ ও জীবের মধ্যে ঐরকম কোনো ফাটল নেই—সব একটা

বস্তুসত্তার ঐক্যসূত্রে বাঁধা। প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই মানুষের উদ্ভব হয়েছে—চেতনাও এই বিবর্তনের ফল। মস্তিষ্ক তার আধার। ব্রহ্মের মধ্যে যেমন মানুষের স্বরূপ অনুসন্ধান বৃথা, তেমনি ব্যক্তি-মানুষের মধ্যেও মানুষের স্বরূপ নেই। ব্যক্তি-চেতনা একান্ত অর্থেই সমাজ-চেতনা। শ্রীঅরবিন্দও এই সমাজ-চেতনার অধীন। তাই তাকে একই সঙ্গে ভাববাদী দার্শনিক হতে হয় ও পুঁজিবাদী সমাজের সমর্থক হয়ে উঠতে হয়। কারণ দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেহেতু তিনি অন্তিম পুঁজিবাদী সমাজের দার্শনিক তাই তাঁকে সমাজতন্ত্রবিরোধীও হতে হয়। এইখানেই সামাজিক চেতনার শক্তি। পণ্ডিচেরীর 'দুর্লোক', দর্শনের দুর্গম রাজ্য এই পুঁজিবাদী সামাজিক চেতনার হাত থেকে তাকে অব্যাহতি দেয় নি।

সুতরাং যদি বলি, সমাজ মানুষকে নিছক ব্যক্তি হিসেবে থাকতে দেয় না, তাহলে কোন ব্যক্তিত্ববাদী যেন সমাজবিরোধী না হয়ে ওঠেন। সমাজের মধ্যেই মানুষের নির্যাস, সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলাই মানুষের পরমার্থ। মানুষের সামাজিক সত্তার পরিচয় তার সামাজিক চেতনায়। কিন্তু এ পরিচয়ও প্রাথমিক। মানুষের সামাজিক চেতনায় সমাজের সকল অন্তঃস্রোতের, সকল অন্তর্দ্বন্দ্বের, সকল জটিল সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ সামাজিক চেতনার একটা সামগ্রিকতা আছে। কিন্তু সমাজ যেখানে শ্রেণীসমাজ, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বে বিভক্ত সেখানে কোনো একক ও অবিভক্ত সামাজিক চেতনা থাকতে পারে না। তাই দেখা দেয় শ্রেণীগত মতাদর্শ। সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে মানুষের যে-অন্তর্লীন সত্তার পরিচয় পাই, মতাদর্শের বৌদ্ধিক জগতে সেই সত্তার প্রতিফলন ঘটে। তাই মানুষ শুধু শ্রমিক নয়। সে শিল্পী, কবি, চিন্তানায়ক ও বৈজ্ঞানিক।

আমাদের আলোচনার মধ্যে দেখলাম বুর্জোয়া চিন্তাবিদরা নবজাগৃতির যুগে যে-মানবিকতার সৃষ্টি করেছিলেন তার সংকট তৎকালীন পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। এর কারণ, প্রথমত বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজের অন্তর্লীন সম্পর্ককে উপলব্ধি করতে পারে নি, তাদের ঐক্য ও বিরোধের দ্বান্দ্বিকতাকে চিনতে পারে নি। দ্বিতীয়ত মানুষের অপার সম্ভাবনার যে স্বপ্ন উদ্দীপন পর্বের মনীষীরা দেখেছিলেন কোনো বুর্জোয়া সমাজে তা পূরণ হতে পারে না। তবে মানুষকে যাবতীয় মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে ছিন্ন করে তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে তাঁরা যে পথিকৃৎ ছিলেন

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকের বুর্জোয়া যুগের পতন যখন সমাসন্ন, তখন বুর্জোয়াশ্রেণীর চোখে মানবিকতার স্বপ্নের আভাসমাত্র নেই। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধে তারা অপরাধী। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সংস্কৃতির মধ্যে আজ শুধু মানুষ ও সমাজের অবক্ষয়ের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বুর্জোয়া শিল্পী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর চোখে আজ আর মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই, হতাশা, বিকৃতি ও বিভীষিকার তারা শিকার। 'ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে'—রবীন্দ্রনাথ।

যে মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস—শুধু স্বপ্ন নয়, তার স্বরূপও আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন তাঁরা ; আর আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ লেনিন যে-মানুষ সৃষ্টির উপযোগী সমাজ গড়ে তোলার জন্যে সর্বকালের একটা সামাজিক বিপ্লব সম্ভব করে গিয়েছেন—সেই মানুষ নতুন স্বপ্নে, নতুন বর্ণ-সুষমায় ফুটে উঠেছে সমাজতন্ত্রে

ভারতে অ-একচেটিয়া পুঁজির সাম্প্রতিক বিকাশের একটি চিত্র

চারুব্রত রায়

রিজার্ভ ব্যাংকের দুটি সমীক্ষার পর্যালোচনা

রিজার্ভ ব্যাংকের মাসিক মুখপত্রের জানুয়ারী '৭৫ ও ফেব্রুয়ারী '৭৫ সংখ্যা-দুটিতে দুটি পৃথক সমীক্ষা বেরিয়েছিল।* এই সমীক্ষা দুটিতে কোনো সরকারী অনুমোদক আর্থ সংস্থাকে (যেমন বীমা সংস্থা) অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। প্রথমটি ১১২৫টি ছোট সংস্থার ১৯৭০-৭১ ও ১৯৭১-৭২ সালের আর্থগত চিত্র—এদের প্রদত্ত পুঁজি (বা শেয়ার পুঁজি) ১ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে। দ্বিতীয়টি, ১৩০১টি মাঝারি ও বড় সংস্থার ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ এর আর্থগত চিত্র এবং এদের প্রদত্ত পুঁজি ৫ লক্ষ টাকার বেশী। অবশ্য দ্বিতীয় সমীক্ষাটিতে অল্প কিছু সংস্থাকে বাদ দিয়ে সমসংখ্যক প্রায়ই একই ধরনের সংস্থাকে ১৯৭২-৭৩এ অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছিল। কারণ ১৯৭১-৭২ সালে গৃহীত ঐ সংস্থাগুলির ১৯৭২-৭৩এর বার্ষিক হিসাবপত্র পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও তুলনীয়তা এর জন্য ব্যাহত হবে না। এই সমীক্ষা দুটি কেবলমাত্র বেসরকারী ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ।

এই সমীক্ষা দুটির গুরুত্ব অপরিসীম। তার প্রধান কারণ ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে অ-একচেটিয়া পুঁজি সম্পর্কে যে বিতর্ক দেখা দিয়েছে মার্কসবাদী মহলে, এই সমীক্ষা অংশত সে সম্পর্কে কিছু বাস্তব ও তীক্ষ্ণ তথ্য উপস্থাপিত করেছে। দ্বিতীয়ত, যে সময় বেছে নেওয়া হয়েছে (১৯৭০-৭৩), সেটা ভারতের রাজনৈতিক গতিপথের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক। সেই সময় শাসক দলের দ্বিধাবিভক্তি দেশের অর্থনৈতিক জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন এনেছিল, এটা বিচার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, বিশেষত, যখন দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিতান্ত্রিক পথের চৌহদ্দির মধ্যেই ঐ বিভাজন ঘটেছে। এই দুটি সমীক্ষা সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। অন্যভাবে বলতে গেলে, কংগ্রেস বিভক্তির আগে ও পরে পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর বিকাশের কিছু কিছু দিকনির্দেশক ইঙ্গিত এই ধরনের সমীক্ষায় পাওয়া যেতে পারে।

---

* Reserve Bank of India Bulletin Jan '75 pp 17-24
Reserve Bank of India Bulletin Feb '75 pp 54-128

ছোট সংস্থাগুলির সমীক্ষা ফলাফল

দেখা গেছে যে, এই সংস্থাগুলির লাভ-ক্ষমতা ১৯৭১-৭২এ ১৯৭০-৭১ থেকে কমে গেছে। মোট লাভের হার বেড়েছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। অংশীদারদের ইকুয়িটির আনুপাতিক লাভ ৫·২ শতাংশ থেকে কমে ১·১ শতাংশে নেমে গেছে। করপ্রদানের পূর্বের মুনাফা ১৮·৩ শতাংশ কমেছে। সমগ্র পুঁজির বিনিময়ে আয় ৭·৬ শতাংশ থেকে ৬·১ শতাংশে নেমে এসেছে।

সংখ্যাভারাক্রান্ত উপরের অনুচ্ছেদ থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট যে, ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭১-৭২ সালের কালপর্যায়ে ছোট ছোট সংস্থাগুলির পক্ষে মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। বরং লগ্নী-পরিস্থিতি তাদের প্রতি ক্রমেই প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দিক (প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, শিল্পোৎপাদন, দেশী পুঁজিপতিদের আর্থ-শক্তি প্রভৃতি) বিবেচনা করলে তৃতীয় দুনিয়ায় ভারতের মতো উন্নত রাষ্ট্র নেই। সেখানে ছোট পুঁজিপতিদের উৎখাত করার প্রেক্ষাপট রচনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মনে রাখতে হবে যে, বুর্জোয়াদের মধ্যে দেশপ্রেমিক অংশের প্রতিনিধি প্রধানত এদের থেকেই আসে। কারণ এদের লড়াই করতে হয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। কাজেই এদের আর্থগত অবরোহন প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অশুভ সংকেত।

আবার এটাও ঠিক যে, এটাই স্বাভাবিক। পুঁজিতান্ত্রিক পথের বিকাশের সাথে সাথে ছোট পুঁজিপতিদের বিনাশের অনিবার্যতা পুঁজিতন্ত্রের নিয়মের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের এটাই প্রাথমিক শর্ত।

১৯৭০-৭১ সাল থেকে ১৯৭১-৭২ হল "গরীবী হঠাও" প্রতিশ্রুতি পালনের প্রথম বছর। গরীবী যে সে সময় বেড়েছে, তা আবিষ্কারের জন্য বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। সরকারী রিপোর্টে অসংখ্য বার একথা ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ছোট ছোট পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত উন্নত লগ্নী-পরিবেশ ছিল না। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফার মর্জিতে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ও হচ্ছে।

অথচ এরা ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭১-৭২এ তুলনামূলকভাবে বেশী পরিমাণ ঋণ পেয়েছিল। ১৯৭০-৭১এ ঋণ পেয়েছিল ৬২·০৫ কোটি টাকা। ১৯৭১-৭২এ পেয়েছিল ৭১·০৩ কোটি টাকা। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এ ঋণের পরিমাণ অপ্রতুল। ব্যবসায়িক ধারদেনা ও চলতি দেনা এই সময়ে ৫১·৪২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৫৭·৫৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ফলে মোট লগ্নী

পুঁজির শতাংশ হিসেবে প্রাপ্ত ঋণ ৪১·১ থেকে ৪২·৪এ বাড়লেও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনরকম উত্তরণ লাভ করে নি ১১২৫টি ছোট সংস্থা। চলতি সম্পদ ও চলতি দেনার অনুপাত এক-এর নীচেই ধ্রুবক (০·৯৬) রয়ে গেছে। তার সবচেয়ে বিস্তৃত প্রতিফলন পড়েছে লাভজনক সংস্থার সংখ্যা হ্রাসে (৭২৯ থেকে ৭০৮) এবং নীট বিক্রয়ের নামমাত্র বৃদ্ধিতে (২১৬·৫ কোটি টাকা থেকে ২২৮·৯ কোটি টাকায়)। লাভের কথা বাদই দিলাম—এদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ১১·২ শতাংশ বাড়লেও নীট লাভের সৌভাগ্য এদের হয় নি।

সুতরাং ছোট ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭১-৭২ কালপর্যায়ে সাধারণভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিই ছিল। নব পর্যায়ের কংগ্রেস যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে বিপুল বিজয়লাভ করেছিল, এই কালপর্যায় ছিল সেই প্রতিশ্রুতি পালনের প্রথম বছর। বলাবাহুল্য, একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রভাব খর্ব করা ও ছোট ছোট পুঁজিপতিদের সামনে বিকাশের সুযোগ খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও তাতে ছিল। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুতি যারা দিয়েছিল, তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের সদিচ্ছা সম্পর্কে সংশয় জাগে। বরং সরকারী নথিপত্রে—বিবৃতিতে দেখা যায় যে, একচেটিয়া ও বৃহৎ পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থ-ক্ষেত্র থেকে বেশী পরিমাণে ঋণ যথারীতি পেয়েই চলেছে। ছোট ছোট শিল্পপতিরা যে সুযোগ-সুবিধা পায় নি রাষ্ট্রীয় আর্থ সংস্থাগুলি থেকে, তার প্রতিফলন পড়েছে ঋণ-ইকুয়িটি অনুপাতের এই সময়ে ১৭·৬ থেকে ১৮·৫এ বেড়ে যাওয়ায়। তার অর্থ এরা ইকুয়িটি লেয়ারের পরিমাণ যতটা বাড়িয়েছে, ঋণের পরিমাণ তদনুপাতে কমেছে। কাজেই এটা দেখাই যাচ্ছে যে, ছোট ছোট পুঁজিপতিদের কণ্ঠরোধ করার নিরবচ্ছিন্নতায় কংগ্রেস বিভক্তি বা কংগ্রেসের বিপুল নির্বাচনী জয় কোনরকম প্রভাব ফেলে নি। বরং সেই কণ্ঠরোধ করার নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

এদের মুনাফাবৃদ্ধির চিত্র লক্ষ্য করার মতো। ১৯৭০-৭১,১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩এ এদের মোট লাভ ছিল যথাক্রমে ৮৭·৮৭ কোটি টাকা, ১০২·৩৮ কোটি টাকা ও ১১১·২১ কোটি টাকা; ঐ সময়ে কর প্রদানোত্তর মুনাফা ও গচ্ছিত মুনাফা (কোটি টাকায়) যথাক্রমে ২০·৭০ ও ৯·৫১, ২২·০৮ ও ১১·৮৩ এবং ২৬·৩৭ ও ১৪·৭২। ১৯৭১-৭২এ ৬১৮টি সংস্থা লাভ করেছিল।

১৯৭২-৭৩এ লাভ করেছে ৭০৭টি সংস্থা। প্রদত্ত পুঁজির অনুপাতে মুনাফা বিশ্লেষণ করলে চিত্রটি আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমরা এখানে গচ্ছিত মুনাফা ও করপ্রদানোত্তর মুনাফার শতাংশ অনুপাতকেই বিচার্য মনে করছি। ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজি লগ্নীর ৩৫৫টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৪৩·৭ থেকে ৫২·৩এ বেড়ে গেছে। ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজিলগ্নীর ২৭৫টি সংস্থার এই ৫৪·১ থেকে ৪৯·০এ কমেছে। ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজিলগ্নীর ২০০টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ২৮.৬ থেকে ৬৪·১ শতাংশে বেড়েছে। ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজিলগ্নীর ১১৪টি সংস্থার এই শতাংশ ৬৬·১ থেকে ৬৭·১এ বেড়েছে। ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা প্রদত্ত পুঁজিলগ্নীর ৩৭টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৭২·৬ থেকে ৬৬·২এ কমে গেছে। ১ কোটি টাকার বেশী প্রদত্ত পুঁজিলগ্নীর সংস্থার এই শতাংশ ৩৭·৯ থেকে ৪০·৪এ বেড়েছে। আর যদি কেবলমাত্র লাভজনক সংস্থা (করপ্রদানের পূর্বে) ধরা যায় তাহলে দেখা গেছে যে, গচ্ছিত মুনাফা ও করপ্রদানোত্তর মুনাফার এই অনুপাত বেড়েছে যাদের প্রদত্ত পুঁজি ১৫ লক্ষ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, এবং এক কোটি টাকার উর্ধে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই এই অনুপাত বেশী কমে যায় নি। এই অনুপাত থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বড় ও মাঝারি পুঁজিপতি সংস্থাগুলি মাত্রেই উৎকর্ষ লাভ করে নি। যেমন যাদের শেয়ার পুঁজি ১৫ লক্ষ টাকার নীচে তাদের মুনাফা অত্যন্ত আকারের হলেও ব্যবসায়ে তুলনামূলকভাবে অগ্রগতি হয় নি। আবার যাদের শেয়ার পুঁজি ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকার মধ্যে তাদেরও এটা ঘটেছে। এটা পুঁজিবাদের অসম বিকাশেরই পরিচায়ক।

মাঝারি ও বড় সংস্থাগুলির সমীক্ষার ফলাফল

মাঝারি ও বড় বড় পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন সংস্থাগুলির আর্থগত অগ্রগতির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণী নতুন ঝাঁক নিতে চেষ্টা করছে এবং ভারতের পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোয় একটা গুণগত পরিবর্তন আনতে চাইছে। একথা মনে রাখতে হবে যে, অ-একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নিয়ে মার্কসবাদী মহলে যে বিতর্ক উঠেছে, এরাই তার কেন্দ্রগত মধ্যমণি। কাজেই এদের গতিপ্রকৃতি, ব্যবসায়িক প্রগতি প্রভৃতি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করার উপযোগিতা তর্কাতীত।

সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৩এর কালপর্যায় এদের অনুকূলেই ছিল। সমীক্ষাভুক্ত ১০০১টি সংস্থার মধ্যে ৬২৯টির প্রদত্ত পুঁজি ৫ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা এবং ৩৭২টির প্রদত্ত পুঁজি ১৫ লক্ষ টাকার বেশী। মোট লাভ ও মোট বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত (যাকে বলা যেতে পারে পুঁজি বিনিয়োগের লাভজনক কার্যকরিতা) ১৯৭০ ৭১,১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩এ ছিল ৯·৪%, ১০·০% ও ১০·১%। সুতরাং ছোট ছোট সংস্থার চেয়ে যে এদের পুঁজি বিনিয়োগের পরিস্থিতি যে অনেক বেশী অনুকূল ছিল, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

এদের চরিত্রে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফাগত লক্ষণ যে পরিস্ফুট হচ্ছে, তার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। যেমন উৎপাদিত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হার ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৩এ ৯·০% থেকে ৭·০%এ কমে গেছে। মোট মুনাফাবৃদ্ধি হার ১৬·৫% থেকে ৮·৬%এ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু মোট বিক্রয়ের শতাংশ হিসেবে মোট লাভ ৬·৬এ দাঁড়িয়ে আছে। করপ্রদানের পূর্বের মুনাফার শতাংশ হিসেবে গচ্ছিত মুনাফা ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩এ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে যথাক্রমে ১৭·০,১৮·৮ ও ২১·৩এ। অথচ মোট উৎপাদিত পণ্যের মূল্য ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ সালে যথাক্রমে ১৯৩১·২১ কোটি টাকা, ১৫৩০·৩৬ কোটি টাকা ও ১৬৭১·০৮ কোটি টাকা ছিল—এর মানে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য-বৃদ্ধিহার ১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৭১-৭২এ ও ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৩এ যথাক্রমে ৯ শতাংশ ও ৭ শতাংশ ছিল। তাও এটা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হিসেব। কেবল পরিমাণগত উৎপাদন ধরলে দেখা যাবে যে, ১৯৭০-৭১—১৯৭১-৭২ কালক্রম থেকে ১৯৭১-৭২—১৯৭২-৭৩ কালক্রমে উৎপাদনহার অনেক হ্রাস পেয়েছিল। কারণ এরা উৎপাদনব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির (cost-push inflation) দোহাই দিয়ে এরা পণ্যের দাম বাড়িয়েই চলেছে। কিন্তু এদের মুনাফার চিত্র লক্ষণীয়। ১৯৭০-৭১, ১৯৭১-৭২ ও ১৯৭২-৭৩ এদের মোট লাভ ছিল যথাক্রমে ৮৭·৮৭ কোটি টাকা, ১০২·৩৮ কোটি টাকা ও ১১১·২১ কোটি টাকা। ঐ সময়ে করপ্রদানোত্তর মুনাফা ও গচ্ছিত মুনাফা (কোটি টাকায়) যথাক্রমে ২০·৭০ ও ৯·৫২, ২২·০৮ ও ১১·৮৩ এবং ২৬·৩৭ ও ১৪·৭২। এ থেকে যা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ঠিক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মতোই এরা উৎপাদন কমিয়ে উৎপাদন সংকটের সুযোগ নিয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়াবার পথ নিচ্ছে।

ছোট ছোট সংস্থার ক্ষেত্রে যেমন লাভজনক সংস্থার সংখ্যা কমেছে, বড় ও

মাঝারি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে তেমন এ সংখ্যা ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৩এ ৬৯৮ থেকে ৭০৭এ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রদত্ত পুঁজির অনুপাতে মুনাফার গতি নিরীক্ষণ করলে এই চিত্র আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ধরা যাক, গচ্ছিত মুনাফা ও কর প্রদানোত্তর মুনাফার অনুপাত—যা সংস্থাগুলির বিনিয়োগ ক্ষমতার আংশিক পরিচায়ক।

৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজিসম্পন্ন ৩৫৪টি ক্ষেত্রে এই অনুপাত শতাংশে ৪০'৭ থেকে ৫২'৩এ বেড়ে গেছে। ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজি সম্পন্ন ২৭৫টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৫৪'১ থেকে ৪৯'০তে কমে গেছে। ১৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজিসম্পন্ন ২০০টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ২৮'৬ থেকে ৬৫'১এ বেড়েছে। ২৫ লক্ষ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজিসম্পন্ন ১১৪টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৬৬'১ থেকে ৬৭'১এ বেড়েছে। ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা প্রদত্ত পুঁজিসম্পন্ন ৩৭টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৭২'৬ থেকে ৬৬'২এ কমে গেছে। ১ কোটি টাকার বেশী প্রদত্ত পুঁজিসম্পন্ন ২১টি সংস্থার ক্ষেত্রে এই শতাংশ ৩৭.৯ থেকে ৪০.৪ এ বেড়েছে।

এই হ্রাসবৃদ্ধি মূলত মুনাফার পুনর্বিনিয়োগ যোগ্যতার প্রতিফলন হলেও এতে মুনাফা অর্জনের গতিমুখ পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্রদত্ত পুঁজির উপরোক্ত শ্রেণী পরম্পরা হিসেবে যদি মোট মুনাফা ও মোট বিনিযুক্ত পুঁজির শতাংশ অনুপাত ধরা যায়, তাহলে ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৪এ এই অনুপাতগুলি যথাক্রমে ৭'১ ও ৮'৫, ৯'৪ ও ৯'০, ৭'২ ও ৮'১, ৯'৭ ও ৯'৬, ১৪'১ ও ১৩'৫ এবং ১৩'৪ ও ১২'৮।

আনুপাতিক মুনাফার চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন ক্ষেত্রেই মুনাফা অর্জনের হার উল্লেখযোগ্য রূপে হ্রাস পায়নি এবং যাদের প্রদত্ত পুঁজি ৫০ লক্ষ টাকার উপর তাদের ক্ষেত্রে এই হার অপেক্ষাকৃত কম প্রদত্ত পুঁজিসম্পন্ন সংস্থাগুলির চেয়ে অনেক বেশী। রাঘববোয়ালদের অবস্থা যে বর্তমান ব্যবস্থার ক্রম উন্নতিশীল, একথা এর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণরূপে উপস্থাপিত।

বাইরে থেকে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় আর্থক্ষেত্র থেকে, ঋণসংস্থানের ব্যাপারেও এরা আশানুরূপভাবে সফল—ছোট ছোট শিল্পসংস্থাগুলির তুলনায় তো বটেই। একদিকে অনুকূল বিনিয়োগগত পরিস্থিতি, অন্যদিকে ঋণসংস্থান এই দুই মিলে এই সম্থানগুলির পুষ্টিবর্ধন করেছে। যাদের প্রদত্ত পুঁজি ৫ থেকে

১০ লক্ষ টাকা তারা প্রাপ্ত ঋণ ৫৮·০২ কোটি টাকা থেকে ৫৯·২৬ কোটি টাকা বাড়িয়ে নিয়েছে। আর তাদের ব্যবসায়িক ও চলতি দেনা ৫১·১৭ কোটি টাকা থেকে ৫৪·৮১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যাদের প্রদত্ত পুঁজি ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা তাদের প্রাপ্ত ঋণ ৭১·৯০ কোটি টাকা থেকে ৭৬·৬৬ কোটি টাকায় বেড়েছে। আর ব্যবসায়িক ও চলতি দেনা ৫৯·৬৬ কোটি টাকা থেকে ৬৬·৮৬ কোটি টাকায় বেড়েছে যাদের প্রদত্ত পুঁজি ১৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা তাদের প্রাপ্ত ঋণ ৮৯·৭১ কোটি টাকা থেকে ৯৪·০২ কোটি টাকায় বেড়েছে, যেখানে ব্যবসায়িক ও চলতি দেনা কমেছে ৬৪·১২ কোটি টাকা থেকে ৫৯·২৬ কোটি টাকা। যাদের প্রদত্ত পুঁজি ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা, তাদের প্রাপ্ত ঋণ ৭২·৮০ কোটি টাকা থেকে ৭৫·৩৫ কোটি টাকায় বেড়েছে, আর চলতি ও ব্যবসায়িক দেনা ৪৫·২৩ কোটি টাকা ৪৪·৩১ কোটি টাকায় কমে গেছে। যাদের প্রদত্ত পুঁজি ৫০ লক্ষ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা, তাঁদের প্রাপ্ত ঋণ ৫০·০৫ কোটি টাকা থেকে ৫৫·৬৯ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে, আর চলতি ও ব্যবসায়িক দেনা ২৩.৮৭ কোটি টাকা থেকে ২৬·৮৬ কোটি টাকা বেড়েছে। যাদের প্রদত্ত পুঁজি ১ কোটি টাকার বেশী তাদের প্রাপ্ত ঋণ ৫৩·০২ কোটি টাকা থেকে ৫২·৬৮ কোটি টাকায় কমে গেছে, কিন্তু চলতি ও ব্যবসায়িক দেনা ৩৩·৯১ কোটি টাকা থেকে ৪০·৯৬ কোটি টাকায় বেড়ে গেছে। সব মিলে ১১০১টি সংস্থার প্রাপ্ত ঋণ ৩৯৫·৫২ কোটি টাকা থেকে ৪১৩·৬৫ কোটি টাকায় বেড়েছে এবং চলতি ও ব্যবসায়িক দেনা বেড়েছে ২৭৭·৪১ কোটি টাকা থেকে ৩০৩·১৫ কোটি টাকায়। চলতি ও ব্যবসায়িক দেনার অনুপাতে দেখা যাচ্ছে প্রাপ্ত ঋণ শুধুমাত্র পর্যাপ্ত নয়, সঙ্গতিপূর্ণও বটে। ১ কোটি টাকার নীচে যাদের প্রদত্ত পুঁজি, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যত বেশী প্রদত্ত পুঁজি, তত ঋণ সংস্থান হয়েছে। এটা আরো বেশী বোঝা যায়, যখন দেখা যায় যে, যত প্রদত্ত পুঁজি বাড়ছে, তত সংস্থা সংখ্যা কমছে। যেমন ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজি রয়েছে ৩৫৪টি সংস্থার, ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজি ২৭৫টি সংস্থার, ১৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজি ২০০টি সংস্থার, ২৫ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদত্ত পুঁজি ১১৪টি সংস্থার, ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা প্রদত্ত পুঁজি ৩৭টি সংস্থার এবং ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রদত্ত পুঁজি ২১টি সংস্থার। এ থেকে মাঝারি ও বড় পুঁজিপতি-দের মিলনপ্রয়াসের আর একটি অনুকূল ইঙ্গিত মেলে। পুঁজিবাদের নিয়ম অনুযায়ী একদিকে ক্রমশ কম লোকের হাতে বেশী সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে

অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তি যে ছোট পুঁজিপতিদের তুলনায় মাঝারি ও বড় পুঁজিপতিদের পোষণ করে তার নিদর্শন মেলে। তার কারণ রাষ্ট্রশক্তি পুঁজিবাদী পথের প্রবক্তা এবং পুঁজিবাদের প্রত্যেকটি সূত্র তাকে মানতেই হবে শ্রেণীগত শোষণের স্বার্থে।

মাঝারি ও বড় সংস্থাগুলি ছোট ছোট সংস্থাগুলির চেয়ে বেশী পুষ্ট হয়েছে তার আর এক প্রমাণ চলতি সম্পদ ও চলতি দেনাদায়ের অনুপাতে। ছোট ছোট সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে এই অনুপাত ০·৯৬ রয়ে গেছে অর্থাৎ এক-এর নীচেই। বড় বড় ও মাঝারি সংস্থাগুলি তিন বছর ধরে তাকে ১·১০তে বজায় রেখেছে। সম্পদ সৃষ্টির ক্রমবৃদ্ধি এর মধ্যে প্রতিচিত্রিত। এর জন্যে তারা বাইরের ঋণকে কাজে লাগিয়েছে। ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৭২-৭৩এ ঋণ ইকুয়িটি অনুপাত শতাংশ ১৯·৫ থেকে ১৮·৬তে নামিয়ে এনেছে, ১৯৭০-৭১এ ছিল ১৭·৬। ইকুয়িটি শেয়ারের ক্রমবৃদ্ধি বিনিয়োগযোগ্যতার পরিচায়ক।

উপসংহার

কাজেই নবপর্যায়ের কংগ্রেস শাসন যে ছোট ছোট সংস্থার পাশে প্রতিশ্রুতি-মতো দাঁড়ায় নি এবং মাঝারি ও বড় সংস্থাগুলির (যাদের বলা যেতে পারে অ-একচেটিয়া পুঁজির কেন্দ্রবিন্দু) পুষ্টিবর্ধনের দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করেছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে এই দুই সমীক্ষায়। কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনারও পূর্বে এঙ্গেলস তাঁর "রাষ্ট্রনৈতিক অর্থশাস্ত্রের রূপরেখায়" লিখেছিলেন, "প্রত্যেকটি পরম্পরা সংকট আরো ব্যাপক হতে বাধ্য এবং সেজন্যেই পূর্বের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়, ছোট ছোট পুঁজিপতিদের বেশী বেশী সংখ্যায় দুরবস্থার দিকে নিয়ে যায়।" (**F. Engels: Outlines of a Critique of Political Economy in K. Marx: Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, Progress Publishers Moscow, 1974, p. 168**). পুঁজিবাদের এ নিয়ম পুঁজিবাদী পথের মধ্যে থেকে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। বড় ও মাঝারি সংস্থাগুলির পক্ষেও একথা প্রযোজ্য। যাদের যত বেশী প্রদত্ত পুঁজি, তাদের পরিস্থিতি তত অনুকূল হয়েছে। তার মানে লগ্নীক্ষমতা যার বেশী, তার পক্ষেই ছিল অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। ৫০ লক্ষ টাকা ও তদূর্ধ্ব প্রদত্ত পুঁজির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাঘাত এসেছে। সেটার কারণ দুটি: এক, ঐ পরিমাণ প্রদত্ত পুঁজি যাদের, তারা প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছাকাছি, যেজন্যে

সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় (মনে রাখতে হবে যে, একচেটিয়া পুঁজিপতিরা শুধু উৎপাদনে নয়, পণ্য বণ্টনের বাজারের উপরেও একচেটিয়া দখল রাখে) ; দুই. পুঁজিবাদের অসম বিকাশ। বড় ও মাঝারি সংস্থাগুলির মুনাফা চিত্রের দিকে তাকালেই এটা বোঝা যাবে। কোথাও বৃদ্ধিহার বেড়েছে, কোথাও কমেছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এদের বিকাশের ক্ষেত্র প্রমাণিত হয়েছে, উদ্বৃত্ত মূল্য বেশী রকম আত্মসাত করেছে।

১৯৭০ সালে কংগ্রেস বিভক্তির পরে দারিদ্র্য যে বেড়েছে, একথা পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানো অপ্রয়োজনীয়। এ নিয়ে বহুবার সরকারী স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হয়েছে· অর্থনীতিবিদদের ধারণা, ভারতের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক গ্রাসাচ্ছাদনেও অপারগ। কিন্তু একচেটিয়া বড় ও মাঝারি সংস্থানগুলির শ্রীবৃদ্ধি অবাধ। এর কারণ জনগণের দুর্দশাবৃদ্ধি ও বড়, মাঝারি ও একচেটিয়া, পুঁজিবাদের প্রসার প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক কাঠামোর এই দুই গতি প্রায় গাণিতিক নিয়মে বাঁধা।

তুলনামূলকভাবে, দুটি সমীক্ষা অধ্যয়ন করে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭১ সালের পর থেকে অ-একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আর্থক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যত্রও এর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। যেমন ১৯৭১ সালের পর থেকে নতুন নতুন একচেটিয়াপতির উদ্ভব হয়েছে। এরা এসেছে অ-একচেটিয়া পুঁজিপতি শ্রেণী থেকেই। অ-একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পর্কে যাদের মোহ রয়েছে, তারা একথা সত্য হলেও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, শ্রেণীগতভাবে অ-একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী শোষকশ্রেণী। এদের দেশপ্রেমিক অংশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সত্ত্বেও গোটা শ্রেণীর ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখা ভুল। এদের শ্রেণীগতভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সীমিত আবার এদের সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তথা একচেটিয়া পুঁজিবাদের সঙ্গে আপসও রয়েছে। এজন্যেই তারা মূলত শোষকশ্রেণী। কখনো কখনো এদের এই ঐক্যের ক্ষেত্রটি বড় হয়, কখনো বিরোধের ক্ষেত্র। ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর ঐক্যের ক্ষেত্রটি আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। কমিউনিস্ট পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণীর পুনর্মিলন প্রয়াসের ইঙ্গিত বারে বারে দিয়েছে। কাজেই অ-একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র মোহাবিষ্ট হয়ে থাকা মানে বাস্তবের দিকে দৃষ্টিপাত না করা।

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন—পাটনা

নৃপেন ভট্টাচার্য

ঐতিহাসিক পাটনা শহরে গত ৪ঠা থেকে ৭ই ডিসেম্বর '৭৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আক্ষরিক অর্থেই এ সম্মেলন ছিল মহাসম্মেলন। বিশ্বশান্তি ও সংহতি সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পূর্বেকার যে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের চেয়ে এই সম্মেলন সব দিক থেকেই ছিল অনেক বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭৫ সালের শেষাশেষি ভারতবর্ষে, বিহার রাজ্যের পাটনা শহরে এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের আয়োজন ও স্থান নির্বাচনের পেছনে যে চিন্তাভাবনা কাজ করেছে এবং নিখিল বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করে নেওয়াটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৭৫ সালটি ছিল হিটলারী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের ৩০তম বার্ষিকী। তাই এ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শহরে শহরে, নগরে নগরে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এই বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। তিরিশ বছর আগে ১৯৪৫ সালে লাল ফৌজের অতুলনীয় শৌর্য ও বীরত্বের কাছে হিটলারী ফ্যাসিবাদের পরাজয় দিকে দিকে নিপীড়িত, শোষিত মানুষের মুক্তির যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে তা আজ ঐতিহাসিক বাস্তব হিসেবে দুনিয়ার সর্ববিধ ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিবাচক ফল হিসেবে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলিতে মুক্তিসংগ্রামের তীব্রতা এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় বহু স্বাধীন দেশ ও জাতির উদ্ভব, লাতিন আমেরিকার বহু দেশে মার্কিন তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দুর্বার অভিযান, জোটনিরপেক্ষ এক তৃতীয় দুনিয়ার আবির্ভাব, নিঃসন্দেহে শক্তিবিন্যাসের পুরোনো ভারসাম্য পালটে দিয়েছে। ইতিহাসের ভবিষ্যৎ গতি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূল এবং মুক্তিকামী মানুষের অনুকূল, তারই এক মিশ্র বর্ণালি রচিত হয়েছে বিগত তিরিশ বছরে বিশ্বপরিসরে বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। মধ্যপ্রাচ্যের

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি ও তৈল রাজনীতির আবির্ভাব, চিলির নির্বাচনে প্রতিক্রিয়ার শক্তির পরাজয়, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও তার সাফল্য, পর্তুগাল ও গ্রীসে ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদ, ফরাসী দেশ ও ইতালীতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি, গিনি-বিসাউ, মোজাম্বিক ও এঙ্গোলায় মুক্তি-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ও পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা লাভ, সর্বোপরি ভিয়েতনাম ভূখণ্ডে মার্কিন আগ্রাসক রাজনীতির সার্বিক পরাজয় ও ব্যর্থতা কাম্বোডিয়া ও লাওসে মুক্তি সংগ্রামের সাফল্য, সর্বশেষে হেলসিংকিতে শান্তির অনুকূলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সিদ্ধান্তগ্রহণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্য হয়ে তা মেনে নেওয়া আর অন্যদিকে ৭০-এর দশকে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথা সার্বিক সংকটের অভূতপূর্ব রূপ আর তারই ফলস্বরূপ দেশে দেশে সি. আই. এর চক্রান্তজাল বিস্তার এবং নির্বাচিত সরকারগুলি উচ্ছেদসাধনের "অস্থিতিকরণ" নীতির প্রচলন এবং আলেন্দে ও মুজিব-এর হত্যা ও তাদের নেতৃত্বাধীন সরকারের উচ্ছেদ, চীনের সাথে মার্কিন দোস্তি এবং চীনের তীব্র সোভিয়েত ও ভারতবিদ্বেষী নীতি ও প্রচারণা, পাকিস্তানকে নতুন করে মার্কিন অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন নৌঘাঁটি স্থাপন, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী ও নিকসনের পদত্যাগ এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিকসন কর্তৃক ফোর্ডের মনোনয়ন, কিসিংগার দৌত্যে মিশর-ইসরাঈলী চুক্তির মধ্য দিয়ে আরব দুনিয়ার ঐক্যে ফাটল ধরানোর প্রয়াস—এ সমস্ত ঘটনাই প্রকারান্তরে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির দেউলিয়াপনা, ক্ষমতাদম্ভ ও গণতন্ত্রের বহ্বারম্ভের অন্তঃসারশূন্যতারই পরিচয় দেয় আর তারই সাথে হৃৎসাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সাম্রাজ্যবাদের নয়া কৌশল, নয়া ঔপনিবেশিকতাবাদী ও নয়া ফ্যাসিবাদী অভিযানের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে, বহুজাতিক কর্পোরেশন, সি. আই এ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার সমবায়ে স্বাধীন অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে নয়া ফ্যাসিবাদের কৌশল। এশিয়া ভূখণ্ডে সবদিক দিয়ে যেহেতু ভারতের অবস্থান এমন যে বর্তমান পর্যায়ে ভারতবর্ষ শুধুমাত্র তৃতীয় দুনিয়াতেই নয় বিশ্বমঞ্চেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী, সেই হেতু ভারতবর্ষে এক অস্থির, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করাই সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য। এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করতে হবে এখানকার পাটনা সম্মেলনকে।

এই সময়কালে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারী-বৃদ্ধি—এক কথায় জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের গতিরোধ মুষ্টিমেয় একচেটিয়ার হাতে সম্পদের কেন্দ্রীভবন, শিক্ষাসংস্কৃতির অবক্ষয়, সমাজজীবনে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, গণবিক্ষোভ ও অসন্তোষ—তারই সূত্র ধরে দেশের অভ্যন্তরে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির জোটবন্ধন, ভারতের জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাথে সুসম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়াসে জনমনে আগাতার বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাদখলে ব্যর্থ হয়ে ছলেবলে কৌশলে ক্ষমতাদখলের প্রয়াসে এমনকি বলপূর্বক গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলি ভেঙে দেওয়া (গুজরাটে বিধানসভা ভাঙা ইত্যাদি), আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার রণধ্বনিগুলিকে একচেটিয়া সংবাদপত্র মারফত প্রচার করা, এমন কিছুই সঠিক রূপ পরিগ্রহ করে জে. পি-র বহু বিঘোষিত সর্বাত্মক-বিপ্লব রণধ্বনির মধ্যে। কুৎসাপ্রচার, সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক দেশবিরোধী অভিযান, চীনের প্রতি প্রেম, দাঙ্গাহাঙ্গামা, সন্ত্রাস ইত্যাদি ছিল এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য। সৈন্যবাহিনী ও পুলিসের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার আহ্বানে তার পরিণতি। তার মহড়া শুরু হয় ডঃ এল এন মিশ্রের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকিতে ও প্রধান বিচারপতির উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় ও তৎপরবর্তী ঘটনা এবং পরিণতিস্বরূপ ২৬শে জুনের জরুরী অবস্থা ঘোষণা—এসমস্ত অভ্যন্তরীণ ঘটনার পটভূমিতেই বিচার করতে হবে সম্মেলনের স্থান ও সময় নির্বাচনের বিষয়কে।

পাটনা শহরে গোলো গ্রাউণ্ডে ললিতনারায়ণ নগরে অনুষ্ঠিত হলো এই সম্মেলন। সম্মেলনস্থলের দুটি প্রধান তোরণের নাম ছিল আলেন্দে তোরণ ও ভগৎ সিং তোরণ। চারটি মূল মণ্ডপে সম্মেলনের অধিবেশনগুলি অনুষ্ঠিত হয়। মণ্ডপগুলি হচ্ছে মুজিব হল, সুমুদ্রা হল, মার্টিন লুথার হল এবং থলম্যান হল। বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর সুগভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সর্ববৃহৎ মণ্ডপটির নামকরণ করা হয় তাঁরই নামে এবং সেই মণ্ডপেই সমস্ত পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয় আর অন্যান্য মণ্ডপে বিভিন্ন কমিশনের বৈঠক হয়। এছাড়া ছিল একটি প্রদর্শনীমণ্ডপ, পিপলস পাবলিসিং হাউস ও মনীষার পুস্তকের স্টল সাময়িক ডাকঘর, প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সাময়িক অফিস ইত্যাদি। প্রায় ৫০০ তাঁবুতে প্রতিনিধিমণ্ডলীর

থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এক কথায় বলা চলে সম্মেলন স্থানের আয়োজন নিঁখুত এবং অপূর্ব। বৈদেশিক প্রতিনিধিরা অবশ্য স্থানীয় হোটেল ইত্যাদিতে ছিলেন।

এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন কারা? একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ বাদ দিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন এই সম্মেলনে। এসেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যবাহক ভিয়েতনামের প্রতিনিধি, এসেছিলেন আলেন্দে হত্যার সময়ে পিনোচেৎ-এর বর্বর নারকীয় কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী এবং চিলিবাসীদের একান্ত প্রাণের বন্ধু ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র চিলিতে প্রাক্তন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত, এসেছিলেন সংগ্রামী চিলির প্রতিনিধি, এসেছিলেন হিটলারী ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের রূপকার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা, তার মধ্যে ছিলেন পোল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, এসেছিলেন ইরাকের রাষ্ট্রমন্ত্রী, এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী মানুষের প্রতিনিধিরা—সাদা, কালো পীত জাতিবর্ণনির্বিশেষে নানা জাতের প্রতিনিধিবৃন্দ আর তারই সাথে যোগ দিয়েছিলেন ভারতের প্রতিটি প্রান্ত থেকে অসংখ্য প্রতিনিধি। সর্বমোট প্রায় ৬০টি দেশ থেকে সাড়ে ছ হাজারেরও বেশী প্রতিনিধি যোগ দেন এই সম্মেলনে। এর মধ্যে বিদেশী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ১১৪। পশ্চিম বাংলায় প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল ৫০০-র মত। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সাইপ্রাস রাষ্ট্রপ্রধান আর্চবিশপ ম্যাকারিওস এবং কিউবার রাষ্ট্রপতি ডর্টিকোস।

৪ঠা ডিসেম্বর পতাকা উত্তোলন এবং শহীদস্তম্ভে মাল্যদানের পরে মুজিব হলে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডি. কে. বড়ুয়া। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্রের স্বাগত ভাষণের পরে কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান কমঃ এস. এ. ডাঙ্গে কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীপূরবী মুখার্জী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী চন্দ্রজিৎ যাদব, মধ্য-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শি. সি. শেটি, (বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) এবং বিদেশাগত প্রতিনিধিবৃন্দ ভাষণ দেন। সমস্ত বক্তার ভাষণেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের মুখোস সুস্পষ্ট ভাবে খুলে দেওয়া হয় এবং সদ্যস্বাধীন, উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি বিশেষত ভারতবর্ষের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের কারণগুলি

তুলে ধরা হয় এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের ২৬শে জুনের সময়োচিত হস্তক্ষেপ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক ২০-দফা কর্মসূচী ঘোষণার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের দৃঢ়পণ সংগ্রামকে অভিনন্দন জানান হয় এবং এই সংগ্রামে ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিদান করেন বিদেশী প্রতিনিধিরা। এককথায় বলা চলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অঙ্গীকারাবদ্ধ ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিসমূহের এক মিলনস্থল হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদ, সি. আই এ. এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার ধিক্কার ধ্বনিতে বায়ুস্তর হয়ে ওঠে সম্মেলনমণ্ডপ এবং একথা বারবার বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে নয়া-ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করার একমাত্র গ্যারান্টি হচ্ছে ফ্যাসিবাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উৎস নির্মূল করা। দেশে দেশে তাই সামন্ততন্ত্রের অবশেষ, একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই, যে কোন রকমের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ধর্মান্ধতা ও জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে সার্থক লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠতে পারে আর তার জন্য প্রয়োজন সমাজপ্রগতির অনুকূল সর্ববিধ শক্তিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা, সর্বপ্রকার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া ও তৃতীয় দুনিয়ার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা।

৫ই ডিসেম্বর থেকে প্রতিনিধিরা চারটি কমিশনে বিভক্ত হয়ে চারটি বিষয়ে আলোচনা করেন। বিষয়গুলি হচ্ছে এই (১) সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ; (২) ফ্যাসিবাদী ও নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি; (৩) উন্নয়নশীল দেশসমূহে ফ্যাসিবাদী ও নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তিসমূহ; (৪) শান্তির শক্তিসমূহের ঐক্য—ফ্যাসিবাদের উপরে জয়-লাভের চাবিকাঠি। এই কমিশনগুলিতে পাঁচটি লিখিত পেপারের ভিত্তিতে আলোচনা হয়। পেপারগুলি এই: ডঃ বিদ্যাপ্রকাশ দত্ত এম-পি উপস্থাপিত—"তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব রণনীতি—এই অঞ্চলে ভারতবর্ষই বিশেষ লক্ষ্য"; আর. কে. মিশ্র এম পি র "কায়েমী স্বার্থ এবং ভারতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম"; গিরীশ মাথুরের—"ভারতে ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ"; এইচ. ডি. মালব্য, এম পি-র 'পশ্চিমী সাহায্য, বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং সি. আই.-এ' এবং বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের

"বহুজাতিক কর্পোরেশন ও সার্বভৌমত্ব।" এই সমস্ত পেপারের ভিত্তিতে কমিশনগুলিতে ফ্যাসিবাদ, নয়া ফ্যাসিবাদ, সি. আই. এ, বহুজাতিক কর্পোরেশন, বিশেষত ভারতে ফ্যাসিবাদী বিপদের সম্ভাবনা এবং ফ্যাসিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রায় ৩০০-র মত প্রতিনিধি বিভিন্ন কমিশনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ভারতের বক্তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়, অর্থমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, কংগ্রেস সম্পাদক পূরবী মুখার্জী, নরসা রেড্ডী, বিনায়ক আচার্য প্রভৃতি এবং কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিত গুপ্ত, ভূপেশ গুপ্ত, ইন্দ্রদীপ সিনহা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভাষণদান করেন। বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণটি একটি কমিশনে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া বিদেশী বক্তাদের মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় হয় চিলির প্রাক্তন সুইডিশ রাষ্ট্রদূত হ্যারলড এডেলস্টান-এর বক্তৃতা। তিনি তাঁর মর্মস্পর্শী ভাষণে উল্লেখ করেন কিভাবে সর্বরকমের ঝুঁকি নিয়ে পিনোচেৎ-এর বর্বরতার বিরুদ্ধে চিলিবাসীদের নিজ রাষ্ট্রদূতাবাসে আশ্রয় দেওয়ার জন্য পিনোচেৎ সরকারের কাছে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' আখ্যালাভ করেন এবং পরবর্তীকালে কি অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে চিলি ত্যাগ করতে হয়। উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা করেন সোভিয়েতের আলেকজান্দার কুজনিন, প্রাক্তন পোলিশ প্রধানমন্ত্রী সাইরাঙ্কিয়েভিচ, চিলির ভলোদিয়া তাইতেলবোয়াম, শান্তির শক্তিসমূহের বিশ্ব কংগ্রেসের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) মার্ক-সলোমন, ইরাকের আজিজ শরিফ, এঙ্গোলার মারিয়া প্রভৃতি এদের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বকালীন ফ্যাসিবাদের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করার সাথে সাথে নয়া-ফ্যাসিবাদের বর্তমান রূপ সম্পর্কে জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেন। সমস্ত বক্তার বক্তৃতার মধ্যেই একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে এই যে, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে মানবতার জঘন্যতম শত্রু এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সবচেয়ে আগ্রাসক অংশ, মূলত বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বৃহৎ একচেটিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের সামাজিক রাজনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। সম্ভবত সর্বাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন দ্বিতীয় কমিশনের আলোচনায়। ফ্যাসিবাদ ও নয়া ফ্যাসিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাকালে এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, সমাজের শোষিত, অবহেলিত মানুষকে সংগঠিত করে, তাদের স্বার্থরক্ষা করেই ফ্যাসিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি চূর্ণ

করা সম্ভব এবং এ বিষয়েও সবাই একমত পোষণ করেন যে সামন্তবাদের অবশেষ, একচেটিয়ার স্বার্থ, বহুজাতিক কর্পোরেশন ও সি. আই. এ-র অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের ওপরে আঘাত না হানলে ফ্যাসিবাদকে রোখা অসম্ভব, বিশেষত ভারতের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০-দফা কর্মসূচীকে নির্দ্বিধায় সার্থকভাবে রূপায়ণের মধ্য দিয়েই ভারতে ফ্যাসিবাদ প্রতিহত করা সম্ভব।

এই সম্মেলন চলাকালেই মহিলা ও শিক্ষকদেরও দুটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনগুলিতে স্বভাবতই এই আন্দোলনে মহিলা ও শিক্ষকদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। সর্বস্তরের শিক্ষকদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রস্তুতি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বায়কবৃন্দের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত এবং অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে।

সম্মেলনে বিভিন্ন অধিবেশনে একবাক্যে সোচ্চারে ব্যক্ত হয় যে বর্তমান যুগে সোভিয়েত বিরোধিতা ও মাওবাদী রাজনীতি নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদকেই পরিপুষ্ট করে। সুতরাং, সোভিয়েত বিরোধিতা ও মাওবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে নিরলস মতাদর্শগত সংগ্রাম না চালিয়ে ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করা অসম্ভব। এছাড়া সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী পত্রপত্রিকার অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রচারমাধ্যম যা প্রতিনিয়ত সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত সেই সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা সম্পর্কেও নানাবিধ আলোচনা হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়: ফ্যাসিবাদের উপরে জয়লাভের ৩০তম বার্ষিকী সম্পর্কে, চিলি, সাইপ্রাস, বলিভিয়া, ব্রাজিল, মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে ফ্যাসিবাদী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনগণের প্রতি সংহতি জানিয়ে। দুই ভিয়েতনামের একীকরণ ও কোরিয়ার একীকরণ, স্পেন ও পর্তুগালের সংগ্রামী জনতার সমর্থনে, এঙ্গোলায় এম. পি. এল. এ-র সমর্থনে এই সমস্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয় সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে দ্বিতীয় স্টকহোম আবেদন-এর ওপরে। সমাপ্তি অধিবেশনে রমেশচন্দ্র ব্যতীত ভাষণ দেন সি. পি. আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমঃ রাজেশ্বর রাও এবং সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমঃ এন. কে. কৃষ্ণাণ এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী।

৭ই ডিসেম্বর ছিল প্রকাশ্য অধিবেশন। গান্ধী-ময়দানের এই প্রকাণ্ড সমাবেশ ছিল এক কথায় জনসমুদ্র—পাটনা নগর সেদিন সমবেত হয়েছিল গান্ধী-ময়দানে। কলকারখানা, ক্ষেতখামারের নিপীড়িত, শোষিত মানুষের প্রত্যয়ব্যঞ্জক এই জনসমুদ্র থেকে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে মহাকাল উত্থিত কালজয়ী উক্তি 'নো পাসারন' নিখিল বিশ্বে ফ্যাসিবাদের ঠাঁই নেই।

পরিশেষে প্রশংসা করতে হয় বিহারবাসীর অকুণ্ঠ আতিথেয়তাকে। নেতৃস্তর থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীস্তর পর্যন্ত প্রতিটি মানুষের অপূর্ব শৃঙ্খলাবোধ ও দায়িত্ববোধ যে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে তা নিঃসন্দেহে আগামীদিনের পাথেয় হয়ে রইলো। এ সম্মেলন থেকে শিক্ষার যদি কিছু থেকে থাকে তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবীদের অসাধারণ সংযম ও কর্তব্যবোধ, আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান কর্মোদ্যোগের অফুরন্ত পুঁজির ভাণ্ডার যা সার্থক করে তুলেছে এই মহাসম্মেলনকে। পরিশেষে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে জাতীয় স্তরে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক মোর্চা গড়ে তোলার যে শুভসূচনা দেখা গেল তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে এই সম্মেলনের সার্থক শিক্ষা, একমাত্র এই পথেই 'নো পাসারন' রণধ্বনির সার্থক রূপায়ণ সম্ভব।

আলোচনা

আগস্ট আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

ভূষার চট্টোপাধ্যায়

শারদীয় 'মুক্তাঙ্গনে' নরহরি কবিরাজের লেখা 'আগস্ট আন্দোলন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়লাম। প্রবন্ধটির ওপর আলোচনা আহ্বান করা হয়েছে দেখে এ-সম্বন্ধে আমার মতামত জানাবার উদ্দেশ্যে এই লেখাটি পাঠালাম। নরহরিবাবুর প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ সন্দেহ নেই এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে যখন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সম্পর্ক স্থাপনটাই ছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজন, তখন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি তা করতে পারে নি এটাই নরহরিবাবু দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির এই ব্যর্থতা আমিও স্বীকার করি এবং সম্ভবতঃ অধিকাংশ কমিউনিস্টই স্বীকার করবেন। সেই সময় জাতীয় ধারা ও কমিউনিস্ট ধারা যে পরস্পর সম্পর্কশূন্য দুই স্বতন্ত্র ধারা হয়ে পড়েছিল এটা বাস্তব ঘটনা। এই দিক থেকে জাতীয় ধারা থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং তার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে অনেক জটিলতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যর্থতাকে নরহরিবাবু যেভাবে দাঁড় করিয়েছেন, অর্থাৎ আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির যোগদান না করাটাই হচ্ছে প্রধান ব্যর্থতা—এই কথা আমি স্বীকার করি না। আমার মতে এর দ্বারা নরহরিবাবু ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নটিকে অতিসরলীকৃতভাবে দেখেছেন, যা থেকে এটাই সিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে যায় যে আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দিলেই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করতে পারত। এটা শুধু অতিসরলীকরণই নয়, পরিস্থিতির অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাও বটে।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক বিরোধের দিকটিকে সমধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি এখানে বেশ কিছুটা সংস্কারবাদের ফাঁদে পড়েছিল তাও ঠিক। পার্টির কোনো কোনো কাজের মধ্যে এরকম ধারণাই প্রকট

হয়েছিল যে বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ও সোভিয়েতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এমন একসূত্রে বাঁধা হয়ে গিয়েছে যে ভারতের ক্ষেত্রেও তা পুরোপুরি জনযুদ্ধ এবং এখানে বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দিকটি এখন বর্তব্য নয়। এই অবস্থান আসলে ছিল এম. এন. রায়ের দলের এবং কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান তা ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত জাতীয় গভর্নমেন্টের দাবী তুলেছিল যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে জনস্বার্থানুগ করার জন্য। এই সব বিষয় নরহরিবাবুও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তবু কমিউনিস্ট পার্টির কোনো কোনো কাজ এম. এন. রায়ের দলের অবস্থানের মতো হয়েছিল। এবং এই সব কাজের সুযোগ নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছিল। এই দিক দিয়ে দেখলে নিশ্চয়ই একথা বলা চলে যে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব কৌশল সর্বদা ঠিকভাবে অবলম্বন করতে পারে নি। এটাকে কমিউনিস্ট পার্টির চিন্তার মধ্যকার বিভ্রান্তিও বলা চলে। কিন্তু তবু আমি বলব যে এই সংস্কারবাদী বিচ্যুতির সঙ্গে আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির যোগ না দেওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সংস্কারবাদী বিচ্যুতি না হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে সেই সময় হয়ত আরো কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হত, কিন্তু তার জন্য আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানের কোনো মৌলিক তারতম্য হয়ে যেত এরকমটা মনে করা যায় না। কারণ, তখনকার ঐতিহাসিক প্রশ্নটি ছিল যে কোনো দেশের মুক্তির স্বার্থেই ফ্যাসিজমের আগ্রাসনের প্রতিরোধ দরকার এবং তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেই দেখতে হবে যে নির্দিষ্ট জাতীয় মুক্তিসংগ্রামটি এমন ধারায় পরিচালিত কিনা যা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের চেতনা ও দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দেয়, অথবা এমন ধারায় পরিচালিত কিনা যা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের গুরুত্বই অস্বীকার করে। যদি সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে আগস্ট আন্দোলনের চরিত্রটা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সম্পর্ক-স্থাপনের দিক থেকে অনুকূল ছিল না, বরং প্রতিকূলই ছিল, তাহলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাকে কি করে এই সময়কার সঠিক ধারার জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলা হবে?

নরহরিবাবু বলতে চেয়েছেন যে কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট-সংগ্রামে যোগ দিয়ে তাকে "সুশৃঙ্খলভাবে, সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে পারত।" এই কথার মধ্যে নরহরিবাবুর প্রধান জোরটা পড়েছে

আগস্ট-সংগ্রামে যোগ দেবার ওপর, কি করা যেতে পারত তার ওপর নয়। এটা বোঝা যায় এইজন্য যে এই প্রসঙ্গে নরহরিবাবু ১৯৩৫-এর ডিমিট্রভের নির্দেশের উল্লেখ করেছেন। সেটাই নরহরিবাবুর প্রধান ভিত্তি কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানকে ভুল প্রতিপন্ন করতে। কিন্তু কখন ও কি অবস্থায় ডিমিট্রভের এই নির্দেশ? ১৯৪০-এর কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ তো করেই নি, বরং বুর্জোয়া শ্রেণীর আন্দোলন বলে তাকে সমালোচনা করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার এই সংকীর্ণতাবাদকেই ডিমিট্রভ আঘাত করেছিলেন এই নির্দেশে। সেটা সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনেরই পরিস্থিতি, ফ্যাসিজমের বিশ্বগ্রাসের অভিযানের বিরুদ্ধে ফ্যাসিজম রোধের বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থার কথা নয়। ফ্যাসিজম বিরোধী যুদ্ধের বিশ্বপরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন কি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে এই রকম নির্দেশ দিয়েছিল? তা নয়। নরহরিবাবু নিজেই সে-নির্দেশেরও উল্লেখ করেছেন, যাতে প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে: "এটি শুধু পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশের ওপর আক্রমণ নয়, এটি পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার ওপর আক্রমণও বটে।" এর স্পষ্ট মানে হচ্ছে এই যে ফ্যাসিজমকে রুখতে না পারলে কোনো দেশেরই মুক্তি অর্জিত হতে পারে না, কোনো দেশের স্বাধীনতাও রক্ষিত হতে পারে না। কাজেই ১৯৩৫-এ লেখা ডিমিট্রভের সমালোচনাকে ১৯৪২-র পরিস্থিতিতে হুবহু প্রয়োগ করা যায় না। ৪২-এর পরিস্থিতিতে ফ্যাসিজম-বিরোধী সংগ্রামের বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতেই সমস্ত দেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে দেখতে হবে এবং সেইজন্যই দুই সংগ্রামের একীকরণ দ্বারাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঠিকতা বিচার করতে হবে। নরহরিবাবু বারবার এই একীকরণের প্রশ্ন তুলেছেন, আবার অন্যদিকে এই প্রশ্নকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে বিবেচনা করতে চেয়েছেন। তা না হলে তিনি ডিমিট্রভের ১৯৩৫ এর নির্দেশকে ১৯৪২-এ হুবহু প্রয়োগ করতেন না। নরহরিবাবুর সিদ্ধান্ত এইজন্যই একপেশে হয়ে গিয়েছে।

আগস্ট আন্দোলনকে আমি ছোট করছি না। বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এত ব্যাপক ও দৃঢ় সংগ্রাম কখনও হয় নি। এই সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মানুষের দুর্জয় সংকল্প, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই সংগ্রামকে নৃশংসভাবে দমন করতে চেষ্টা করেছে। এ সবই

সত্য। কিন্তু তা হলেও এ-প্রশ্ন থেকে যায় যে এই সংগ্রামের মধ্যে তখনকার পরিস্থিতির যা প্রয়োজন, অর্থাৎ ফ্যাসি বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের একীকরণ, তার অনুকূল উপাদান বেশী ছিল, না তার প্রতিকূল উপাদান বেশী ছিল। এটা বিচার করতে হলে তো আগস্ট সংগ্রামের তীব্রতার নিরিখ দিয়ে বিচার করা চলে না, বিচার করতে হয় আন্দোলনের মধ্যে কি মনোভাব প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার নিরিখে। আগস্ট আন্দোলনের আগের পরিস্থিতি সম্বন্ধে নরহরিবাবু নিজেই উল্লেখ করেছেন যে বিভিন্ন ধরনের মনোভাব নিয়ে জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের বিভিন্ন অংশ জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

এটা ঠিক যে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহে এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছিল যে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্যই স্বাধীন সরকার চাই। কিন্তু তবু ফ্যাসিবাদী-বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসাবে স্বাধীনতার কথাটা তোলা সঠিক নীতি হবে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করেনি। কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই স্বাধীনতার প্রশ্নকে ফ্যাসিজম-প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগ নেওয়ার প্রয়োজনের সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। যাই হোক, উদ্যোগ না থাকলেও কংগ্রেসের অবস্থানের মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধী চেতনা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কংগ্রেস ছাড়া বাকী জাতীয়তাবাদী শক্তির অনেকগুলিই এমন অতিজাতীয়তাবাদী অবস্থান থেকে যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে দেখল, যার অর্থ দাঁড়ায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার প্রশ্ন অবান্তর, ইংরাজের হাত থেকে স্বাধীনতা আদায় করাটাই একমাত্র প্রশ্ন। ফরোয়ার্ড ব্লক, জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিচালিত সোশ্যালিস্ট পার্টি, আর-এস-পি প্রভৃতি অনেক পার্টি এই অবস্থান নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার প্রশ্ন অবান্তর মনে করার চেয়ে আরো একধাপ এগিয়ে 'ইংরেজের শত্রু আমাদের মিত্র' এই স্পষ্ট ফ্যাসিস্ট-শক্তি-প্রীতির মনোভাবও একাংশের ছিল। শুধু এইসব ভিন্ন মনোভাবাপন্ন শক্তিই নয়, কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যেও যে দুরকম মনোভাব ছিল তাও অনেকে জানেন। নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতারা ফ্যাসিজমের বিশ্ববিপদ সম্বন্ধে যতটা সচেতন ও ফ্যাসিজম-প্রতিরোধে যতটা আগ্রহী ছিলেন, গান্ধী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্যাটেল, কৃপালনী প্রভৃতি নেতারা ততটা ছিলেন না, তাও তাঁদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। নরহরিবাবুও এসবের উল্লেখ করেছেন। এই অবস্থায় যে আগস্ট আন্দোলন শুরু হল তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এই সব

মনোভাবই ছিল এবং যেহেতু এই আন্দোলনের শুরু ও এগিয়ে যাওয়া সবটাই হল পরিচালনাহীন ও স্বতস্ফূর্তভাবে, সেই হেতু সবচেয়ে সহজ উত্তেজক মনোভাবটাই হয়ে দাঁড়াল প্রধান, যার মধ্যে ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার চেতনা কিছুই স্থান পায় নি।

প্রাক-আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে নরহরিবাবুর নিজেরই স্বীকৃতি এই যে, এই সময় জাতীয় আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক আন্দোলন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। একথাও তিনি স্বীকার করেছেন যে, "বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদীরা সুযোগ বুঝে ইংরাজ-গভর্নমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসাবে যে 'সংক্ষিপ্ত অথচ দ্রুত' সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তার মধ্যে বিপদ এই ছিল যে ইংরাজ-গভর্নমেন্ট স্বাধীনতার দাবী মেনে না নিলে সংগ্রামটা এমন নেতৃত্ববিহীন ব্যাপক স্বতস্ফূর্ততার দিকে চলে যেতে পারে এবং তাতে সংগ্রাম-শক্তির এমন অপচয় হতে পারে যে ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলি তার সুযোগ নিতে পারে।"

সুতরাং পরিস্থিতিটা অত্যন্ত জটিল হয়েই দাঁড়িয়েছিল। এই জটিলতার সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হবে বাইরের নিকটাও। মনে রাখতে হবে অক্ষশক্তির পরিকল্পনাটা কি ছিল। শুধু ইউরোপ দখলই নয়, অক্ষশক্তির পরিকল্পনা ছিল এশিয়াও দখল করা। Operation Orient পরিকল্পনা ১৯৪২-এই হয়েছিল এবং ভারত পর্যন্ত তা প্রসারিত ছিল। এই পরিকল্পনারই অংশ হিসাবে জাপানের বর্মা দখল হয়েছিল এবং ভারতের দিকে তার অভিযান এগিয়ে চলেছিল। আসন্ন জাপ-আক্রমণের বিপদ দেখেই কংগ্রেসের প্রস্তাব ছিল যে জাপ-আক্রমণকে কার্যকরীভাবে প্রতিরোধ করতে হলে দেশে স্বাধীন সরকার চাই। কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক বক্তব্যের পিছনে কংগ্রেস নেতৃত্বের এক বড় অংশের চিন্তার মধ্যে এই বুর্জোয়া-সুলভ bargaining মনোভাব ছিল যে স্বাধীন ভারত-গভর্নমেন্ট গঠিত হলে তার সঙ্গে আক্রমণকারী জাপানের সহজেই মীমাংসা হয়ে যাবে। Short swift struggle-এর পরিকল্পনা এইজন্যই। আবুল কালাম আজাদের লেখা থেকে এইসব কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে এইরকম জাপ-আক্রমণের পরিস্থিতির মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের মনোভাব যে জাপ-আক্রমণ সম্বন্ধে পুরোপুরি নির্লিপ্ত ছিল তাও তাঁর ঘোষণা থেকে বোঝা যায়। ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে 'সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি আহ্বান' বলে যে গোপন ইস্তাহার তিনি দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিল যে কংগ্রেসের প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা একটা আছে এবং সে ব্যাখ্যা

অনুযায়ী তাঁরা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং বৃটেনকে আক্রমণকারী শক্তি বলে অভিহিত করেছেন এবং তাই সশস্ত্র পদ্ধতিতে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত মনে করেন। সারা দেশ ঘুরে তিনি এই কথা প্রচার করেন। এই উদ্দেশ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ করেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে অভিযান করলেও জাপানের যে সর্বত্রই উদ্দেশ্য ছিল তার মাধ্যমে জাপ স্বার্থও যতদূর সম্ভব হাসিল করা, তা সুভাষ বসু ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অন্য নেতাদের সঙ্গে জাপ-নায়কদের কোনো কোনো মত-সংঘাতের ঘটনা থেকে বোঝা যায়। সব মিলিয়ে পরিস্থিতির জটিলতাটা এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যেখানে ফ্যাসিস্ট বিরোধিতার প্রশ্নটা কার্যতঃ একরকম বাতিল হয়েই গিয়েছিল। আগস্ট-সংগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতিটা এই সব মিলিয়েই দেখতে হবে এবং তা দেখলে এটা বলতেই হয় যে সাধারণ বিচারে আগস্ট-সংগ্রাম যতই গৌরবজনক হোক না কেন, ঐতিহাসিক বিচারে এ-সংগ্রাম দেশের পরিস্থিতিতে এমন জটিলতা সৃষ্টি করেছে যাতে বৃটিশ-বিরোধিতার সঙ্গে জাপান-বিরোধিতাকে মেলানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি এই সংগ্রামে যোগ দিয়ে সেই ঐতিহাসিক কাজটি করতে পারত না কি, তাহলে সেটাও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অতিসরলীকরণ করা হয়। যখন জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধিতাটা একমাত্র বিরোধ বা মূল বিরোধ, তখন নেতৃত্ব যাই হোক এবং যে ধারাতেই সংগ্রাম চলুক না কেন, তার গতিমুখ (direction) থাকে একটা দিকেই। কমিউনিস্ট পার্টি তাতে অংশগ্রহণ না করলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দায়িত্বকেই অস্বীকার করা হয় এবং অংশগ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় সংগ্রামের বাস্তব শর্তগুলিকে আরো স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ করে সংগ্রামে বিপ্লবী উপাদান বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে এমন দুই ভিন্ন বিরোধ বর্তমান যা সংগ্রামধারাকে দুই পরস্পর-বিরোধী দিকে টানবার চেষ্টা করে তখন পরিস্থিতিটা হয়ে যায় অত্যন্ত জটিল। আর সেই দুই বিরোধের একটি যদি হয় ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা রূপ বিশ্বপরিস্থিতির তখনকার নির্ধারক বিরোধ এবং অপরটি যদি হয় ফ্যাসিবিরোধী মোর্চার একাংশের অর্থাৎ ইংরাজের সঙ্গে জাতির মৌলিক বিরোধ, তখন জটিলতা এমন সাংঘাতিক হয়ে ওঠে যে শুধু সংগ্রাম-কৌশল রচনা দ্বারা এই দুই বিরোধের একীকরণ হয় না। তার জন্য দরকার হয়

সমগ্র জাতীয় রাজনীতিরই এমন রূপায়ন যা সমগ্র জাতীয় ঘটনাধারাকে সঠিক পথে বিকশিত করে এই দুই বিরোধকে একধাতে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা কোনো আংশিক কাজ নয়, সমগ্র জাতীয় রাজনীতিকে গড়ে তোলার মতো নির্ধারক কাজ। কমিউনিস্ট পার্টি এই দৃষ্টি নিয়ে তার ভূমিকা পালন করে এসেছে প্রথম থেকেই। কিন্তু যেহেতু সমগ্র জাতীয় রাজনীতিকে গড়ে তোলার মতো নির্ধারক শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি এখানে ছিল না, সেই হেতু ঘটনাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। এই যে অবস্থা, যে-অবস্থায় বিশ্ব রাজনীতির নির্ধারক বিরোধের সঙ্গে জাতীয় বিরোধের বিপরীত অবস্থান দেখা গিয়ে, তখন নির্ধারক বিরোধ ফ্যাসিজম-বিরোধিতার দিকে কমিউনিস্ট পার্টি বেশী ঝোঁক দিল জাতির সামগ্রিক স্বার্থেই। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কাছে জাতীয় দায়িত্ব বিসর্জন দেওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। সেইভাবে প্রশ্ন তোলে তারাই যাদের কাছে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আর জাতীয় দায়িত্ব দুটি ভিন্ন বস্তু, যার পরস্পর-সম্পর্ক নেই। কমিউনিস্টরা মনে করে আন্তর্জাতিক দায়িত্বের সঙ্গে মিল রেখেই জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা না হলে ক্ষতিটা বেশী হবে জাতীয় দায়িত্বেরই। এইখানেই কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে নিছক জাতীয়তা-বাদী বা অতি-জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। ঐতিহাসিকভাবে কমিউ-নিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যতা প্রমাণিত ভারতের জাতীয় মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রেও। এরকম তো অনেকে মনে করেন যে আগস্ট-সংগ্রামের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচার হচ্ছে এই যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসিজমের পরাজয়ের ফলে যে ভাবে বিশ্বশক্তি ভারসাম্য সমাজতান্ত্রিক শক্তির দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেল সেই পরিপেক্ষিতেই ভারতের ভিতরকার সংগ্রামশক্তির কাছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ পশ্চাদপসরণ করল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি ফ্যাসিজমের পরাজয় না হত, তাহলে ভারত সমেত অধিকাংশ পরাধীন দেশেরই মুক্তি বহুদিনের জন্য পিছিয়ে যেত। ফ্যাসিজম জয়ী হলে বৃটিশ-শাসনমুক্ত হয়েও ফ্যাসিস্ট-শক্তির অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকতে হত ভারতকে। আর না হয় ফ্যাসিস্ট-শক্তির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আপোষ-রফা হয়ে একটা কিছু অবস্থা হত (যদিও এটা তখনকার অবস্থায় সম্ভব হত বলে মনে হয় না)। যে অবস্থাই হোক, তার কোনটাতেই ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা হত না। কাজেই বিশ্ব পরিপেক্ষিতে তখনকার যে মূল প্রশ্ন, যে প্রশ্নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য ছিল। আগেই বলেছি সে-গুরুত্ব দিয়েও

পার্টির কর্মকৌশলের মধ্য থেকে অনেক জিনিষ বাদ দেওয়া যেত, যেগুলো সংস্কারবাদী চিন্তা থেকে প্রসূত।

ইন্দোচীন, বর্মা প্রভৃতি দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে নরহরিবাবু বলেছেন যে এইসব দেশের মতো পথে দেশকে নিয়ে যেতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির চেষ্টা করা উচিত ছিল। কিন্তু ইন্দোচীন, বর্মা প্রভৃতি দেশের অবস্থাটা ছিল ভারতের থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। এইসব জায়গায় বাস্তব অবস্থাটা হয়েছিল এমন যে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ইন্দোচীনের শাসক-শক্তি ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ। ১৯৪০-এ ফ্রান্স হিটলারের কাছে আত্মসমর্পণ করায় জাপান সুযোগ বুঝে ইন্দোচীনে আধিপত্য করল। আগে থেকেই হো-চি-মিনের নেতৃত্বে যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন চলছিল তা ছিল স্পষ্টভাবেই ফ্যাসিস্ট বিরোধিও। কাজেই সে সংগ্রাম শেষপর্যন্ত জাপানী-আধিপত্য ও ফরাসীদের পুনরাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম হিসাবেই পরিচালিত হয়ে ১৯৪৫-এ সফল হল। বর্মা ১৯৪২-এর মধ্যেই জাপ-অধিকৃত হয় ও একটা জাপ-তাঁবেদার গভর্নমেন্ট তৈরী হয় সেখানে। আঙ সানের নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনফ্রন্ট গঠিত হয়ে এবং দেশপ্রেমিক শক্তির অধিকাংশ তার পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেষপর্যন্ত প্রকৃত স্বাধীন গভর্নমেন্ট গঠন করে। মোটের ওপর এইসব দেশে ঘটনাটা এরকম ছিল না যে আগে জাতীয় মুক্তি অর্জন করে তারপর ফ্যাসিস্ট-আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়েছে। বরং ফ্যাসিস্ট দখলের পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম এক হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, জাতীয় চেতনা ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী চেতনার মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংমিশ্রণ প্রথম থেকেই ঘটেছে। ভারতের ক্ষেত্রে অবস্থাটা অন্যরকম। ইংরাজকে হটিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চেতনার সঙ্গে ফ্যাসিস্ট-জাপানকে প্রতিরোধ করার চেতনা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যায় নি। কংগ্রেসের মনোভাবের মধ্যে যতটা ফ্যাসিস্ট-বিরোধী চেতনা ছিল তারও ভিত্তি এমন দৃঢ় ছিল না যে ফ্যাসিস্ট-প্রতিরোধকে স্বাধীনতার অপরিহার্য শর্ত মনে করা যেতে পারে। আর কংগ্রেস ছাড়া অন্যদের মধ্যে তো ফ্যাসিস্ট-বিরোধী চেতনার বদলে 'ইংরাজের শত্রু ভারতের মিত্র' এই মনোভাবই বেশী কাজ করেছে। সোভিয়েতের প্রতি ভারতের জনগণের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ অনেকদিন থেকেই ছিল বটে, কিন্তু সেটা একটা স্পষ্ট ফ্যাসিস্ট-বিরোধী চেতনার রূপ নিতে পারে নি নানা কারণে। যাই হোক, বর্মা, ইন্দোচীন

প্রভৃতির পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের পরিস্থিতি মেলানো চলে না। ভারতের পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম একসূত্রে গ্রথিত করতে হলে আগে থেকেই এমন জাতীয় নেতৃত্ব গড়ে ওঠার দরকার ছিল যা রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে ঠিক হো-চি মিনের নেতৃত্বের মতো।

পরিস্থিতির এই সমস্ত দিক এড়িয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে শুধু আগস্ট-আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান বিচার করা যায় না। কমিউনিস্ট পার্টি এখানে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী সংগ্রাম দুটোকে মেলাতে পারে নি এই অর্থে যে দেশের জাতীয় রাজনীতির ধারাকে একদিকে বুর্জোয়া-শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ থেকে, অন্যদিকে স্বতস্ফূর্ততার হাত থেকে উদ্ধার করে তখনকার দিনের সঠিক ঐতিহাসিক ধারা হিসাবে নির্ধারণ করতে পারে নি। এ-ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে হলে এখানে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তির আপেক্ষিক স্বল্পতার ঐতিহাসিক কারণই বিশ্লেষণ করতে হয়। সেটা স্বতন্ত্র জিনিষ। কিন্তু নরহরিবাবু সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে অত্যন্ত short cut পদ্ধতিতে কারণ দেখিয়েছেন যে আন্তর্জাতিক বিরোধের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বিরোধকে ছোট করে দেখেছে এবং তারই ফলে এটা ঘটেছে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। আন্তর্জাতিক বিরোধের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নে আমি তো এটাই বলব যে কমিউনিস্ট পার্টি তা করেছিল বলেই স্বতস্ফূর্ততার জোয়ারের ধাক্কা অতিক্রম করে কমিউনিস্ট পার্টি শুধু টিকে ছিল তাই নয়, জনগণের মধ্য থেকে শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রসর হতে পেরেছে এবং জাতীয় জীবনে এমন সমস্ত উপাদান সৃষ্টি করতে পেরেছে যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে এবং সে-সমস্ত উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েই আজকের জাতীয় ধারা এগিয়ে চলেছে। ঠিক সেইজন্যই কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার অবস্থান অনেকের দ্বারা সমালোচিত হলেও আজ অধিকাংশের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি বলে স্বীকৃত। আর ঠিক সেইজন্যই যারা তখন কমিউনিস্ট পার্টির সবচেয়ে বড় নিন্দুক ছিল তাদেরও এক বড় অংশ আজ জাতীয় নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল পথের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

পল রোবসন

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী"—রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই কলি পল রোবসনের ক্ষেত্রে বড় বেশী প্রযোজ্য। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠনিঃসৃত বাণীর ব্যাপ্তি, বর্ণবৈষম্যবাদ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর গীতিমাল্য এবং মানবতার বিকাশ ও শান্তির পক্ষে তাঁর ভয়হীন উচ্চারণ—এসব মিলে বারেবারে ঐ কলির কথা মনে করিয়ে দেয়।

সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে তিনি হয়ে রইলেন এক অনন্য কিংবদন্তীর নায়ক। বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গীতসৃষ্টি শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদধ্বনির মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্বসমাজতন্ত্র তথা সোভিয়েত ভূমি ও বিশ্ব শান্তির অবিচল সমর্থক ও প্রচারক। সাম্রাজ্যবাদী নেকড়ের হুঙ্কার তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রোবসন তাতে স্তব্ধ হন নি—বরং যত অত্যাচার, তত প্রতিরোধ স্পন্দিত হয়ে উঠেছে তার বহুমুখী প্রতিভার হীরকদ্যুতিতে।

একাধারে ক্রীড়াবিদ, অভিনেতা, আইনবিদ ও সর্বোপরি অপরাহত কণ্ঠ-শিল্পী রোবসন বিশ্ব সমাজতন্ত্রের মর্মবাণীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলেছিলেন। এ প্রেরণায় তিনি যেখানেই গিয়েছেন, তিনি মুক্তিকামী ও মুক্তিস্নান মানবতার জয়গান গেয়েছেন—রিপাবলিকানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন স্পেনের গৃহযুদ্ধের আঙ্গিনায়, সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে সগৌরবে মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যেন তিনি মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন।

'ওল'ম্যান রিভার', 'উই শ্যাল ওভারকাম' প্রভৃতি জনশ্রুতির মতো বাণী রোবসনকে বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের চিত্তের মণিকোঠায় অক্ষয় অধিকার দিয়েছে। তাঁর প্রিয় মিসিসিপির কলধ্বনি তাঁর গানে গানে বন্ধনমুক্তির যে প্রেরণা দিয়েছে, আমাদের জীবনে তাঁর অবিনশ্বর প্রতিধ্বনি। দীর্ঘকালের অসুস্থতা ও কালের অমোঘতা তাঁকে পৃথিবীর মধুময় ধূলি থেকে ছিনিয়ে নিল। তবু তিনি আমাদের মাঝে মিসিসিপির মতোই দীর্ঘজীবী হয়ে রইলেন।

মূল্যায়ন পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

(৪নং ফরম)

১। প্রকাশ স্থান—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯

২। প্রকাশের সময়—প্রতি মাসে।

৩। মুদ্রক—পবিত্র রায়, জাতীয়তা—ভারতীয়।
ঠিকানা—১২ জি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩০

৪। প্রকাশক—পবিত্র রায়, জাতীয়তা—ভারতীয়।
ঠিকানা—১২ জি, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-৩০

৫। সম্পাদক—সর্বশ্রী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও নরহরি কবিরাজ।
জাতীয়তা—ভারতীয়।
ঠিকানা—১০ বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯।

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—সমীক্ষা প্রকাশনী।
ঠিকানা—১০, বণ্ডেল রোড, কলিকাতা-১৯।

আমি, শ্রীপবিত্র রায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিলিখিত বিবরণী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

পবিত্র রায়
প্রকাশক

তাং ২।৩।৭৬

MULYAYAN Vol. XI No. 4 Regd. No. WB/SC 16
(Kartick-Agrahayan Paus-Magh 1382 B.S) R. N. 13785/65

ঠিক থেকে যাই-দুধ—
লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের আমরা পারিবারিক বন্ধু

ফাস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্স্—লক্ষ লক্ষ
দেশবাসীকে খুশিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ঔষধ

'পড়ছে তেকায় আসল বন্ধু চেনা যায়'—যে কেউ প্রমাণ
অনায়াসে আমাদের যাচাই করে নিতে পারেন। শুধু জনসাধারণ
ভাগ্যবানদের কাছে নয়, এদেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের কাছে
ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধু। বাড়ী ঠাকুরমার জন্যে
যেমন আই-দুধ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জন্যে ইনিক—আমরা
মজিয়ে থাকি। তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিভিন্ন ধরনের আধুনিক
ঔষধপত্র—সবারের সাধ্যে কুলায় এমন দামে।

ও কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সালে।
আদর্শবান কয়েকজন বিজ্ঞানী, ইসাইনবিদ আর ভেষজতত্ত্বের দেশের
সাধারণ মানুষকে ঔষধ যোগানোর ব'লে গড়ে তুলছিলেন
'ফাস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড।
ঔষধের গবেষণা, উৎপাদন আর বিতরণব্যবস্থা নিয়ে তাদের
পায়ে দাঁড়ানো—এই ছিল তাঁদের ব্রত।

ফাস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল্
ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
কলিকাতা ১৯

ফাস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড আপনাদের সেবায়

মূল্যায়ন ১০, বঙ্গেল রোড, কলকাতা-১৯ দাম : দেড় টাকা

6 MAR 1976